রহস্যভেদী বাসব

(ষষ্ঠ খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫৭

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : পঞ্চানন জানা : জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
৪০।১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন : কলিকাতা—১২

রাজা'র শুভ নাম—

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

আন্তরিকতার সঙ্গে—

—আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই—

রহস্যভেদী বাসব—(এক থেকে পাঁচ খণ্ড)

এখানে শ্বাপদ

জানু ভানু কৃশানু

রক্তাক্ত খাইবার

মরণ দোলায় দোলা

জিহ্বনের শেষ বিচার

: সূচীপত্র :

মোমের আলোয় দেখা

বিরাজমোহন দৃষ্টি ফেরালেন।

জোড়া বালিসে ঠেসান দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে আছেন তিনি। বয়স পঁয়ষট্টি বছরের কম হবে না। মাজা মাজা গায়ের রং। ঈষৎ রক্তাভ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন। খাড়া নাক মুখের উপর দাম্ভিকতার ছায়া ফেলেছে। পরিচিত মহলে তিনি কঠোরভাষী ও বদরাগী হিসাবেই চিহ্নিত।

এতক্ষণ পরে নিজের থলথলে শরীরকে একরকম নাচিয়ে বিরাজমোহন হাই তুললেন। দীর্ঘস্থায়ী হাই শেষ হবার পরই তাঁর ভ্রূ কুঁচকে এল। কুটিলতার ছাপ মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠল। তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চালিত করলেন।

বিরাজমোহন অবশ্য ঘরে একা নেই।

নানা বয়সের জনাকয়েক নারীপুরুষ কিছুটা সঙ্কুচিত ভাবে বসে আছেন, খাটের কাছাকাছি ডিভান ও কোচগুলিতে। এঁরা প্রত্যেকেই বিরাজমোহনের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত। এঁদের উপস্থিতিই যে ওঁকে বিরক্ত করে তুলেছে তা বলতে অপেক্ষা রাখে না।

খাটের পাশেই ছোট একটা টেবিল।

টেবিলের উপর প্রয়োজনীয় অনেক কিছু রাখা।

ডান হাত দিয়ে ওখান থেকে কিছু নিতে গিয়েও উনি থামলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, কালীনাথ—

একমাত্র কালীনাথই দাঁড়িয়েছিল।

দাঁড়িয়েছিল সে কর্তার খাটের কাছাকাছিই। বয়স চল্লিশের সামান্য উপরে। দেখে চালাক চতুরই মনে হয়। হাড় বার করা শরীরকে এখন ঘিরে রয়েছে ধুতি আর হাফ হাতা সার্ট।

কর্তার ডাকের উত্তরে তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে—

—তুমি একটু আগে কি যেন বলতে চাইছিলে?

আমতা আমতা করে কালীনাথ বলল, আজ্ঞে, আমি উকিলবাবুকে খবর দিয়েছি।

—উকিল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিচিত্র কথা শোনাচ্ছ তুমি। আমি তো কোন উকিলের কথা বলিনি।

—আজ্ঞে ··মানে···

প্রায় ফেটে পড়লেন বিরাজমোহন।

—ওল্ডফুল। দিন দিন কচি খোকা হয়ে যাচ্ছ। কাকে কি বলতে হয় সে জ্ঞানটুকু পর্যন্ত তোমার হল না। অ্যাটর্ণিকে কেউ উকিল বলে না। যত সব বাজে লোক নিয়ে আমার কারবার। সারা কলকাতা খুঁজলেও তোমার মত ইডিয়াট দুটো পাওয়া যাবে না।

দম নেবার জন্য থামলেন বোধহয়।

বললেন আবার, তা কি বললেন মি· মিত্র ?

কালীনাথ ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

বলল কোনরকমে, কাল সকালে আসবেন বলেছেন।

—সকাল কটায় ?

—বলেছেন কোর্টে যাবার পথে আসবেন।

আর কোন প্রশ্ন না করে, দামী ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে জার্মান সিলভারের নক্সাকাটা পানের ছোট বাটাটা বার করলেন বিরাজমোহন। খানচারেক পান চালান করে দিলেন মুখে, এক চিমটি সুরোভিত জর্দাও। চোখ বন্ধ হয়ে এল। চর্বন সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।

কুড়ি বছর আগে বাঁকুড়ার কোন এক গণ্ডগ্রাম থেকে আগত বিরাজমোহন করগুপ্তকে যাঁরা দেখেছিলেন, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই ঘরে অনায়াস ভঙ্গিতে আধশোওয়া অবস্থায় থাকা ওই লোকটিকে দেখে তাঁরা চিনতে পারবেন না।

মনে হবে এ লোক সে লোক নয়। কেউ কি এত তাড়াতাড়ি নিজের দুরবস্থাকে এমন সোনায় মোড়া করে তুলতে পারে ? অথচ সেই অবিশ্বাস্য ঘটনারই নায়ক বিরাজমোহন। অতি দ্রুতই উনি প্রতিষ্ঠার চূড়ায় পৌঁছেছেন। বলা বাহুল্য এরই সঙ্গে তাল রেখে চেহারা আর মেজাজেরও পরিবর্তন হয়েছে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা হয় আর কি। তবে এর মধ্যে যে একটা হাইফেন আছে তা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। কর্মক্ষেত্রে সিংহের মত সংগ্রাম করতে করতে পরিশেষে একজন শিল্পপতি হয়ে উঠেছেন, এরকম একটা ধারণা করে নেওয়াটা বাতুলতা হবে। অবশ্য বাইরের একটা খোলস আছে যথা নিয়মে। ওঁর অফিসের মাথায় যে বিরাট সাইনবোর্ড আছে, তাতে সোনালি অক্ষরে লেখা আছে, করগুপ্ত এণ্টারপ্রাইজ : জেনারেল মার্চেণ্ট অ্যাণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার।

আসল কথা হল, বিরাজমোহন অন্ধকার গলিতে হেঁটেই রোজগারপাতি করেছেন। আয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকলে, গভীর থেকে গভীর অন্ধকারে সেঁধিয়ে যেতে ওঁকে কখনো বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতে দেখা যায়নি। অবশ্য এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এত টাকা নিয়ে উনি করবেনটা কি ?

বিয়ে-থা করেননি।

ছোট একটা ভাই পর্যন্ত নেই।

কে ভোগ করবে ওঁর এই বিপুল বিত্ত ?

অবশ্য বিরাজমোহনের আত্মীয়স্বজন কিছু আছেন, তবে সম্পূর্ণ নিজের

বলতে যা বোঝায় তেমন কেউ নেই। ইচ্ছে করেই বিয়ে করেননি। ব্যাপারটা তাঁর কাছেই বিরক্তিকর দায়িত্ব বলে মনে হয়েছে। অবশ্য পয়সা ফেললেই যাদের পাওয়া যায় এমন সমস্ত যুবতীদের উপর বয়সকালে দুর্বলতা ছিল।

এখন তাও নেই।

মদ খান না। পানের প্রতি যা একটু আসক্তি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্যয় করার তাগিদে উনি আয় করেন না। আসল কথাটা হল এও একটা নেশা। ওই নেশার আনন্দে বিভোর হয়ে এখনও আয় করে চলেছেন।

বেশ কিছুক্ষণ চর্বন সুখ উপভোগ করার পর নিজের দৃষ্টি বিরাজমোহন পিছলে দিলেন উপস্থিত সকলের উপর দিয়ে।

—প্রেমকিশোর—

প্রেমকিশোরের বয়স বছর ত্রিশেক। বেশ চনমনে চেহারা। কোন এক নাম করা সওদাগরি অফিসে চাকরি করে। মাইনে শ'ছয়েক টাকা ছাড়িয়ে গেছে। স্বভাবচরিত্র ভাল বলেই সকলে জানে। সম্পর্কে বিরাজমোহনের স্বর্গত খুড়তুতো দাদার ছেলে।

— আজ্ঞে আমায় কিছু বলছেন?

বিরাজমোহন ঝাঁজিয়ে উঠলেন, প্রেমকিশোর নামে আর কেউ এঘরে আছে বলে তো আমি জানি না।

প্রেমকিশোর থতমত খেল।

—ইয়ে .... মানে .....

—থাক, আর তোতলাতে হবে না। যত সব বাজে ব্যাপার। তুমি আমার এ্যটর্ণির কাছে কেন গিয়েছিলে বলতো?

— আমি! কই...না . মানে...

—অস্বীকার করার চেষ্টা করো না। তুমি যে গিয়েছিলে আমি তা ভাল ভাবেই জানি। যে কারণে গিয়েছিলে, সে আগ্রহ তোমার একার নয়, এঘরে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের প্রত্যেকের।

একটু থেমে বিরাজমোহন গলা চড়ালেন।

—তোমরা কান খুলে শুনে রাখ, আমার যা কিছু আছে মরার পর সঙ্গে নিয়ে যাব না। তোমাদের মধ্যেই ভাগাভাগি করে দেবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু তোমরা এতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচমনা—

—মিঃ করগুপ্ত—

গৃহচিকিৎসক রজত-সেন বাধা দিলেন।

—আপনাকে আগেও বলেছি উত্তেজনা পরিহার করতে হবে। ও সমস্ত কথা এখন থাক। আপনি বরং বিশ্রাম নিন।

— এতক্ষণ পরে তুমি একটা হাসির কথা বললে বটে ডাক্তার। বিশ্রাম! বিশ্রাম নিতে নিতে তো হাড়ে ঘাস গজিয়ে গেল। আমায় বলতে দাও। তুমি শুধু দেখ, আমি কেমন ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত কিছু গুছিয়ে বলি।

ডাক্তার মৃদু হাসলেন।

—ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা বললে তো আশঙ্কার কিছু ছিল না। আপনি তো একটুতেই রেগে ওঠেন—অসুবিধা তো ওখানেই।

রজত সেন বেশ কয়েক বছর ধরে বিরাজমোহনের স্বাস্থ্যের পাহারাদারী করছেন। কাছেই, এলগিন রোডে তাঁর চেম্বার থাকেনও ওখানেই। ভাল চিকিৎসক হিসাবে ওই পল্লীতে তাঁর নাম ডাক আছে।

ডাক্তারের কথায় কোন মন্তব্য না করে শুধু মাথা নাড়লেন গৃহকর্তা। পানের দলাটা মুখের মধ্যে চারিয়ে নিয়ে এমন একদিকে তাকালেন যেখানে, যেন কিছুটা স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে বসে আছেন একজন প্রৌঢ়া মহিলা।

মুখ চোখ আহামরি কিছু নয়। তবে হাড়ে-মাসে শরীরখানা মন্দ নয়। চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, গোবেচারা বলতে যা বোঝায় তিনি তা নন। সম্পর্কে গৃহকর্তার দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। মধ্যমগ্রাম না নিউব্যারাকপুর কোথায় যেন থাকেন। পেশায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা।

বিরাজমোহন বললেন, তুমি কতদিন পরে এ বাড়িতে পা দিলে নয়নতারা? বছর পাঁচেক হবে, তাই না?

একগাল হেসে নয়নতারা বললেন, তুমি ঠিক বলতে পারলে না মেজদা। বছর পাঁচেক নয়—তিন বছর আসিনি।

— তা হবে। এতদিন পরে হঠাৎ—

— ওমা, আসব না! তোমার শরীর খারাপ —

— শরীর খারাপ!

—তাই তো শুনলাম।

—কথাটা কে গিয়ে কানে দিল। তোমার ঘোড়েল কর্তাটি আমার বাড়ির চারপাশে প্রতিদিন ঘুরপাক খেয়ে যান নাকি?

নয়নতারা কিছু বলতে গিয়েও থামলেন।

সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বিরাজমোহন বলে চললেন, আমার শরীর খারাপের অজুহাত সামনে রেখে তোমরা সকলে একই দিনে দল বেঁধে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ। ব্যাপারটা রহস্যজনক। ভেবেছ. বুড়ো মরতে বসেছে, এই হল বাগিয়ে নেবার সময়। অন্য কেউ হলে তোমাদের ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিত। যত সব বাজে ব্যাপার।

—আপনি আবার উত্তেজিত হচ্ছেন—রজত সেন বললেন, অনেক কথা বলেছেন, আর নয়। এবার—

—বাধা দিও না ডাক্তার। আমার হৃদয় দুর্বল ঠিকই, তাবলে কথা বলতে বলতে এখনই ফোৎ হয়ে যাব না। হ্যাঁ, তোমাদের যা বলেছিলাম—কান খুলে তোমরা শোন, তোমরা স্বার্থপর, তোমাদের আমি ঘেন্না করি। তবু বিশ্ববিদ্যালয় বা আর কোন প্রতিষ্ঠানে আমার সমস্ত কিছু দান করার আগে তোমাদের একটা সুযোগ দিতে চাই।

এই কথায় ঘরে যারা উপস্থিত আছে তাদের মনে কোন ঔৎসুক্য দেখা দিল কিনা তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালেন না বিরাজমোহন। সোজা হয়ে বসলেন এবার। একটু ঝুঁকে, হাত নিচু করে পিকদানিটা তুলে নিলেন। পানের অবশিষ্টাংশ জলাঞ্জলি দিয়ে আবার নামিয়ে রাখলেন পিকদানি।

—যা বলছিলাম—তিনি আবার বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ। অবশ্য ধার বলেই নিয়েছ, কিন্তু এখনো শোধ দাওনি। এত তোমাদের আত্মসম্মান বোধ। তোমাদের এখন আমি দুমাস সময় দিচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে যারা যারা টাকা শোধ দিয়ে দেবে, আমি নিজের উইলে তাদের যাতে ভাল ব্যবস্থা থাকে তার ব্যবস্থা করব।

বিরাজমোহনের এই ধরনের কথা শুনে অপমানে সমস্ত শরীর সুবীরের জ্বলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক ধনী হতে পারেন, দাম্ভিক হতে পারেন, প্রতিপত্তিশালী হতে পারেন, তাই বলে নিজের অপদার্থ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে অপমান করার কোন অধিকার আছে ওঁর?

সুবীর জানলার ধারে বসেছিল।

উঠে দাঁড়াল।

—বিরাজবাবু—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন বিরাজমোহন। তারপরই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই ঘরে এমন কে আছে যে তাঁর উপস্থিতিতেই, তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করতে পারে। জানলার দিকে মুখ ফেরালেন। যুবকটিকে দেখার পরই তার উপস্থিতির কথা স্মরণে এল।

—তুমি কি কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।

—বল, শুনি—

সুবীর দ্রুত-গলায় বলল, আপনি এমন ভাবে বললেন, যাতে মনে হল আর সকলের সঙ্গে আমিও আপনার কাছে টাকা ধার করেছি। এখানে এখন আমি কেন উপস্থিত রয়েছি তা আপনি ভালই জানেন। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। আজ আমি যে এখানে আসছি একথা আমি আপনাকে ফোন করে জানিয়েছিলাম। তারপরও—

—কি নাম যেন তোমার?

—সুবীর সোম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার বাবা কিন্তু কোন দিন আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেননি। তুমি অবশ্য আজকালকার ছেলে। আজকালকার ছেলেদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধটা প্রবল একথা অবশ্য জানি।

—কেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, সেটুকু অনুগ্রহ করে বলে দিলে ভাল হয়।

—বলব বই কি।

—বলুন? আমার হাতে সময় কম।

বিরাজমোহন হাসবার চেষ্টা করলেন।

—তোমার হাতে সময় কম থাকলেও উপায় নেই। আজ রাতটা তোমার এ বাড়িতেই থাকতে হবে। আমার সমস্ত কিছুই ধীর গতিতে বাঁধা। যা বলবার আমি সকালে তোমাকে বলব।

—আজ বললে ভাল হত না।

—সব ব্যাপারে জেদ ভাল নয়। যা বলতে চলেছি, তাতে তোমার ভালই হবে। ওই কথাই রইল। কাল সকালে—

কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই বিরাজমোহন কালীনাথের দিকে তাকালেন। কালীনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা আর হল না প্রণিমা উঠে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ প্রণিমা চুপ করেই বসেছিল। কিন্তু বিরাজমোহনের কথাবার্তা এমন স্তরে পেঁছাল, যাতে সেও অপমানিত বোধ না করে পারেনি।

—ক্ষমা করবেন। আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে এসে পড়ায় আমি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছি। আমার পক্ষে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। দয়া করে আমার সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিন।

সুশ্রী মেয়েটির দিকে বিরাজমোহন তাকালেন।

—তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বল, কি বলবে বল?

প্রণিমা একটু ইতস্তত করল।

—একান্তে কথাবার্তা হলে ভাল হয়।

—আমি হেঁয়ালি পছন্দ করি না। যা বলবার এখানেই বল।

—হেঁয়ালি করিনি। আড়ালে কথা বলতে চাইছিলাম।

—এখানেই বল?

—মা আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিরাজমোহন অবাক হয়ে গেলেন।

—মা!!!

—হ্যাঁ। আমার মা

—তাতো বুঝলাম। আমি কি চিনি তাঁকে?

থেমে থেমে প্রণিমা বলল, চেনেন বলেই তো জানি।

কি নাম বলতো?

—প্রমীলা কর।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জবরদস্ত চেহারার বিরাজমোহন একেবারে চুপসে গেলেন। সাপটে ধরল তাঁকে এক বিচিত্র অনুভূতি। ঘরে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁরই উপর নিবদ্ধ। গৃহকর্তার এই ধরনের ভাবান্তরের কারণটা কি অনেকেই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না।

বিরাজমোহনের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। শরীর একটু টলে

উঠল, তারপরই এলিয়ে পড়লেন বালিসের উপর। উদ্বিঘ্ন রজত সেন তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিলেন। নাড়ী দেখলেন গভীর মনসংযোগে। আর সকলের মধ্যেও কিছুটা উৎকণ্ঠা দেখা দিল। যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

বিরাজমোহন কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন।

সোজা হয়ে বসলেন আবার।

বললেন, ভয় পেওনা ডাক্তার। আমি ঠিক আছি।

– খুব একটা ঠিক আপনি নেই—রজত সেন বললেন, সোজা হয়ে বসে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন।

— তুমি যখন বলছ—

বিরাজমোহন নিজেকে আধশোয়া অবস্থার মধ্যে এনে ফেললেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এখন আগেকার তীক্ষ্নতা নেই। মনে হয় মনের মধ্যে চিন্তার প্রবল ঝড় চলেছে। প্রণিমাকে এবার দেখলেন খুঁটিয়ে।

— কাছে এস।

প্রণিমা এগিয়ে এল।

—কি নাম তোমার ?

—প্রণিমা কর।

—খাসা নাম। তুমি ঠিকই বলেছিলে, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা সকলের সামনে হতে পারে না। একান্তেই হবে। তবে এখন নয়। আজও নয়।

আজও নয়।

—না। কাল। আজ রাতটা তুমি থেকে যাও এ বাড়িতে।

— কিন্তু—

—তোমার হয়ত কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু কি করব বল ? এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত। বিশ্রাম দরকার।

প্রণিমা আর কিছু বলল না।

বিরাজমোহন নিজের ম্যানেজার কাম বাজার সরকারের দিকে তাকালেন।

–কালীনাথ—

আজ্ঞে -

এদের সকলের থাকার আর খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

আজ্ঞে, এখুনি করছি।

—লক্ষ্য রাখবে, কারুর কোন রকম অসুবিধা যাতে না হয়।

—কোন অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখছি কর্তা। আপনারা দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।

কালীনাথের পিছু পিছু সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রজত সেন অবশ্য গেলেন না। আরেক প্রস্থ বিরাজমোহনের দেহ পরীক্ষা করলেন।

বললেন শেষে, ওষুধপত্র সময় মত খাচ্ছেন না মনে হয়।

—তোমার ধারণা ভুল ডাক্তার। ওষুধ নিয়মিত খেয়ে চলেছি। আসল কথা, আজকাল একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।

—আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে উত্তেজনা যে ভাল নয় তা আপনি জানেন। আমার একটা সাজেশান নিন তাহলে—

বিরাজমোহন মৃদু হাসলেন।

—তোমার সাজেশানটা বল—শুনি—।

—চেঞ্জে চলে যান।

—চেঞ্জে—

—হ্যাঁ। আমি সাউথের কোথাও সাজেস্ট করব। ধরুন, উটি। চমৎকার জায়গা। মাস তিনেক থাকুন গিয়ে। চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসবেন।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু এখনই তো আমার যাওয়া চলবে না ডাক্তার। বৈষয়িক কিছু কাজকর্ম হাতে রয়েছে।

রজত সেন বললেন, আমি কি আপনাকে কালই যেতে বলছি কাজকর্ম সেরে নিয়েই যান। আচ্ছা, এবার বলুন তো, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ওই মেয়েটির মা'র নাম শুনেই কি?

—তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।

—ব্যাপারটা কি?

—সে অনেক কথা! বলতে পারো আমার ফেলে আসা জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভাল কথা, কয়েক রাত ভাল ঘুম হয়নি। আজও হবে বলে আমার মনে হয় না। যদি—

রজত সেন দ্রুত গলায় বললেন, কি বলতে চাইছেন বুঝেছি। আপনার কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়া চলবে না। এই স্বাস্থ্যে ওসমস্ত একেবারে খাপ খায় না। আজ রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দিন। কাল ডঃ মুখার্জীকে ডেকে আনছি—ও'র সঙ্গে কনসাল্ট করেই যাহোক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

—বেশ।

গোটা কয়েক পান মুখে ফেললেন বিরাজমোহন।

—ডাক্তার—

—বলুন?

—তোমার কি এখন কোন দরকারি কাজ আছে?

—কাজ · মানে···চেম্বারে গিয়ে বসতাম আর কি?

—তুমি আমার জীবনের অনেক কিছুই জান। তবে আজ তোমাকে এমন কিছু বলতে চাই যা তোমার জানা নেই। মন ভারী হয়ে উঠেছে। ঘটনাটা খুলে বললে কিছুটা হাল্কা বোধ হয়ত করব।

—প্রসঙ্গটা বোধহয় প্রমীলা কর সম্বন্ধীয়।

—হ্যাঁ।

—শোনার আগ্রহ আমারও কিছু কম নয়। এক কাজ করি বরং ঘণ্টা দেড়েক চেম্বারে কাটিয়ে ফিরে আসি।

—সেই ভাল। রুগীদের একেবারে নিরাশ করা ঠিক হবে না।

রজত সেন এবার বিদায় নিলেন।

বিরাজমোহন খাট থেকে নামলেন। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বসলেন বড় সোফাটার উপর। পাশের নিচু টেবিলের উপর টেলিফোন রাখা রয়েছে। ক্রেডেলের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়েল করলেন।

কয়েকবার রিং হবার পর সারা পাওয়া গেল।

বিরাজমোহন প্রশ্ন করলেন, অধীর মিত্র আছেন?

. ...

—আমি করগুপ্ত কথা বলছি—এই সময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখীত—

....

—সে কথা আমি কালীর মুখ থেকে শুনেছি—আপনি কাল কোর্টে যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন—

... ..

—নিশ্চয়—গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই—এখন কি আপনি খুব ব্যস্ত আছেন—

....

—ব্যাপারটা আর কালকের জন্য ফেলে রাখতে চাইছিলাম না—আসতে পারবেন কি—ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার মত ব্যস্ত এ্যটর্ণিকে কিছু বলতেও ভয় করে—

....

—আধঘণ্টার মধ্যে আসছেন—ধন্যবাদ—

বিরাজমোহন রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ওদিকে—

একতলার পূর্বদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেমকিশোর সিগারেট ধরাচ্ছিল। কালীনাথ দাঁড়িয়েছিল কাছেই। প্রেম একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। দ্রুত হাতে কালী সিগারেট ধরাল। দুজনের মধ্যে এখানে দাঁড়িয়েই কয়েক মিনিট ধরে কথাবার্তা হচ্ছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রেমকিশোর বলল, আমায় আপনি নতুন কোন কথা শোনাতে পারলেন না কালীবাবু। সবই জানি। টাকা পয়সা থাকলে আমিও ওরকম বোলচাল ঝাড়তে পারতাম।

—মন্দ বলেননি। তবে কি জানেন, কর্তা একরোখা লোক। একবার মুখ থেকে যা বেরিয়েছে তার নড়চড় হবে না।

—তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমার কি করার থাকতে পারে বলুন?

টাকাটা শোধ করে দিন না। আখেরে ভালই হবে আপনার।

—দেব বললেই তো দেওয়া যায় না। চার হাজার টাকা দু'মাসের মধ্যে জোগাড় করা কি মুখের কথা।

— তা বটে।

ও কথা যাক। ওই মেয়েটা কে কালীবাবু ?

মুচকি হেসে কালীনাথ বলল, সুন্দরপানা মেয়েটার কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ, মশাই।

—বলতে পারব না। এই প্রথমবার দেখছি কিনা।

—ওর মার নাম শোনার পরই তো মেজকাকা খাবি খেতে আরম্ভ করলেন। একটা গোলমালের গন্ধ পাচ্ছি। একটু খোঁজটোজ নিন তো।

এ আর এমন বড় কথা কি। ইয়ে···দশটা টাকা হবে—মানে, ডোজ পড়লে কাজে উৎসাহ পাব আর কি।

প্রেমকিশোর পকেটে হাত ঢোকাল।

—পাঁচ টাকা দিতে পারি।

– তাই দিন।

প্রেমকিশোর সবে মাত্র পকেট থেকে হাত বার করেছে, এই সময় একজনকে দ্রুতপায়ে এই দিকেই আসতে দেখা গেল। দোহারা চেহারা। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। বিরাজমোহনের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

না থাকার কথাও নয়, ইনি বিরাজের ছোটভাই ধীরাজমোহন। অবশ্য নিজের ভাই নন–বৈমাত্র। হাজরা রোডে ওষুধের দোকান আছে। থাকেন এই বাড়িতেই। দরওয়ানের মুখ থেকে এই মাত্র শুনেছেন, বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছে। মন তেতো হয়ে উঠেছে তখনই। দাদার কাছে আত্মীয়স্বজনরা ঘেঁসতে থাকুক, তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

কাছে এসেই ধীরাজ প্রশ্ন করলেন, কি মনে করে প্রেমকিশোর ?

এই কাকাকে প্রেমকিশোর সুনজরে দেখে না।

বলল উত্তাপহীন গলায়, কি মনে করে মানে ?

—বড় একটা আস নাতো তাই—

—কালেভদ্রে আসি বলেই তো তোমার খুশি হবার কথা। মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ভীষণ বিরক্ত হয়েছ।

ভারী গলায় ধীরাজমোহন বললেন, গুরুজনদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় আজও শিখলে না। দাদার শরীর ভাল থাকে না। বাড়িতে ভিড় বাড়লে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন বলেই—

—খুব ভাল কথা। এক কাজ করলে পারতে। কোন কোন বাড়ির সামনে বোর্ড টাঙানো থাকে দেখেছ তো। তাতে লেখা থাকে, প্রবেশ করিবেন না। কুকুর আছে। তুমিও গেটের উপর একটা বোর্ড লটকে দাওনা। লেখা থাকবে, মূল্যবান গৃহকর্তা অসুস্থ। আত্মীয়স্বজনের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কথাটা শেষ করেই প্রেমকিশোর ওখান থেকে সরে পড়ল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ধীরাজমোহন বললেন, দেখলেন তো—

—কি করবেন। কালীনাথ বললেন, যুগের হাওয়া।

—যুগের নিকুচি করেছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো? বাড়িতে এত ভিড় কেন?

—কর্তা অসুস্থ। সকলে দেখতে এসেছেন।

—দলবেঁধে?

—তাইতো দেখছি।

—লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। প্রেমকিশোর কেন ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে আমি তো জানি। আপনি ছিলেন সে সময়, দাদা যখন ওদের সঙ্গে কথা বলছিলেন?

-ছিলাম।

কালীনাথ এবার আগাগোড়া সমস্ত কিছু বললে। নবাগতা মেয়েটির মা'র নাম শোনার পরই কর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সে কথাও বাদ দিলেন না। শুনতে, শুনতে ধীরাজমোহনের মুখের উপর শ্রাবণের ঘনঘটা নেমে এল। আর তিনি কথা বাড়ালেন না, নয়নতারা কোন্ ঘরে আছেন জেনে নিয়ে পা চালালেন।

দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে নয়নতারা তখন গুম হয়ে বসে আছেন। বছর কয়েক আগে বিরাজমোহনের কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা নিয়েছিলেন। টাকাটা যে কোনদিন ফিরিয়ে দিতে হবে ভাবেননি। অবশ্য এখন ফিরিয়ে দিতে পারলে লাভেরই সম্ভাবনা। কিন্তু দেবেন কোথা থেকে?

দরজার কাছে শব্দ হওয়ায় চমকে মুখ ফেরালেন।

ধীরাজমোহন ঘরে এলেন।

মুখ তার অসম্ভব গম্ভীর। বোনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে খাটের সামনেকার ডেকচেয়ারে বসলেন জুত করে। মন্থর ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। অনায়াস ভঙ্গিতে টান দিলেন বারকয়েক।

—আজ রাতটা তোমরা তাহলে এখানে থাকছ?

নয়নতারা সঙ্কুচিত হলেন।

—কি করব বল, দাদা বললেন।

—তাতো বটেই। তারা, একটা কথা না বলে থাকতে পাচ্ছি না, দাদা নিজের উইলে তোমাদের জন্য কেন ব্যবস্থা রাখবেন বলতে পার?

—আমি তার কি জানি। আমি তো দাদার মনের মধ্যে ঢুকিনি। উনি বললেন, আমাদের একটা সুযোগ দেবেন।

—বাজে কথা।

—তুমি বলতে চাও—

ধীরাজমোহন বাধা দিয়ে বললেন. বলার মত কথা আমার কাছে একটাই আছে। কান খুলে শোন। আমি হলাম দাদার সবচেয়ে কাছের লোক। উত্তরাধিকারী বলতে আমি ছাড়া দুনিয়ায় আর ওঁর কেউ নেই।

—উনি তো বললেন, ধার শোধ করে দিলে—

—ঘ্যান ঘ্যান করো না। তোমাদের বুদ্ধির বলিহারি। এখনো চিনতে পারনি বুড়োকে। বকেয়া টাকা আদায় করবার এটা একটা কায়দা, বুঝলে।

নয়নতারা এবার নিজেকে কিছুটা অসহায়বোধ করতে লাগলেন। কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। পরে বেশি দেবার লোভ দেখিয়ে ধার দেওয়া টাকাটা আদায় করার ফন্দী। বুড়ো যে ভারী ধড়িবাজ তাতে তো কোন সন্দেহ নেই।

নিজেকে সামলে নিয়ে নয়নতারা বললেন, তুমি ঠিকই বলছ। আমাদের উনি নাচাচ্ছেন।

—নাচিয়ে মজা পাচ্ছেন বলতে পার। ওই সঙ্গে ধার দেওয়া টাকাও ফিরে পাবার সম্ভাবনা রইল।

—আমি অনেক আশা নিয়ে আছি ছোড়দা।

—কিসের আশা

—দুটো মেয়ে এখনো বাকি। তাদের বিয়ে দিতে হবে। ভেবেছিলাম—

—মেয়েদের বিয়ের জন্য চিন্তা করো না। কিছুটা নরম গলায় ধীরাজ বললেন, আমি তো রয়েছি। দাদার সমস্ত কিছু হাতে এসে পড়লে আমিই ব্যবস্থা করে দেব।

—দেবে তুমি!

—আমি এক কথার মানুষ সবাই জানে। তবে প্রেমকিশোরের কোন আশা নেই। ছোঁড়া ভারী বজ্জাত। দেখলে অবশ্য বোঝার উপায় নেই, থাকে ভিজে বেড়ালের মত। ভাল কথা, একজোড়া নতুন মুখ বাড়িতে এসেছে নাকি?

—তোমায় কে বলল?

—কালীবাবুর মুখে শুনলাম। আরো শুনলান, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার সময়ই দাদা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

নয়নতারা আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছেন।

বললেন উৎসাহের সঙ্গে, আর বল কেন? সে এক কাণ্ড। মেয়েটা যেই নিজের মায়ের নাম বলল, অমনি উনি নেতিয়ে পড়লেন।

—নেতিয়ে পড়লেন।

—তবে আর বলছি কি?

—তারপর—

—তারপর আর বিশেষ কিছু নেই। সুস্থও হয়ে উঠলেন মেজদা সঙ্গে সঙ্গে, রাতটা আমাদের থেকে যেতে বললেন।

ধীরাজমোহনের ভ্রু কুঁচকে উঠল।

কয়েকমিনিট কি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, নতুন যে ছেলেটা এসেছে, মেয়েটার কেউ হয় নাকি?

—হয় না বলেই তো মনে হল।

—হুঁ! মেয়েটার মায়ের নাম কি?

—চামেলি বলল বোধহয়।

—সবই তো আন্দাজে চালাচ্ছ দেখছি। ভেবে-চিন্তে বল না, নামটা চামেলি না, আর কিছু?

নয়নতারা এবার দ্রুত গলায় বললেন বলতে ভুল করেছি। নামটা চামেলি নয়, প্রমীলা কর।

ধীরাজমোহনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

তারপর বাঁকা হাসি দেখা দিল।

—সেই হাফগেরস্থ মেয়েমানুষটা। তার নাম শুনে দাদা নেতিয়ে পড়লেন কেন? নতুন করে নাটক আরম্ভ হচ্ছে তাহলে।

—তুমি চেন ওদের?

—চিনি না, জানি।

—কি রকম?

—বয়সকালে দাদা একটু ইয়ে ধরনের ছিলেন জান তো? প্রমীলাকে তখনই ম্যানেজ করেছিলেন। তারপর—

—তুমি এসমস্ত জানলে কি করে?

বিজ্ঞের হাসি হেসে ধীরাজমোহন বললেন, জানি বলেই তো বলছি।

—কিভাবে জানলে তাই বল না?

—গতবছর দাদা দিন কুড়িকের জন্য পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওই সময় ওঁর কাগজপত্র একটু ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম।

এর সঙ্গে প্রমীলা করের সম্পর্ক কি?

—আছে—আছে। ব্যস্ত হয়ো না, বলছি। দাদার নিয়মিত ডায়রি লেখার অভ্যাস আছে তুমি বোধহয় জান না। ডায়রিগুলো পড়তে পড়তেই অনেক কিছু জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা, একটা দুঃশ্চিন্তা যে আমায় পেয়ে বসেছে।

—আবার কি হল?

—ছুঁড়িটা হঠাৎ এল কেন?

—তাইত, এল কেন?

—এমন নয়তো, প্রমীলা কর মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েছে। সে এখন নিজেকে দাদার মেয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় আছে।

—আশ্চর্যের কিছু নয়।

—তাই যদি হয়—

নয়নতারার মুখে এবার বাঁকা হাসি দেখা দিল।

বললেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেই তালেই আছে। যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, ওই ছুঁড়িটা মেজদার মেয়ে, তাহলে কিন্তু তুমি অথৈ জলে গিয়ে পড়বে। ভাইয়ের চেয়ে মেয়ের অধিকার অনেক বেশি জানতো?

—হুঁ। ভাবিয়ে তুলল দেখছি। তারা, এক কাজ করলে হয় না—

—কি কাজ—

—মেয়েটাকে সরাতে হবে। তুমি যদি একটু গা লাগাও তবেই সম্ভব।

এরপর নয়নতারা আর ধীরাজমোহনের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। প্রণিমাকে ঘিরেই আলোচনা পাক খেলো বলা বাহুল্য।

রাতের খাওয়া শেষ হল সাড়ে নটার মধ্যেই।

সন্ধ্যার মুখেই এ্যটর্ণি অধীর মিত্র এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। হাতে প্রচুর কাজ ছিল, তবু আসতে হল তাঁকে। পয়সাওয়ালা ক্লাইন্টদের চটানো যায় না। রজত সেন অবশ্য পূর্ব-কথামত এসেছিলেন। কিন্তু অধীর মিত্রকে দেখে বিদায় নিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে তাঁর থাকাটা ঠিক নয়। বন্ধ ঘরের মধ্যে বিরাজমোহন আর মিত্রর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়েছিল।

কাশীনাথই সকলকে ডেকে আনল খাবার ঘরে।

খাবার টেবিলে কথাবার্তা বিশেষ হয়নি। বিরাজমোহন গম্ভীর মুখেই খেয়ে গেছেন। নয়নতারা আর ধীরাজমোহন মাঝে মধ্যে দুচার কথা বলেছেন। এই পরিবেশ একেবারেই ভাল লাগছিল না প্রণিমার। মার কথা মনে রেখে, আর সোনারপুরের দূরত্বটা অনেক ভেবেই এখানে রয়ে গেছে আজকের মত। সকালে নটার ট্রেনটা ধরবে স্থির করে রেখেছে। অবশ্য তার আগে মার কাছ থেকে আনা চিঠিখানা বিরাজমোহনকে দেবে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর প্রণিমা সিঁড়িতে পা দিল। তার জন্য দোতলার ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে। কয়েক ধাপ উঠে যাবার পর পিছনে শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। বিরাজমোহন উঠে আসছেন।

—শোন—

উনি বললেন।

তখন একটা কথা জেনে নেওয়া হয়নি।

প্রণিমা থামল।

—তুমি এলে কেন? তোমার মা আসতে পারতেন।

—তাঁর শরীর তেমন ভাল নেই। হয়ত—দেখুন, আমি ঠিক জানিনা তিনি নিজে কেন এলেন না।

—কোন চিঠি দিয়েছেন?

বিরাজমোহন প্রণিমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—হ্যাঁ।

—চিঠিখানা কোথায়?

—এই যে—

প্রণিমা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের মধ্যে থেকে খামে মোড়া চিঠিখানা বার করল। খামখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন উনি। তারপর ড্রেসিং গাউনের পকেটে চালান করে দিলেন।

—শুয়ে পড় গিয়ে। কাল সকালে তোমার সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলব।

প্রণিমা আর দাঁড়াল না। দ্রুত উঠে গেল উপরে। ঘরে এসে দেওয়াল হাতড়ে আলো জ্বালল। ঘরের ওধারে একটা খোলা বারান্দা। ক্লান্তভাবে ওখানে এসে দাঁড়াল প্রণিমা। নিচেকার বাগান আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে। এধারের প্রতিটি ঘরের সঙ্গে খোলা-বারান্দা যুক্ত। প্রণিমা হাই তুলল। নভেম্বর মাস শেষ হতে চলল, অথচ ঠাণ্ডার নাম গন্ধ নেই। আরেকবার হাই তুলে ফিরে এল ঘরে।

আলো নিভিয়ে দিল।

গা ঢেলে দিল বিছানায়।

ওদিকে—

বিরাজমোহন নিজের ঘরে পেঁছে গেছেন। টেবিলের উপর থেকে পানের ডিবেটা তুলে নিলেন। দুটো পান ফেললেন মুখে। পানে অল্প মাত্রায় জর্দা দেওয়াই থাকে.। অন্যান্য দিনের মত আজ নেশায় তেমন জুত পাচ্ছেন না। চিন্তার পোকা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে মাথার মধ্যে।

ধীরাজ ঘরে ঢুকলেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ভায়ের দিকে বিরাজমোহন।

—কিছু বলবে ?

—বাড়িতে বড় ভিড় বেড়ে গেছে। তুমি ওদের রাত্রে এখানে থাকতে বলেছ নাকি ?

—কৈফিয়ত চাইছ ?

—না···মানে···

—বাড়িটা আমার, একথা নিশ্চয় তোমাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে না ? কাকে আমি এখানে থাকতে বলব, আর কাকে থাকতে বলব না, তা আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে।

ধীরাজমোহন থতমত খেলেন।

—তা তো বটেই। মানে···

কথা বাড়িও না। নিজের ঘরে যাও।

ধীরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

—শোন—

থামলেন কনিষ্ঠ। উৎসুক ভাবে তাকালেন জ্যেষ্ঠের দিকে।

শুনেছ বোধহয়, আমি সকলকে জানিয়ে দিয়েছি, দু'মাসের মধ্যে ধার নেওয়া টাকা যে ফেরত দেবে. তার ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করব।

—শুনেছি।

—ওষুধের দোকান স্টার্ট করার সময় তুমি আমার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা নিয়েছিলে। টাকাটা ফেরত চাই না। চাইলেও দিতে পারবে না জানি। তোমাকে শুধু এই বাড়ি ছাড়তে হবে। সামনের মাসের প্রথম দিকেই তুমি অন্যত্র নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে আশা করছি।

—কিন্তু দাদা—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। কারণ আমি সম্পূর্ণ ঝাড়া হাত পা হবার পরই তোমাদের সম্পর্কে বিবেচনা করব।

ধীরাজমোহন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

—বেশ।

—একটা বাসা দু একদিনের মধ্যেই ঠিক করে নাও। সামনের মাসের প্রথম দিকেই উঠে যাবে। এখন যেতে পার।

মাথা নিচু করে ধীরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিরাজমোহন চাবি সমেত তালাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। ছিটকিনি লাগালেন! তারপর দুই পাল্লার সঙ্গে যুক্ত, পেতলের কড়া দুটোয় তালা পরিয়ে চাবি দিলেন। দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বসলেন সোফায়। ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে প্রণিমার দেওয়া খামটা বার করে আনলেন এবার।

অল্প দামী খাম।

খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন—

মান্যবরেষু,

আমার চিঠি পেয়ে তুমি বিরক্ত হবে জানি। তবু না লিখে থাকতে পারলাম না। খবর পেয়েছি তুমি অসুস্থ। নিজে গিয়ে দেখে আসার সাহস হল না। প্রণিমাকে পাঠালাম। তোমার মেয়ে এখন কতবড় হয়ে গেছে দেখ। ওকে সব কথাই বলেছি। আমাদের সম্পর্কে কি ভাবছে জানি না।

তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো কামনা করি। তারপর যদি অনুমতি দাও, তবে একবার গিয়ে দেখে আসব। প্রণাম নিও।

প্রমীলা।

চিঠিখানা দুবার পড়লেন বিরাজমোহন। খামের মধ্যে ভরে আবার পকেটে রাখলেন। ফেলে আসা দিনের অনেক কিছু মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। প্রণিমা—তাঁর মেয়ে, ভারী মিষ্টি দেখতে হয়েছে। সে যে নিজের মায়ের পাপকে ক্ষমা করে এখানে এসেছে, এও কম কথা নয়।

বিরাজমোহন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সুবীর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে ঢুকল। মনের অবস্থা তার সুবিধার নয়। পিতৃবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বেশ ঝামেলায় পড়ে গেছে। মোট কথা, বিরাজমোহনকে তার পছন্দ হয়নি। ভদ্রলোক ধনী হতে পারেন, ভদ্র নন।

সুবীর খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সিগারেট ধরাল।

এখন সে সরাসরি ধানবাদ থেকেই আসছে। কর্মস্থলও ওখানে। নামকরা মেডিকাল কম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি। ইউনিয়ানের রেস্টহাউসে থাকে। অবসর সময় হৈ-হৈ করে কাটিয়ে দেয়। দায়-দায়িত্বও বিশেষ নেই। নিজের বলতে আছেন একমাত্র মা। তিনি থাকেন কৃষ্ণনগরে। অর্থাৎ দেশের বাড়িতে।

মাঝে মাঝে যায় বাড়িতে, মার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসে। বিয়ের ব্যাপারে উনি তাড়া দেন। বিয়ের ব্যাপারে সুবীরের অনিচ্ছা নেই। তবু সে হেসে পাশ কাটিয়ে যায়। এই ভাবেই চলছিল। বিরাজমোহনের চিঠিখানা পেল মাস দুয়েক আগে।

চিঠিখানা কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছিল। বিরাজমোহন লিখেছিলেন, তিনি ওর পিতৃবন্ধু। বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান। সুবীর অবিলম্বে তাঁর কলকাতার বাড়িতে এলে খুশি হবে।

বিরাজমোহন করগুপ্ত নামে কাউকে সুবীর চেনে না। বাবার মুখেও তাঁর নাম কখনো শোনেনি। তিনি বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন। সুবীর চিঠিখানাকে বিশেষ গুরুত্ব দিল না। এরপর ভুলেই গিয়েছিল।

চিঠির ব্যাপারটা তাজা হয়ে উঠল আবার গত সপ্তাহে। ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। কৃষ্ণনগর পেঁছিবার পরের দিন সুবীর একটা চিঠি পেল। কোন এক কালীনাথ ঘোষ লিখেছেন বিরাজমোহনের শরীর খুব খারাপ। এ যাত্রায় সেরে উঠবেন কিনা সন্দেহ। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চান। আগামী ২৩শে নভেম্বর এলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

আবার বিরাজমোহন ?

সুবীর মার কাছ থেকে জানতে চাইল, এই নামে তিনি কাউকে চেনেন কিনা। জানা গেল খুব ভাল ভাবেই চেনেন। কর্তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এ বাড়িতেও এসেছেন কয়েকবার। এবার সুবীরের কাছে বিরাজমোহনের গুরুত্ব বেড়ে গেল। তাছাড়া মাও বললেন, উনি যখন দেখা করতে চাইছেন তখন দ্বিধা না করে তোমার নিশ্চিত ভাবে যাওয়া উচিত।

এরপরই কলকাতা চলে এসেছে।

কিন্তু এখানকার হালচাল দেখে ঘাবড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সুবীর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে, খোলা বারান্দা ছেড়ে ঘরে এল। গা ঢেলে দিল বিছানায়।

সচকিত হয়ে পূর্ণিমা বিছানায় উঠে বসল।

দরজায় মৃদু করাঘাত হচ্ছে। ঘুম না আসায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল বলেই শব্দটা শুনতে পেয়েছে। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। এগারটা বেজে গেছে কয়েক মিনিট আগে। এত রাতে আবার কে এল ?

আবার করাঘাত। এবার একটু জোরে।

একটু ইতস্ততঃ করে প্রণিমা দরজা খুলে দিল।

নয়নতারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল প্রণিমা, আপনি! এত রাত্রে?

—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কাল বলবেন। এখন—

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নয়নতারা বললেন, কাল নয়, আজই। সকলের সামনে বলা যাবে না। তাই এখন আসতে হল।

তিনি প্রণিমাকে আপত্তি করার আর কোন সুযোগ না দিয়ে, একরকম জোর করেই ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বভাবতই তিনি একটু বেপরোয়া ধরনের। এই অভদ্রতায় প্রণিমা বিলক্ষণ বিরক্ত হল।

রাগত গলায় বলল, এই জুলুমের কোন মানে হয় না।

—জুলুম আবার কি? বললাম না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আমি আপনাকে চিনি না। এটা জুলুম ছাড়া কি? কোন কথাই আমার সঙ্গে আপনার থাকতে পারে না।

টেনে টেনে নয়নতারা বললেন, কথার তো বেশ বাঁধুনি আছে দেখছি। যা বলতে এসেছি, কান খুলে শোন। কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

—আপনার হুকুমে?

বলতে পার।

—কেন? আপনার কথাতে আমি এ বাড়িতে আছি তা নয়। আপনি বললে আমি যাব কেন?

তীক্ষ্ন গলায় নয়নতারা বললেন, ভেবেছিলাম, ইসারাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। কিন্তু তুমি যে এত বোকা ভাবতে পারিনি। পরিষ্কার করেই বলি তাহলে, তোমার মা'র সঙ্গে এ বাড়ির কি সম্পর্ক ছিল আমি জানতে পেরেছি। ওই বিশ্রী ব্যাপারটা আরো জানাজানি হোক আমি চাইনা। তোমাকে তাই ভোরেই এ বাড়ি ছাড়তে বলছি।

অপমানে প্রণিমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

দৃপ্ত গলায় বলল, বাজে কথা বলবেন না। কি জানেন আপনি?

—তুমি কি চাও, সেই সমস্ত নোংরা কথা পরিষ্কার করে বলি?

—বেরিয়ে যান ঘর থেকে। আপনার মত মহিলার মুখ দেখাও পাপ। দাঁড়িয়ে থাকবেন না আর, আমি বলছি বেরিয়ে যান—

নয়নতারা ঠিক এতটা আশা করেননি।

ধীরাজমোহনের কথায় এ ঘরে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, একটু চোটপাট করলেই মেয়েটা সরে পড়বে বাড়ি থেকে। কিন্তু এমন ভাবে যে ফুঁসে উঠবে ভাবা যায়নি।

এখন ব্যাপারটা হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে।

গলা চড়িয়ে নয়নতারা বললেন, কি বললে! আমাকে—

—হ্যাঁ। আপনাকে। বেরিয়ে যেতে বলেছি ঘর থেকে।

সুবীরের ঘরখানা লাগোয়া।

গোলমালের শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। দ্রুতপায়ে চলে এল ঘটনাস্থলে। অবাক হয়ে গেল দুই মহিলার ভাবভঙ্গী দেখে।

—কি হয়েছে?

—দেখুন না—প্রণিমা বলল, রাত দুপুরে এই মহিলা এসে আমায় যা তা বলে অপমান করছেন।

নয়নতারা ঝলসে উঠলেন, যা সত্যি তাই বলেছি। মান অপমানের জ্ঞান থাকলে তুমি এ বাড়িতে পা দিতে না।

—আমাকে এ সমস্ত কথা বলতে এসেছিলেন কেন? এ বাড়ি আপনার দাদার। —তাঁকে বললেই পারতেন। তিনিই আমাকে থাকতে বলেছেন।

নয়নতারা আর দাঁড়ালেন না।

জোরে জোরে পা ফেলে মিলিয়ে গেলেন বারান্দার বাঁকে।

সুবীর প্রশ্ন করল, কি বলছিলেন উনি?

প্রণিমা বিব্রত হল।

—এমন কি বলছিলেন যা—

– আমাকে বোধহয় বলা যাবে না?

– না।

— প্রশ্নটা করার জন্য দুঃখিত। শুয়ে পড়ুন এবার। চলি—

সুবীর নিজের ঘরের দিকে এগুলো।

প্রণিমার ঘর থেকে ফিরে আসার পর অনেকক্ষণ সুবীর জেগেছিল। মনের মধ্যে দোল দিয়ে যাচ্ছিল নানা কথা। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারেনি।

ঘুমটা ভাঙ্গল কিন্তু আচমকাই।

তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসার পরই, ঘুম ভাঙ্গার কারণ বুঝতে পারলো। দরজায় কে করাঘাত করছে। বিছানা থেকে নামার মুখেই জানালার দিকে দৃষ্টি পড়ল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই কাক-ভোরে তাকে আবার কে ডাকছে।

সুবীর গিয়ে দরজা খুলল।

প্রণিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে সুবীর প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

—আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল।

— বলেন কি! দরজা খোলা রেখেছিলেন?

—আপনি চলে আসবার পরই বাড়ির ভেতরের দিকের বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

—চলুন, গিয়ে দেখি।

—সে তো ভেতর বাড়ির দিকে পালিয়েছে। দেখুন, মানে··· আমার ভীষণ ভয় করছে। তাই আপনাকে এই ভাবে—

সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আপনি তো কাঁপছেন দেখছি। বলুন তো কি হয়েছিল? তার আগে ভেতরে এসে বসুন।

পূর্ণিমা সুবীরের পিছু পিছু ঘরের মধ্যে গেল।

বসল চেয়ারটায়।

থেমে থেমে বলল, বলতে গেলে সারা রাতই আমি জেগে আছি। একে নতুন জায়গা, তার উপর ওই মহিলার কাণ্ডকারখানা ঘুম আসবে কোথা থেকে? কিছু পত্রপত্রিকা ছিল ঘরে। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওগুলোর উপরই চোখ বোলালাম। তারপর আলো নিভিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি আরো কিছুক্ষণ। তন্দ্রার মত এসেছিল। এই সময়—

—লোকটা ঘরে ঢুকলো কি ভাবে?

—খোলা বারান্দার দরজা দিয়ে।

—তার মানে দরজাটা আপনি বন্ধ করেননি?

—গরম লাগছিল বলে খোলা রেখেছিলাম। তাছাড়া দোতলায় ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়নি। লোকটাকে দেখার পর এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে চেঁচাতে পর্যন্ত পারিনি।

—তারপর?

—সে কিন্তু আমার দিকে আসেনি! ঘরে অপেক্ষাও করেনি। ভেতর বাড়ির বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে সরে পড়েছে।

চিন্তিত গলায় সুবীর বলল, বিচিত্র ব্যাপার। দোতলার পথ দিয়ে চোর ঢুকলো। তারপর ভেতর বাড়ির দিকে চলে গেল। তাও আবার ভোরবেলা।

পূর্ণিমা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ঘটনাটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি বলতে চাইছেন, আমি মিথ্যে কথা বলছি।

—এই দেখুন, আপনি আমার উপর রেগে যাচ্ছেন। ব্যাপারটার মধ্যে একটা খাপছাড়া ভাব থাকায় আমি স্বাভাবিক কারণেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। চলুন, দেখা যাক লোকটা কোথায় গেল।

পূর্ণিমা আর কিছু বলল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

টানা বারান্দা খাঁ খাঁ করছে।

ওরা পূর্ণিমার ঘরের মধ্যে দিয়ে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচে থেকে এর উচ্চতা ষোল ফিটের কম হবে না। চোর বা যেই হোক সে উঠল কি ভাবে। দেওয়ালে একটা খাঁজ পর্যন্ত নেই। একই ধরনের খোলা বারান্দা দুপাশের দুটো ঘরেও রয়েছে। পূর্ণিমা জানে, একটাতে সুবীর ছিল, অন্যটায় বিরাজমোহন। বাড়ির আর কে কোন্ ঘরে আছেন তা তার জানা নেই।

সুবীর বলল লোকটা তো ভেতর দিকে গেছে। নিচে নেমে গেছে নিশ্চয়। ওদিকেই যাওয়া যাক, চলুন—

দুজনে আবার ঘর পেরিয়ে ভেতর দিকের বারান্দায় এল।

তখনো সেখানে কেউ নেই।

বিরাজমোহনের ঘরের দরজাটা সিঁড়ির মুখেই। দরজার পাশেই বড় একটা জানালা। বন্ধ কাচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে মৃদু আলোর আভায় পাওয়া যাচ্ছে। জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় সুবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বেডরুম ল্যাম্পের নীলচে আলোয় ঘরের চারিধার কেমন আবছা হয়ে রয়েছে। তবু সুবীরের দেখতে অসুবিধা হল না, কে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে মেঝের উপর!

— কি হল?

মুখ ফিরিয়ে সুবীর বলল, ঘরের মধ্যে দেখুন।

পূর্ণিমা এগিয়ে এসে দৃশ্যটা দেখল।

সুবীর আবার বলল, এই ঘর তো বিরাজবাবুর—

'কাঁপা গলায় পূর্ণিমা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু—

—তাহলে উনিই পড়ে রয়েছেন ওই ভাবে।

—অসুস্থ মানুষ। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বোধহয় পড়ে গেছেন।

—অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধহয়। কি করা যায় বলুন তো?

পূর্ণিমা কিছু বলার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তারপরই দেখা গেল কালীনাথ উপরে উঠে আসছে। তার চাল চলনে কোন ব্যস্ততা নেই। গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ির মাথায় এসেই থমকে গেল। এই সময় কাউকে দেখতে পাবে এখানে আশা করেনি।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, আপনারা

— চোর এসেছিল।

— চোর!

পূর্ণিমাকে দেখিয়ে সুবীর বলল, এঁর ঘরে চোর ঢুকেছিল। কোথায় পালাল তাই আমরা দেখছিলাম।

—বলেন কি! আমি নিচে কাউকে দেখলাম না তো। তবে আমার সাড়া পেয়ে ঘাপটি মেরে কোথাও বসে থাকতে পারে। কিন্তু—

একটা কথা মনে হওয়ায় সুবীর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, এত সকালে আপনি উপরে এলেন—

—আমি নিয়মিত এই সময় আসি। কর্তাকে ঘুম থেকে তুলে দিই। তারপর উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ বাগানে বেড়ান।

— আজকের অবস্থাটা অন্যরকম। মনে হচ্ছে বিরাজবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওই দেখুন—

কালীনাথ কাচের পাল্লার উপর ঝুঁকে পড়ল।

তারপরই দ্রুত গলায় বলল, কি সর্বনাশ। কর্তা এইভাবে পড়ে আছেন কেন? দরজা ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করল কালীনাথ। ভারী পাল্লার দরজা ভেতর দিক দিয়ে বন্ধ। একচুল নড়লো না। সুবীরের বুঝতে অসুবিধা হল না, এই দরজা ভাঙতে গেলে বেশ কয়েকজন লোকের দরকার। কালীনাথও বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা।

সে দ্রুত অদৃশ্য হল নিচে।

মিনিট দশেক পরের দৃশ্য অন্যরকম।

বাড়ির সকলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জানালা দিয়ে দেখেছেন দৃশ্যটা। সকলের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এবার অবশ্য দরজা ভেঙে ফেলতে কোন অসুবিধা দেখা দিল না॥ পাল্লা দুটো খুলে পড়তেই হুড়মুড় করে সকলে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নয়নতারা প্রথমে কথা বললেন।

—মেজদার একি হল? অসুস্থ মানুষ, ওঁর কি রাতে একা থাকা উচিত। কারুর কথাতো শুনবেন না—

—তুমি থামবে কি?

ধমকের সুরে বোনকে কথাটা বলে ধীরাজমোহন আর সকলের দিকে তাকালেন।

—ওঁকে বিছানায় শোয়ানো দরকার।

ধরাধরি করে বিরাজমোহনকে বিছানায় শোয়ানো হল। সোজা করে শোয়ানো গেল না। শরীর কুঁকড়ে গেছে। শক্ত হয়ে উঠেছে। কপাল আর নাকের উপরকার চামড়া ছড়ে গেছে।

চরম কথাটা শোনাল প্রেমকিশোরই।

—উনি মারা গেছেন।

দ্বিধাজড়িত গলায় ধীরাজমোহন বললেন, অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। অনেক দিন আগে একবার কালীবাবু. আপনি তো—

—বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রেমকিশোর আবার বলল, আমি বলছি উনি মারা গেছেন।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিই বরং—

কালীনাথ এগিয়ে গেল ফোন স্ট্যান্ডের দিকে।

নয়নতারা কান্না-ভেজা গলায় কি সমস্ত বলে চলেছেন বোঝা গেল না। সুবীর এই সময় লক্ষ্য করল, প্রণিমা ঘরে নেই। সুবীরও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দায় পা দিয়েই দেখল, রেলিং ধরে প্রণিমা দাঁড়িয়ে আছে। জল গড়িয়ে পড়ছে তার দু'চোখ বেয়ে।

সুবীর দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেল।

—কি হয়েছে।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো প্রণিমা।

—কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে। আমাকে বোধহয় বলা চলে না।

— আপনাকে—

সুবীরের গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল. আমি আপনার অপরিচিত। এই বাড়িতেই দুজনের প্রথম দেখা। তবু আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। অস্বস্তিকর এই পরিবেশে হয়ত আমি আপনার কাজে লাগতে পারি।

ভেজা চোখে সুবীরের দিকে তাকাল পূর্ণিমা।

বলল কাঁপা গলায় উনি আমার বাবা ছিলেন।

— বিরাজবাবু !!!

- হ্যাঁ।

— কিন্তু –

— আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। বিশ্বাস করুন, এক সপ্তাহ আগে একথা আমিও জানতাম না।

— আপনাকে বললেন বোধহয়—

-মা। নিজের জন্মবৃত্তান্ত শোনার পর সমস্ত শরীর ঘৃনায় রি রি করে উঠেছিল। মা এখানে আমায় আসতে বললেন। আসতে চাইনি। কিন্তু বার বার বলতে থাকায় আসতেই হল।

পূর্ণিমা থামল।

কি বলবে সুবীর ভেবে পেল না।

আবার বলল পূর্ণিমা, গতকাল এ বাড়িতে এসে ওঁকে দেখার পর বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছিল - কিন্তু এখন, চোখের জল চাপতে পাচ্ছি না!

ওদিকে –

খবর পেয়েই রজত সেন চলে এসেছেন।

দেহ পরীক্ষা করার অবশ্য কিছু ছিল না। খালি চোখেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন বিরাজমোহন। তবু দেহ পরীক্ষা করার জন্য ডা. সেন ঝুকে পড়লেন। নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন। ওঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুঁকলেন কি যেন।

তারপরই চমকে উঠলেন যেন।

—কি রকম দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

ধীরাজমোহনের প্রশ্নে রজত সেন মুখ ফেরালেন।

বললেন, অন্ততঃ চার ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। বডিতে রাইগার মার্টিস সেট আপ করে গেছে।

—দাদা, সত্যি মারা গেছেন। হে ভগবান, একি হল ?

নয়নতারা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

ধমকে উঠল প্রেমকিশোর।

—মড়া কান্না থামাও পিসি। ওর প্রতি তোমার যে কত ভক্তি—শ্রদ্ধা ছিল,

তাতো সকলেই জানে। থাম দয়া করে। আর লোক হাসিও না। ডাঃ সেন, এবার তাহলে—

সেন বললেন, কি বলুন তো ?

—এবার সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

—বডি অবশ্য আর ফেলে রাখা চলে না। তবে আমার মনে হয় না, সৎকারের ব্যাপারটা খুব সহজে মিটবে।

—কেন ?

— আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারব না।

— দিতে পারবেন না কেন ?

- সম্ভব নয় বলেই দিতে পারব না। আপনারা আমার কথা শুনুন, যদি ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেতে চান, তবে এখুনি পুলিশে খবর দিন।

পুলিশ !!!

ঘরের মধ্যে যেন এভারেস্টের চূড়া ভেঙ্গে পড়ল।

সকলে বিহ্বল অবস্থায় তাকালেন ডাঃ সেনের দিকে।

দ্রুত গলায় বললেন ধীরাজমোহন, পুলিশের কথা উঠছে কেন ? এ সমস্ত কি বলছেন আপনি ?

রজত সেন বললেন, এখন আমার যা বলা উচিত, আমি তাই বলছি। ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। আমার পক্ষে তাই ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আপনি বলতে চাইছেন, উনি আত্মহত্যা করেছেন ?

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ডাঃ সেন বললেন, আত্মহত্যা কি আর কিছু তার বিচার আমি করব না। ডাক্তার হিসাবে বুঝতে পেরেছি, এটা ন্যাচারাল ডেথ নয়। আমার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। এর পরের কাজ হল পুলিশের। কালীবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। থানায় খবর পাঠান।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ডস্ট্রীটের ড্রয়িংরুমে তখন গল্পের আমেজ। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক। সদ্য সমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনের পর এখন দেশের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তাই নিয়ে দুজনের মতের মিল হচ্ছিল না।

—দেশে পঞ্চাশটা রাজনৈতিক দল শৈবাল বলেছিল, মাথা ফাটাফাটি করে চলেছে এটা কোন কাজের কথা নয়। দেরি হলেও, শেষ পর্যন্ত যে একত্রিত হয়ে কাজে নামতে পেরেছে, এটা সুবুদ্ধিরই পরিচয় বলতে হবে।

বাসব দাঁতে পাইপ চেপেই বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি একমত। তবে কতদিন একসঙ্গে থাকতে পারবে এটাই হল কথা। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এবার থাক। বরং—

তখন থেকে আলোচনার মোড় ঘুরে গেছে।

বাসব বলল, কুকুরের সাহায্যে অপরাধীকে ধরবার প্রচলন আজকের পৃথিবীতে সর্বত্র আছে। এরজন্য তাদের যথেষ্ট শিক্ষাও দেওয়া হয়। কিন্তু কুকুর ছাড়াও এমন কিছু জন্তু আছে যাদের আমরা কাজে লাগাতে পারলে উপকৃত হব। অথচ বলতে গেলে সেদিকে কোন সরকারের দৃষ্টি নেই।

শৈবাল প্রশ্ন করল. তুমি কোন্ জন্তুর কথা বলছ ?

—বাঁদরের কথাই ধর। তাদের যে বুদ্ধি আছে তাতো আমরা জ্ঞান হয়ে অবধি শুনছি। কিন্তু এই বুদ্ধিমান জীবটিকে পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট কখনো কাজে লাগিয়েছে শুনেছ ?

— না, শুনিনি।

—তবেই দেখ। অথচ কাজে লাগাতে পারলে কুকুরের কান ওরা স্বচ্ছন্দে কেটে দেবে।

বাসব পাইপ ধরাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, গত উইকের 'নর্দান অবজার্ভার' বোধহয় তুমি দেখনি ?

—দেখেছি। সব আর্টিকাল পড়া হয়নি।

—ওতে একটা সত্য-ঘটনামূলক রচনা আছে। ওই রচনার মূল চরিত্র হল একটা বাঁদর।

—কি রকম ?

—উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে—জায়গাটার নাম মনে পড়ছে না—একটা লোক বাঁদরের খেলা দেখিয়ে বেড়াত। এ-গ্রাম সে-গ্রাম করে রোজগারপাতি সে ভালই করত। তার পোষা বাঁদরটাও নানা খেলাধুলায় ছিল এক্সপার্ট। একদিন বাঁদরওয়ালা একটা গ্রামে খেলা দেখিয়ে জংলা পথ ধরে অন্য লোকালয়ে যাচ্ছিল। তখন ভরা দুপুর। কিছুদূর যাবার পর সে একটা গাছতলায় বসল। থলি থেকে খাবার বার করে নিজে খানিকটা নিল, খানিকটা দিল বাঁদরটাকে। আহার পর্ব চলতে লাগল ধীরে সুস্থে।

এই সময় সেখানে ষণ্ডামার্কা একজন লোক উপস্থিত হল; বাঁদরওয়ালার সঙ্গে হয়ত তার চেনাজানাও ছিল। দু-চার কথার পর সে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঁদরওয়ালার উপর। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরটা লোকটার পা খামচে ধরল। ছোরার ঘায়ে বাঁদরওয়ালা তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আততায়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝটকা মেরে বাঁদরটা ঝেড়ে ফেলল। আবার আক্রমণ করল। আততায়ী এবার ছোরা চালাল। বাঁদরটা অবস্থা বুঝে লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ল। ওই সঙ্গে ছিঁড়ে নিয়ে গেল আততায়ীর জামার কিছু অংশ। হত্যাকারী এবার আরো বারকয়েক ছোরা চালিয়ে নিশ্চিন্ত হল বাঁদরওয়ালার মৃত্যু সম্পর্কে। তারপর সমস্ত টাকাকড়ি হাতিয়ে, কিছুদূরের আলগা ভেজা মাটির তলায় বডিটা পুঁতে ফেলল।

হত্যাকারী স্থানত্যাগ করার পর বাঁদরটা নেমে এল গাছ থেকে। তারপর রওনা দিল লোকালয়ের উদ্দেশে। কাছাকাছি গ্রামে সেদিন হাটবার। লোকে লোকারণ্য। বাঁদরটা পেঁছাল হাটে। কয়েকজন লোককে টানাটানি করে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। যা স্বাভাবিক তাই ঘটল। সোরগোল পড়ে গেল চারিধারে। লাঠি নিয়ে মারতে তেড়ে গেল কয়েকজন। অগত্যা বাঁদর-প্রবর একটা গাছের মগডালে গিয়ে বসল। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে প্ল্যান ভাঁজল বোধহয়। তারপর হঠাৎ নেমে এসে একজন অসতর্ক দোকানদারের ক্যাশবাক্স তুলে নিয়ে লম্বা ছুট দিল জঙ্গলের দিকে। হৈ-হৈ পড়ে গেল। বহুলোক ছুটলো তার পিছু পিছু। গ্রামের চৌকিদারও তাদের মধ্যে একজন।

বাঁদরটা কিন্তু এগাছ ওগাছ করতে করতেই যাচ্ছিল। বলাবাহুল্য সে দুর্ঘটনাস্থলে পেঁছাল আগে। দ্রুত হাতে মৃতদেহ যেখানে পোঁতা ছিল সেখানকার কিছু মাটি সরিয়ে দিল। তারপব কাছের গাছটায় উঠে বসে রইল। বিস্ময়ের ব্যাপার, বাঁদরটা ক্যাশবাক্স রেখে এসেছিল মৃতদেহের কাছেই। লোকজনবাও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ল দুর্ঘটনাস্থলে। তাদের চক্ষুস্থির। শুধু ক্যাশবাক্স নয়, রক্ত মাখামাখি একটা দেহের কিছু অংশও তারা দেখতে পেয়েছিল। এই তো হল ব্যাপার ডাক্তার। বাঁদরটার চাতুর্য তোমায় অবাক করেনি বলতে চাও?

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, করেছে। মৃতদেহ কোথায় আছে সকলে যাতে জানতে পারে, তাই সে টাকার বাক্স নিয়ে দৌড় দিয়েছিল। টাকাটা ফেরৎ পাবার জন্য লোকে তার পিছু নেবেই। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার স্বীকার করতেই হচ্ছে।

– তাই বলছিলাম ডাক্তার, এই ধবনের জন্তুদের ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু বকে বকে আমার গলা তো শুকিয়ে গেল। বাহাদুরের সন্ধান কর না। চা বা কফি যাহোক দিয়ে যাক।

শৈবাল ওঠার উপক্রম করতেই দেখা গেল, বাহাদুর আসছে। মুখ নির্বিকার। হাতে ট্রের উপর দুকাপ ধূমায়িত পানীয়।

ওরা দুটো পেয়ালা তুলে নিল।

—বাহাদুবের বিবেচনা বোধকে তারিফ করতেই হয়।

—শুধু সুখ্যাতি করলে তো ওর পেট ভরবে না। সামনের মাস থেকে ওর দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও।

শৈবাল আরো কিছু বলতে যাবার আগেই পোর্টিকোয় গাড়ি থামার শব্দ হল। এ-সময় আবার কে এল! মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দুজনে। মিনিট দুয়েকেয় মধ্যেই আগন্তুক হাসি মুখে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। তিনি আর কেউ নন, হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের বড়কর্তা পুরন্দর সামন্ত।

মৃদু হেসে বাসব বলল, কি মশাই পথ ভুলে নাকি?

বসতে বসতে সামন্ত বললেন, এ অভিযোগটা বড় পুরানো হয়ে গেছে। আপনি নিজে কতবার আমাদের ওদিক মাড়ান।

—তাহলে কাটাকাটি হয়ে গেল।

—এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আপনার এখানে ঢুঁ মেরে যাই। কিন্তু আমার চা কই?

—ধৈর্য্যং রহু। আমাদের বাহাদুরের কান্ডজ্ঞান আছে। এসে পড়ল বলে। তা আপনি এধার দিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?

— এলগিন রোড।

—কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি?

—না। মানে

—আর বলতে হবে না। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। হোমিসাইডের বড়কর্তা যখন লালবাজার থেকে বেরিয়েছেন তখন ব্যাপার অবশ্যই গুরুতর। কেসটা কি?

বিরাজমোহন করগুপ্তর নাম শুনেছেন

বাসবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

— না। কোন কেউকেটা লোক নাকি?

—নাম করা কেউ নয়। বড়লোক ছিলেন। দিন তিনেক হল পটল তুলেছেন।

—অর্থাৎ খুন হয়েছেন।

—ঠিক তাই। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।

—স্থানীয় থানার হাত থেকে ব্যাপারটা যখন লালবাজারে গিয়ে পৌঁছেছে তখন গোলমেলে না হয়ে যায় না।

—গোলমাল এড়াবার জন্য কিনা জানিনা, বিরাজমোহনের আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইছে। আমরা অবশ্য নিশ্চিত হয়েছি এটা নির্ভেজাল খুন। যাবেন নাকি ঘটনাস্থলে?

এই সময় বাহাদুর চা নিয়ে উপস্থিত হল।

সামন্ত পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল সময় তো হাতে প্রচুর রয়েছে। বুদ্ধিতে মরচে ধরিয়ে লাভ নেই। যাওয়া যেতে পারে। তার আগে কিন্তু আপনাকে ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বলতে হবে।

—অবশ্যই।

সামন্ত পেয়ালা শেষ করে নামিয়ে রাখলেন।

—তবে খুঁটিয়ে বলার মত অবস্থায় আমিও নেই। যতদূর জানি বলছি। বিরাজমোহন খুব সুবিধার লোক ছিলেন না। ব্যবসার একটা ঠাট বজায় ছিল —আসলে তিনি বে-আইনি কায়দায় রোজগার পাতি করতেন। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারায় পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। বিয়ে থা করেননি। বয়স পঁয়ষট্টির কম ছিল না।

—উত্তরাধিকারী কে?

—সে কথায় পরে আসছি। আত্মীয়-স্বজনের ফিরিস্তিটা আগে জেনে নিন। ছোট ভাই ধীরাজমোহন দাদার সঙ্গে থাকত। ওষুধের কারবার আছে। নবব্যারাকপুরে থাকেন এক খুড়তুতো বোন। নাম নয়নতারা। এক ভাইপো আছে। ছোকরার নাম প্রেমকিশোর। কারুর প্রেমেট্রেমে পড়েছে কিনা জানি না। 'লারসান অ্যান্ড গিবস' কম্পানিতে কাজ করে। এরা ছাড়া আরো দুজন দুর্ঘটনার সময় ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিল।

– তারা কারা ?

—একজন সুবীর সোম। বিরাজমোহনের বন্ধুর ছেলে। কৃষ্ণনগর থেকে এসেছিল। দ্বিতীয়জন হল ভারী মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে। এই পূর্ণিমা করের ইতিহাস একটু বিচিত্র ধরনের - জবানবন্দীর কপি আমার সঙ্গেই আছে, পড়লেই বুঝতে পারবেন।

—নিশ্চয় পড়ব। তারপর কি হল বলুন ?

—সেদিন বিরাজমোহনের শরীর ও মন ভাল ছিল না। সন্ধ্যার পর নিজের এ্যটর্ণিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কি সমস্ত পরামর্শ হয়েছিল দুজনের মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া চুকে যায় দশটার মধ্যে। বাড়ির সকলে শুতে চলে যায় যে যার ঘরে। একটা কথা বলা হয়নি, সে রাত্রে নয়নতারা, প্রেমকিশোর, পূর্ণিমা আর সুবীর বিরাজমোহনের কথায় ওই বাড়িতে থেকে গিয়েছিল।

— ব্যাপারটা ঘটে কখন ?

—পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট অনুসারে রাত সাড়ে এগারটা থেকে একটার মধ্যে। মৃতদেহ অবশ্য আবিষ্কৃত হয় সকালে। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ভেঙ্গে ঢুকতে হয়। তখন সকলে ভেবেছিল স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু গৃহ-চিকিৎসক রজত সেন দেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে মৃতের মুখ থেকে সাইনাইডের গন্ধ পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন মৃত্যু কোন্ পথ বেয়ে এসেছে। স্বাভাবিক কারণেই তিনি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন। এবং বাড়ির সকলকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে পুলিশে খবর পাঠাতে বাধ্য করেন।

একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না —

—কোন্ ব্যাপার ?

—আপনি যাদের নাম আগে করেছেন, সকলে একই দিনে ওই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কেন ?

—এ প্রশ্ন আমাদের মনেও জেগেছিল। খোঁজ নিয়ে যা জানলাম তাও বিচিত্র।

—কি রকম ?

—প্রত্যেকে একখানা করে চিঠি পেয়েছিলেন। বক্তব্য : বিরাজমোহনের শরীর খুব খারাপ। অমুক তারিখে বিকেলে দেখা করুন।

– পত্রলেখক কে ?

—কালীনাথ ঘোষ।

—কালীনাথ মানে……

—বিরাজমোহনের বাজার সরকার কাম ম্যানেজার। বলাবাহুল্য কালীনাথ চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করেছে। আমরা তার হাতের লেখার সঙ্গে চিঠি-গুলো মিলিয়ে দেখেছি। মিলছে না।

বাসব নড়ে চড়ে বসল।

লোকটা কেমন?

– ঘোড়েল মার্কা মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে সে সন্দেহের বাইরে।

—তার মানে কেউ একজন কালীনাথের নামের আড়ালে নিজেকে রেখে—প্রত্যেককে চিঠি পাঠিয়েছিল। সে চেয়েছিল একই দিনে সকলে বিরাজমোহনের কাছে আসুক। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

—আমরাও ওই 'কেন'র উত্তর খুঁজছি। কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনার পরও সমাধানের কূলে পেঁছানো যাচ্ছে না।

—আচ্ছা, মৃত্যুটাকে যদি অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা যায়। এটা হত্যা নয়, আত্মহত্যা। পটাশিয়াম সাইনাইড খেয়ে কেউ যে কখনো আত্মহত্যা করেনি তা তো নয়।

সামন্ত মৃদু হাসলেন।

—কেন করবে না? কয়েক বছরের রেকর্ড ঘাটলে দেখা যাবে এই কলকাতাতেই হাজার কয়েক লোক সাইনায়েড খেয়ে মরেছে। তবে এ-ব্যাপারটা সে-রকম নয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি। যেমন ধরুন, ডেড বডি পড়েছিল মেঝের উপর হুমরি খেয়ে। যে জেনে বুঝে মরেছে সে ওই ভাবে পড়ে থাকবে কেন? তাছাড়া কোন চিঠিও পাওয়া যায়নি। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম তো স্বীকারোক্তি রেখে যাওয়া।

– হুঁ। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল বললেন না। ওই ঘরে ঢোকবার আর কোন পথ আছে?

—ঘরখানা দোতলায়। বাগানের দিকে ঝোলা বারান্দা আছে। ওই দিকের দরজাটা খোলা ছিল।

—হত্যাকারী ওই পথ দিয়েই ঢুকেছিল তাহলে?

—তাই তো মনে হয়। ঝোলা বারান্দার নিচে আমরা একটা মই পেয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মইটা ওখানে থাকার কথা নয়।

– মইটা দাঁড় করানো ছিল?

—না। ঘাসের উপর পড়েছিল।

—আপনি নিশ্চয় বলতে চাইছেন, হত্যাকারী ওই পথ দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল। হতে পারে। ভাল কথা, বিরাজমোহন যে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রেখেছিলেন, তাতে কি ইয়েল লক লাগানো আছে?

—না। আরো পাকা ব্যবস্থা ছিল।

—কি রকম?

—ঠিক উড়ের সাবেকি দরজা। পিতলের ছিটকিনি আছে। এছাড়া লাগানো আছে দুটো কড়াও। গৃহকর্তা প্রত্যহ শুতে যাবার আগে তালা লাগাতেন ওই কড়ায়।

—দুর্ঘটনার দিনও তাহলে—

—হ্যাঁ। তালা লাগানো ছিল।

—বিচিত্র ব্যাপার।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন টান দিল।

কালচে বাদামী রং-এর ধোঁয়া ওর মুখের উপর কুয়াশা সৃষ্টি করে উপরে উঠে যেতে লাগল। ভ্রূ কুঁচকে ওই তালে চিন্তার জাল বুনলো মিনিট খানেক। তারপর প্রশ্ন করল।

— আচ্ছা মিঃ সামন্ত, খোলা বারান্দা ওই একটাই — না, আরো আছে?

—আরো আছে। বাগানের দিকের প্রত্যেক ঘরে একটা করে লাগোয়া বারান্দা। বেশ সুদৃশ্য ব্যাপার আর কি।

—বারান্দাগুলোর মাঝের ব্যবধান বোধহয় খুব বেশি নয়?

—ফিট আড়াই তিন করে হবে।

—আমারও ওই রকম মনে হচ্ছিল।

—একটা নক্সা আমরা তৈরি করেছি। আপনি দেখলেই ওই বাড়ির দোতলা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

— নক্সাটা কাছে আছে ?

—আছে। দেখাচ্ছি।

ব্রীফকেশ মাটিতে নামানো ছিল। ওটা কোলে তুলে নিয়ে খুললেন সামন্ত। প্রচুর কাগজপত্র রয়েছে। ঘেঁটেঘুটে তার মধ্যে থেকে একটা হাল্কা সবুজ রং-এর কাগজ বার করলেন। তারপর ভাঁজ খুলে বিছিয়ে দিলেন সেণ্টার টপের উপর।

বাসব ঝুঁকে নক্সাটা দেখতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে বাসব মুখ তুলল।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, সমস্ত শুনলেন। নক্সাটাও দেখলেন। কি রকম বুঝছেন ব্যাপারটা ?

— এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। প্রচুর চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। ভাল কথা, জবানবন্দীর কপি টপি কাছে আছে নাকি ?

মৃদু হাসলেন সামন্ত।

- আপনার কাছে যখন এসেছি মশাই, তখন তৈরি হয়েই এসেছি।

উনি এক গোছা কাগজ ব্রীফকেশ থেকে বার করে এগিয়ে ধরলেন।

বাসব কাগজগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—পড়ে দেখি। তারপর হয়ত কিছু আঁচ করা যেতে পারে। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।

ডাক্তার তুমি ততক্ষণ লক্ষ্য রাখ যাতে সামন্তসাহেব একঘেঁয়েমির শিকার না হয়ে পড়েন।

সামন্ত ওর স্বভাব জানেন। কাজেই হৃষ্টচিত্তে তিনি শৈবালের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বাসব পাশের ঘরে গিয়ে হ্যারিংটন চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে জবানবন্দীতে মনোনিবেশ করল।

খুঁটিয়ে পড়তে সময় লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট।

ওই বাড়ির প্রত্যেকের জবানবন্দীর সারাংশ নিম্নরূপ—

ধীরাজমোহন

—বয়স ছাপান্ন। প্রায় দশ বছর আগে পত্নী বিয়োগ হয়েছে। আর বিয়ে করেননি। সন্তানাদি নেই। বৈমাত্রেয় দাদার বাড়িতেই থাকেন। ওষুধের দোকান আছে। চলে ভালই। দাদা মূলধন জুগিয়ে ছিলেন। দুর্ঘটনার আগে বিকেলে বা সন্ধ্যার মুখে তিনি বাড়ি ছিলেন না। প্রত্যেক দিন ওই সময় তিনি দোকানে থাকেন। কয়েকজন যে দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এ কথা তাঁর জানা ছিল না! অতিথিদের আগমন সংবাদ পেয়েছেন, বাড়ি ফিরে আসার পর দাদার বাজার সরকার কালীবাবুর মুখ থেকে। প্রণিমা কর বা সুবীর সোমকে চেনা দূরের কথা, আগে নাম পর্যন্ত শোনেননি।

খাওয়ার আগে খুড়তুতো বোন নয়নতারার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন। প্রসঙ্গ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পারিবারিক। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে দাদার শোবার ঘরে গিয়েছিলেন। দু-চারটে সাংসারিক কথা হয়েছিল। বিরাজমোহন তখন বেশ স্বাভাবিক ছিলেন। ওখান থেকে তিনি নিজের ঘরে শুতে চলে যান। একতলার দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরখানা তাঁর। হিসাব-পত্রের কাজ শেষ করে যখন বিছানা নেন, তখন রাত পৌনে বারটা। রাত্রে একবারও বেরোননি ঘর থেকে। সকালে চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। তারপর জানতে পারেন দাদার মৃত্যুর কথা। তিনি বিশ্বাস করেন না, দাদাকে কেউ খুন করেছে। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু না হয়ে থাকলে কেসটা আত্মহত্যার।

নয়নতারা দেবী

—ধীরাজমোহনের সম্পর্কে খুড়তুতো বোন। নবব্যারাকপুরের আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তনের শিক্ষিকা। থাকেন ওখানে। ওঁর স্বামী রাইটার্সে চাকরি করেন। বয়স বাহান্ন। এখনও বেশ চটপটে আছেন। তিন মেয়ের মা। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কয়েক বছর আগে। তখন বিরাজমোহন কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন বোনকে। তারপর থেকে এতদিন দাদার বাড়ি আসেননি নানা কারণে। হঠাৎ কালীবাবুর চিঠিতে জানতে পারেন, বিরাজ-মোহন অসুস্থ। দেখা করতে চেয়েছেন। সেই মত তিনি চলে এসেছিলেন।

দাদার মুখোমুখি হয়ে তাকে কিন্তু হতাশ হতে হয়। কারণ বিরাজমোহন

শুধু তাঁকে নয়, উপস্থিত অনেককেই বাঁকা কথা শোনাতে থাকেন। শেষে বলেন, দু'মাসের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে নেওয়া টাকা যারা শোধ করে দেবে. উইল করার সময় তাদের সম্পর্কে তিনি বিবেচনা করবেন। গৃহকর্তা থেকে যেতে বলেছিলেন বলেই তাঁর নবব্যারাকপুর সেদিন ফেরা সম্ভব হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার আগে ধীরাজমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা নয়। মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা। সাড়ে দশটার সময় শুয়ে পড়েন। ভোরে ঘুম ভাঙ্গে চেঁচামেচিতে। উনি বিশ্বাস করেন না বিরাজমোহন খুন হয়েছেন। তিনি বদরাগী – মানুষের সম্মানে আঘাত দিয়ে কথা বলতেন। অনেকে তাঁর উপর বিরক্ত ছিল ঠিকই তাই বলে কেউ তাকে খুন করে বসবে এমন হতে পারে না।

প্রেমকিশোর

—বিরাজমোহনের সম্পর্কে ভাইপো। বয়স বত্রিশ বছর। 'লারসান অ্যান্ড গিবস' কম্পানিতে কাজ করে। এখনো বিয়ে করেনি। মেসে থাকে। কালীবাবুর চিঠিতে বিরাজমোহনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সেদিন ও-বাড়িতে সে গিয়েছিল। বিরাজমোহন যে তাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন বা সে যে জ্যাঠাকে শ্রদ্ধাভক্তি করত তা নয়···আসল কথা হচ্ছে আশা ছিল, শেষ পর্যন্ত হয়ত ও'র উইলে তার নামটা যুক্ত হবে। এই কারণেই সে মাঝে মাঝে ও বাড়িতে যাওয়া আসা করত।

দুর্ঘটনার আগের বিকেলে সকলের সামনে জ্যাঠা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি। ব্যাপারটা সে অবশ্য গায়ে মাখেনি। কারণ ও'কে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। জ্যাঠার কাছ থেকে একবার কিছু টাকা নিয়েছিল সে। উনি তখন এ-রকম ইঙ্গিতও করেছিলেন, ওই টাকা শোধ করে দিলে উইলে তার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখবেন। সে রাত্রে বাধ্য হয়েই তাকে থেকে যেতে হয়েছিল ওই বাড়িতে। সন্দেহজনক কোন কথা তার কানে আসেনি বা কিছু চোখে পড়েনি। খাওয়া-দাওয়ার পরই শুয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙ্গেছে চেঁচামেচিতে। পুলিশের সন্দেহ মিথ্যা নয়। বিরাজমোহনকে যে কেউ খুন করতে পারে। বদ স্বভাবের লোক। অনেককে তিনি জ্বালিয়েছেন। তবে কি ভাবে তিনি খুন হয়েছেন বা কে এই কাজ করেছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।

ডঃ রজত সেন

—বয়স একচল্লিশ। ওই বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বছর পাঁচেকের। বিরাজমোহন হার্টের রুগী ছিলেন। আর্থারাইটিসও ছিল। তাঁর চিকিৎসায় উনি ভাল থাকতেন। ও'র মত বদরাগী ও স্বাধীনচেতা লোকও চিকিৎসকের কথা মেনে চলতেন। ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে গাফিলতি করতেন না। কয়েক-দিন থেকে রাত্রে ও'র ঘুম হচ্ছিল না। আর্থারাইটিসও চাগাড় দিয়েছিল।

মারা যাবার আগের বিকেলে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। প্রমীলা কর—এই নামটা শোনার পর তাঁর উত্তেজিত উত্তেজনা আরো বাড়ে। বলতে গেলে এরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশ্য নিজেকে সামলে নেন অল্পক্ষণের মধ্যেই। আত্মীয়-স্বজনেরা ঘর থেকে চলে যাবার পর বলেন, জীবনের কিছু গোপন কথা তাঁকে বলতে চান। চেম্বারে কিছু সময় কাটিয়ে ডাঃ সেন যেন আবার এখানে আসেন। সেইমত তিনি সন্ধ্যার সময় আবার ওই বাড়িতে যান। তখন বিরাজমোহন বলেন, প্রমীলা করের সঙ্গে অবশ্য ও'র বিয়ে হয়নি, তবে মহিলাকে উনি স্ত্রীর মর্যাদাই দিয়েছিলেন। অবশ্য বহু বছর দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই। পূর্ণিমা তাঁর মেয়ে। মেয়েকে দেখে এখন মন ভরে উঠেছে।

বেশ স্বাভাবিক ভাবেই তখন কথাবার্তা বলছিলেন। অবশ্য ওই আলোচনা বেশিদূর এগোবার অবসর পায়নি। ও'র এ্যটর্ণি অধীর মিত্র এসে পড়েন। বৈষয়িক কোন ব্যাপার আছে আঁচ করেই ডাঃ সেন ওখানে আর অপেক্ষা করেননি। ভোরবেলা কালীনাথের ফোন পেয়ে ছুটে আসেন আবার। বিরাজমোহন মারা গেছেন শুনে প্রথমে অবাক হননি। হার্টের রুগীর যে কোন মুহূর্তে কোলাপস্ করবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বডির পজিসন দেখে তাঁর কেমন সন্দেহ হয়। সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় বডি পরীক্ষা করার সময় - খুব হাল্কা হলেও, মুখ থেকে সায়নাইডের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ডাঃ সেন ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া বিবেচনার কাজ মনে করেননি। পুলিশে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেন। বাড়ির লোকের কারুর কারুর ধারণা এটা আত্মহত্যা।

অধীর মিত্র

—বিরাজমোহনের এ্যটর্ণি। ও'র আইনঘটিত সমস্ত কাজকর্ম বহুদিন ধরে দেখাশুনা করছেন। অত্যন্ত বদরাগী লোক হলেও, মক্কেল হিসাবে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। ইদানীং স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। খুব বেশি দিন বাঁচবেন না, এই রকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল মনে। তাই টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির বিলি-বণ্টনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মাস চারেক আগে প্রথমবার তাঁর নির্দেশে উইলের খসড়া করেন মিঃ মিত্র। তবে সেই খসড়া দিন দুয়েক পরে তিনি ছিঁড়ে ফেলেন। দ্বিতীয় উইলের খসড়া তৈরি হয় দিন পনের আগে। আগামী সোমবার ওই উইল রেজিস্ট্রি হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। মারা যাবার আগের সন্ধ্যায় বিরাজমোহন ফোনে অধীর মিত্রকে ডেকে পাঠান। তখন ডাঃ সেন ওখানে ছিলেন। ডাঃ সেন চলে যাবার পর বিরাজমোহন জানতে চান, এখন কোন প্রভিশান আছে কিনা, যাতে উইল রেজিস্ট্রি না হলেও ভ্যালিড বলে গণ্য হবে?

উত্তরে মিত্র বলেন, যদি কেউ নিজের হাতে লিখে সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করে তবে তা ভ্যালিড হবে।

এই কথা শোনার পরই বিরাজমোহন আগের উইলখানা আলমারি থেকে বার করে এনে বললেন, এটা আর রেজিস্ট্রি হবে না। আমি মত পাল্টেছি। তারপরই তিনি সেই উইলখানা ছিঁড়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দেন। এরপর মিনিট দশেকের মধ্যেই মিঃ মিত্র ওখান থেকে বিদায় নেন।

প্রণিমা কর

—বয়স পঁচিশ বছর। ভারী মিষ্টি চেহারা। মাত্র দিন দুয়েক আগে সোনারপুরে মা'র কাছে এসেছিল ছুটি কাটাতে। এই সময় কালীনাথের চিঠি ওখানে পৌঁছায়। ওই চিঠিতে জানা যায় বিরাজমোহন খুব অসুস্থ। অবশ্য এলগিন রোডের বাড়িতে প্রণিমা প্রথমে আসতে চায়নি। মা অনেক খোশামোদ করায় আসতে রাজি হয়েছিল। অবশ্য এই সঙ্গে একথাও জানতে পেরেছিল, বিরাজমোহন তার জনক। যদিও তার মা'র স্বামী ছিলেন অন্য একজন। এতদিন এ সমস্ত কথা জানতে না পারার কারণ হল, সে ছোটবেলা থেকে বহরমপুরে মাসীর বাড়িতে আছে। মা মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে দেখা করে আসতেন। এখন ওখানকার এক সেলাই স্কুলে চাকরি করে। এক হপ্তার ছুটি নিয়ে মার কাছে এসেছিল।

এতদিন পরে মা কেন যে নিজের কেলেঙ্কারির কথা তাকে বললেন সে বুঝতে পারেনি। তবে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানার পরই আত্মধিক্কারে নুয়ে পড়েছিল। এত খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি সে আগে কখনো হয়নি। তবু শেষ পর্যন্ত মনকে বুঝিয়ে বিরাজমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নিজের জনককে দেখে প্রণিমার ভাল লাগেনি। এই সঙ্গে কিন্তু তার এ কথাও মনে হয়েছে, ওই ধনী, দাম্ভিক লোকটি যেন সুখী নয়—ভারী অসহায়।

ও'র আত্মীয়-স্বজনের সামনেই উনি প্রণিমার সঙ্গে কথা বলেন। বেশ স্বাভাবিক ছিলেন। কিন্তু মার নাম শোনার পরই বিরাজমোহন বিছানায় এলিয়ে পড়েন। তারপর নিজেকে সামলে নেবার পর, তাকে থেকে যেতে বলেন রাতটা। সকালে কথা বলবেন। অনিচ্ছার সঙ্গে প্রণিমাকে থেকে যেতে হয়। খাওয়া দাওয়ার পর বিরাজমোহন দু-চার কথা বলেন তাকে। তারপর নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই নয়নতারা এসে উপস্থিত হন। তিনি গায়ে পড়ে অপমান করতে আরম্ভ করেন। গোলমালের শব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসেন সুবীরবাবু।

এরপর নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রণিমা ঘুমিয়ে পড়ে। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় ভোর রাত্রে। খোলা বারান্দার দিক থেকে একটা লোক ঘরের মধ্যে ঢোকে। আবছা অন্ধকারে তাকে চেনা যায়নি। সে অবশ্য ভেতর বাড়ির বারান্দার দিকের দরজা খুলে সরে পড়ে। প্রণিমা ভয় পেয়ে সুবীরকে ডাকে।

দুজনের ধারণা হয় লোকটা চোর। চোরকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই ওরা জানলার এধার থেকে বিরাজমোহনের মৃতদেহ দেখতে পায়। এই সময় কালীনাথও নিচে থেকে উপরে আসে।

সুবীর সোম

—মা'র মুখ থেকে সে জানতে পেরেছিল, বিরাজমোহন তার বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কালীনাথের চিঠি পাবার পর—মার বিশেষ অনুরোধেই সে এসেছিল এ বাড়িতে। বিরাজমোহনের কথাবার্তা ও হাবভাব ভাল লাগেনি। উনি রাতটা থেকে যেতে বলেছিলেন। পরের দিন কি বিষয়ে যেন কথা বলবেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সে যখন তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম নেবার আয়োজন করছে তখন পাশের ঘরে কথা কাটাকাটির শব্দ শুনে গিয়ে দেখে, নয়নতারা-দেবী ধমকের সুরে প্রণিমাদেবীকে কিছু বলছেন। তার উপস্থিতিতে ব্যাপারটা মিটে যায়। নয়নতারাদেবী চলে যাবার পর সে নিজের ঘরে চলে আসে। আবার ভোরের দিকে সে প্রণিমার আহ্বানে দরজা খোলে। প্রণিমাকে তখন অত্যন্ত নার্ভাস দেখাচ্ছিল। একজন লোক নাকি ঝোলা বারান্দার দিক থেকে প্রণিমার ঘরে ঢোকে এবং ভেতর বাড়ির দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। চোর ছাড়া আর কে হতে পারে, এই ধারণা নিয়ে লোকটাকে দুজনে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে। তখনই জানলার মধ্যে দিয়ে ওরা বিরাজমোহনের মেঝেতে পড়ে থাকা দেহটা দেখতে পায়। তিনি খুন হয়েছেন কি আত্মহত্যা করেছেন, এ সম্পর্কে তার কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই।

কালীনাথ ঘোষ

—আদি নিবাস বর্ধমানে। বছর পনের ধরে কলকাতাতে আছেন। আগে স্ট্র্যান্ড রোডের গোদাবরী অয়েল মিলে খাতা লিখতেন। বিরাজমোহনের কাছে কাজ করছেন গত দশ বছর ধরে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্তই করতে হত। কাজেই কর্তার অনেক গোপন কাজ কারবারের সন্ধান তিনি রাখতেন। তবে এখন সে সব সম্পর্কে কিছু বলবেন না। কর্তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা তাঁর উচিত নয়। ঘিয়ে ভাজা চেহারা। দেখলেই মনে হয় চালাক চতুর।

কর্তার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি জেনে তিনি অবাক হননি। এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে আগেই আঁচ করেছিলেন। কর্তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমন একজন নেই যাকে ভাল বলা চলে। সকলেই বাগাবার তালে ঘুরঘুর করছে। এদের মধ্যে যে কেউ স্বার্থের খাতিরে এই হৃদয় বিদারক কাজ করে থাকতে পারে। কালীনাথের চিঠি পেয়েই সকলে সেদিন বিরাজমোহনের কাছে এসেছিলেন, একথা তিনি জোর গলায় অস্বীকার করেছেন। পরে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা গেছে চিঠিগুলি কালীনাথের লেখা নয়।

প্রমীলা কর

– সোনারপুরে থাকেন (পুলিশ ওখানে গিয়ে তাঁর এজাহার নিয়েছে) বয়স একান্ন। এককালে যে সুন্দরী ছিলেন এখনো তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। মাত্র একুশ বছরে বিধবা হন। নিম্নবিত্ত পরিবারে সচরাচর যা হয়ে থাকে—অল্প কিছুদিন পরেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিতে হল। বাপের বাড়ির অবস্থা আরো খারাপ ছিল। তাঁরা এই উটকো বোঝা ঘাড়ে নিতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শেষে এমন দিন এল যখন অসহায় প্রমীলা পেটের দায়ে বাবু ধরার কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে যখন ক্লান্ত তখনই ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল বিরাজমোহনের সঙ্গে। এরপরের পনেরটা বছর বিরাজমোহন তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেছেন। প্রণিমার জন্ম হয়েছে। সে একটু বড় হলেই, ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে বোর্ডিং-এ রাখা হয়েছে। সোনারপুরে একটা একতলা বাড়ি উনি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন প্রমীলাকে। পনের বছর পরে কেন জানা যায় না বিরাজমোহন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। সম্পর্কে ছেদ পড়লেও, আর্থিক দিক থেকে প্রমীলাকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। প্রতি মাসেই টাকা পাঠিয়ে গেছেন বিরাজমোহন। লোক মারফত নয় ডাকযোগে।

প্রণিমার কাছে এতদিন সমস্ত কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। লেখাপড়া শেষ করার পর সে তাঁর কাছে থাকত না। তাকে রাখা হয়েছিল বহরমপুরে তার মাসীর বাড়ি। ওখানে সে সেলাই স্কুলে কাজ করে। কাজেই ব্যাপারটা জানাজানি হতে পারেনি। কয়েকদিন আগে কালীনাথ ঘোষ নামে একজনের কাছ থেকে প্রমীলা চিঠি পেলেন। উনি বিরাজমোহমের কর্মচারি। কালীনাথ লিখেছেন, কর্তা অসুস্থ। এবং অমুক তারিখে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে যেতে বলেছেন। প্রমীলা ভাবনায় পড়ে গেলেন। ওখানে হঠাৎ যাওয়া যে ঠিক হবেনা, এটা তিনি বুঝলেন। চিন্তা ভাবনার পর শেষে স্থির করলেন মেয়েকে পাঠাবেন ওখানে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে হল সব কথা মেয়েকে। নিজের জন্ম ইতিহাস শুনে প্রণিমা গুম হয়ে গেল। বহু কষ্টে প্রমীলা মেয়েকে রাজি করালেন বাপের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর ওখানে কিভাবে কি ঘটেছে তার কিছুই জানেন না।

বাসব পড়া শেষ করল।

স্টেটমেন্টের কপিগুলো মুড়তে মুড়তে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইল সামনের দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের পেলগ্রীন রং'এর আস্তারণের উপর দিয়ে একটা টিকটিকি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাসবের কপালে ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করল। মিনিট পাঁচেক কি যেন ভাবল। তারপর আড়মোড়া ভেঙ্গে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

ফিরে এল আবার ড্রইং রুমে।

সাগ্রহে সামন্ত প্রশ্ন করলেন, কিছু আঁচ করতে পারলেন ?

বাসব বসতে বসতে বলল, কিছু পারিনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

কি রকম ?

—বিরাজমোহনের মৃতদেহ প্রথমে কে দেখেছিল ?

—আপনাকে তো আগেই বলেছি, প্রণিমা আর সুবীর।

—সে কথা আমি মনে রেখেছি। কিন্তু কথা ঠিক নয় মিঃ সামন্ত। ওদের দুজনের আগেই একজন জানতে পেরেছিল বিরাজমোহন মারা গেছেন।

সামন্ত মৃদু হেসে বললেন, স্বাভাবিক। হত্যাকারীর সবচেয়ে আগে জানবার কথা বিরাজমোহন মারা গেছেন।

হত্যাকারী নয়। আরো একজন।

—কে সে ?

—যাকে আপনারা প্রায় হত্যাকারী ভেবে নিয়েছেন।

অবাক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকালেন সামন্ত।

—কার কথা বলছেন ?

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, ভোর রাতে যে লোকটা প্রণিমার ঘরে ঢুকেছিল। আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই সে এক নম্বর সাসপেক্ট ?

—না হবার তো কোন কারণ নেই। তার অ্যাক্টিভিটি ওয়াচ করলে ব্যাপারটা গম্ভীর আকার নেয় না কি ?

—আপনার কথা অস্বীকার করি না। তবু একটু খুঁটিয়ে যদি চিন্তা করেন, বুঝতে অসুবিধা হবে না, সে আর যেই হোক, হত্যাকারী নয়। ব্যাপারটা এবার সহজ করে আনা যাক। পোস্টমর্টমের রিপোর্টের কথা স্মরণ করুন। আপনার মুখ থেকেই শুনলাম রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিরাজমোহন মারা গেছেন রাত একটার মধ্যে, নয় কি ?

—ঠিক তাই।

—অথচ আমরা এই আগন্তুকের সন্ধান পাচ্ছি ভোর চারটের পর।

—তা বটে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রাত এগারটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত আগন্তুক ওই ঘরে মড়া আগলে বসেছিল এটা নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায় না।

চিন্তিত গলায় সামন্ত বললেন, আপনার যুক্তিতে জোর আছে। তবে ওই লোকটার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে।

—অবশ্যই আছে। উদ্দেশ্যটা এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে না। তবে কি ভাবে সে বিরাজমোহনের ঘরে ঢুকেছিল তার একটা থিওরি খাড়া করা যায়।

—যেমন—

—আপনি বলেছেন, বিরাজমোহনের ঘরের ঝোলা বারান্দার নিচে একটা মই

পাওয়া গেছে। ওই মই বেয়েই লোকটা ভোর রাত্রের দিকে উপরে উঠেছিল। ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পায় গৃহকর্তা মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন। স্বাভাবিক কারণেই সে ভয় পায়। ওখানে থাকা আর সমীচিন মনে করে না। বারান্দায় এসে আরেক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় তাকে।

লক্ষ্য করে, মই দেওয়ালে ঠেস দেওয়া অবস্থায় নেই। হড়কে পড়ে গেছে ঘাস জমির উপর। ওধারের দরজা দিয়ে যে সরে পড়বে তার উপায়ও নেই। অভ্যাস মত বিরাজমোহন দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিলেন। চাবি খুঁজে নেওয়ার ঝুঁকি সে আর নিতে চায়নি। কারণ হয়ত চাবি পাওয়াও যাবে না, অথচ সময় নষ্ট হবে অনেক। তখন তার সামনে একটা পথই খোলা ছিল। পাশের খোলা বারান্দায় পড়া. তারপর ওই ঘর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। সে সেই কাজই করেছিল।

—আপনার থিওরি মোটামুটি বাস্তব ঘেঁসা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মি ব্যানার্জী।

– কোন্ প্রশ্ন ?

– যে লোক ঘরে ঢোকার দরজায় প্রতিদিন ছিটকিনি লাগিয়েই শান্তি পেতনা. তালা লাগাত। সে কি খোলা বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা রেখে দেবে ? ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।

চিন্তিত গলায় বাসব বলল, ভাল প্রশ্ন। আমিও আপনার সঙ্গে একমত। বিরাজমোহনের যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এমন আহাম্মক তিনি ছিলেন বলে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

—তাহলে লোকটা ওই ঘরে ঢুকেছিল কি ভাবে ?

—আমার মনে হয়, ওই দরজাটা মোটেই খোলা হত না। ছিটকিনি দেওয়াই থাকত। বিরাজমোহন ওধারে নজর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। ভাল কথা ওই দরজার সামনে পর্দা দেওয়া আছে কি ?

- আছে।

—পর্দা দরজার ফ্রেমে আটকানো না, পেলমেটে সেট করা ?

—পেলমেটের সঙ্গে আটকানো।

মৃদু হেসে বাসব বলল, তবে তো হিসাব মিলেই গেল। যে লোক ওই ঘরে ঢুকবে ঠিক করেছিল, সে কোন অসতর্ক মুহূর্তে খুলে রেখেছিল দরজাটা। সামনে পেলমেটের সঙ্গে যুক্ত পর্দা থাকায় কারচুপি ধরা পড়েনি।

—সে তাহলে ওই বাড়িরই একজন ?

— নিশ্চয়।

সামন্ত দ্রুত গলায় বললেন, এবার তাহলে আমাদেব ভেবে দেখা দরকার সে কে হতে পারে।

—তাকে চিনে ওঠা কঠিন হবে না।

—কি রকম ?

—প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে এই ধরনের কাজ কার পক্ষে করা সম্ভব, আমি শারীরিক পটুতা সম্পর্কে বলতে চাইছি। যেমন ধরুন, সে এমন একজন লোক যার বয়স বেশি নয়। চটপটে। বয়স্ক লোকেদের পক্ষে মই বেয়ে এতটা ওঠা বা এ বারান্দা থেকে ও বারান্দায় লাফিয়ে পড়া নিশ্চয় সম্ভব নয়?

— তা ঠিক।

বয়স কম হলেও সুবীর সোমকে কিন্তু বাদ দিতে হবে। আগন্তুকের আবির্ভাবে প্রণিমা ডেকে এনেছিল তাঁকে। কাজেই তিনি আগন্তুক হতে পারেন না।

—ওই একই কারণে প্রণিমাও বাদ পড়ে গেল।

– নয়নতারাদেবীও বাদ পড়লেন। কোন বয়স্কা বাঙ্গালী মহিলার পক্ষে এ একেবারে অসম্ভব কাজ।

— ধীরাজমোহনকেও বাদ দিতে হবে। বয়স ছাড়াও মোটা-সোটা লোক।

— কালীনাথকেও হিসাবে আনা যাচ্ছে না। বয়স্ক লোক।

ভারী গলায় সামন্ত বললেন, এরপর একজনই থাকছে, প্রেমকিশোর কর-গুপ্ত। বয়স কম। একহারা চেহারা।

— আমারও তাই মনে হয়। সবদিক থেকে প্রেমকিশোরকেই উপযুক্ত লোক মনে হয়। বাজিয়ে দেখতে হবে।

কথা শেষ করেই বাসব শৈবালের দিকে মুখ ফেরাল।

— ডাক্তার, আরেকবার চা খাওয়া চলতে পারে। বাহাদুরকে একবার খোঁচাওনা গিয়ে। আপনি কি বলেন মিঃ সামন্ত?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, মন্দ কি?

শৈবাল উঠে গেল।

বাসব আবার পুরানো কথার জের টানল, প্রেমকিশোর এখন আমাদের হাতের পাঁচ। কিন্তু আরো এগিয়ে যাবার জন্য গুটিকয়েক প্রশ্নের উত্তর এখন আমাদের দরকার।

—যথা—

—তারমধ্যে প্রধান হল, সকলেই ঘরের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে শোয়। অথচ বিরাজমোহন তালা লাগাতেন। এই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের কারণ কি?

—হয়ত—

—থামলেন কেন?

—হয়ত কোন মূল্যবান জিনিষকে রক্ষা করার জন্য তিনি এরকম করতেন।

—এটাই স্বাভাবিক। মূল্যবান জিনিষটা এখন খোওয়া গেছে।

—খোওয়া গেছে।

—সবই আমাদের অনুমান। হয়ত ওটাই হত্যার মোটিভ। পটাসিয়াম সায়নাইডের সাহায্যে বিরাজমোহনকে সরিয়ে দিয়ে হত্যাকারী মূল্যবান জিনিষটা

বাগিয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে —

বাসব কথা শেষ না করেই থামল।

তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, কালো টাকা। আপনি বলছিলেন না, বাঁকা পথ দিয়ে বিরাজমোহনের রোজগারের ব্যবস্থা ছিল।

—ছিলই তো। একথা পুলিশ যে জানত না তা নয়। লোকটা অত্যন্ত চতুর ছিল। প্রমাণের অভাবেই তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

—আর কোন সন্দেহ নেই। উনি নিজেও শোবার ঘরেই কালো টাকা রাখতেন। নিশ্চয় কেউ একথা জানতে পেরেছিল। লোভ সময় সময় মানুষকে উন্মাদ করে তোলে জানেন তো?

চা এসে পড়ল।

চা' এর কাপ তুলে নিয়ে চিন্তিত গলায় সামন্ত বললেন, আপনার অনুমান ঠিক পথ ধরেই এগিয়েছে। কালো টাকাই। নয়ত এত সতর্কতার কোন মানে হয়না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হত্যাকারী কে? প্রণিমা করের ঘরের মধ্যে দিয়ে লোকটা পালাল, আমাদের অনুমানে সে প্রেমকিশোর। তাকে হিসাব মত হত্যাকারী প্রতিপন্ন করা যাচ্ছে না। তাহলে কি বুঝতে হবে, হত্যাকারী কোনক্রমে বুঝতে পেরেছিল ঝোলা বারান্দার দিকের দরজা খোলা আছে? সেও কি ওই পথ দিয়েই বিরাজমোহনের ঘরে প্রবেশ করেছিল?

—হয়ত। আবার এমনও হতে পারে—ওকথা এখন থাক। বিরাজমোহনের কালো টাকা সম্পর্কে আপনি ওদের প্রশ্ন করেছিলেন?

—করেছিলাম।

—কে কি বলল?

এরপর সামন্ত যা বললেন তার সারাংশ নিম্নরূপ—

ধীরাজমোহন

—দাদা বাঁকা পথ দিয়ে টাকা রোজগার করতেন জানা ছিল তাঁর। এই সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি কখনো দুজনের মধ্যে। তবে একই বাড়িতে থাকার দরুন ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হত না। টাকাটা দাদা কোথায় রাখতেন তা অবশ্য তাঁর জানা নেই।

নয়নতারা

—দাদার একটা ব্যবসা আছে। তার দৌলতেই যে উনি বড়লোক একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কানাঘুসো শুনেও ছিলেন, দাদা স্মাগলিং বা ওই ধরনের কিছু করেন। ওই সমস্ত টাকা কোথায় রাখতেন তিনি জানেন না।

প্রেমকিশোর

—কলকাতার বোধহয় অর্ধেক লোক জানে উনি স্মাগলার। পুলিশের না জানার কথা নয়। কেন যে গ্রেপ্তার হননি এটাই আশ্চর্য। সে বাড়ির বাসিন্দা নয়, কাজেই তার জানার কথা নয় উনি কালো টাকা কোথায় রাখতেন।

রজত সেন

—বিরাজমোহনের আসল কারবার যে আইনসম্মত নয়, এটা সেন জানতেন। উনি কথারচ্ছলে বলেছিলেন কয়েকবার। বলে বাহাদুরী নিতেন। তবে কালো টাকা কোথায় রাখতেন একথা কাউকে বলার লোক উনি ছিলেন না।

কালীনাথ

—হিসাবের বাইরে অনেক টাকা কর্তাকে সে লেনদেন করতে দেখেছে। নানা জাতের লোক এসে টাকা দিয়ে যেত। কেন দিত তা অবশ্য সে জানে না। এই সঙ্গে এও জানে না এই সমস্ত টাকা কর্তা কোথায় লুকিয়ে রাখতেন।

প্রণিমা

—বিরাজমোহনের আয়ের উৎস কি ছিল তা জানা অনেক দূরের কথা—চব্বিশ ঘন্টা আগেও ভদ্রলোক দেখতে কেমন তাও তার জানা ছিল না। কাজেই উনি টাকা-পয়সা কোথায় রাখতেন তার জানার কথা নয়।

সুবীর

—মারা যাওয়ার আগের বিকেলে সে প্রথম বিরাজমোহনকে দেখে। ওঁর গুপ্তধনাগার সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি তার এও জানা ছিল না, উনি কোন পেষায় যুক্ত – অর্থাগম হয় বাঁকা না, সোজা পথ দিয়ে।

বাসব বলল, দেখা যাচ্ছে কেউ কিছু জানে না। আমার কিন্তু বিশ্বাস এদের কেউ একজন কিছু না কিছু জানে। এছাড়া আমি জোর গলায় বলতে পারি ঐ কালো টাকাই হল খুনের মোটিভ।

—আমারও তাই ধারণা।

সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন।

—এবার তাহলে যাওয়া যেতে পারে।

—দুর্ঘটনাস্থলে?

—হ্যাঁ।

—চলুন—

'বিরাজ ভবনে' একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

বছর আটেক আগে এই বাড়িখানা বিরাজমোহন এক পড়তি পরিবারের কাছ থেকে কিনে ছিলেন। পরে কিছু অদল বদল করে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন আজকের অবস্থায়। শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। প্রথমে একাই এখানে এসে উঠেছিলেন। পরে ছোট ভাই ধীরাজমোহনকে থাকার অনুমতি দেন।

সেই বিরাজমোহন আজ নেই।

'বিরাজ ভবন' তাই থমথম করছে।

বাড়িতে এখন অবশ্য ধীরাজমোহন একা নেই। খুনের দিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই রয়েছেন পুলিশের অনুরোধে। এক্ষেত্রে অবশ্য

অনুরোধের আরেক অর্থ হল আদেশ। সকলেই কিছুটা অস্বস্তির শিকার, কিন্তু করার কিছুই নেই। প্রমীলা কর গতকাল এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে গেছেন।

কালীনাথ বিরাজমোহনের অফিস ঘরে এসে ঢুকল। সুদৃশ্য সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের উপর পুরু কাচ পাতা। কয়েকদিনের উপেক্ষায় কাচের উপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। ক্রেডলের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিল কালীনাথ। একটা নম্বর ডায়েল করল।

ওধারে রিং হচ্ছে।

কেউ সাড়া দেবার আগেই কিন্তু বাধার মুখোমুখি হতে হল। ধীরাজমোহন ঘরে প্রবেশ করলেন। বিরক্তিতেই বোধহয় দুই ভ্রু কুঁচকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি কালীনাথ রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—আপনি ফোন করছিলেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ধীরাজমোহনের গলা এবার তীক্ষ্ন।

—এ সমস্ত কি হচ্ছে?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না—

—এ বাড়ির কর্তা এখন আমি। বাজে খরচ একেবারেই বরদাস্ত করব না। ভবিষ্যতে ফোন করবার ইচ্ছে হলে আমার অনুমতি নেবেন।

কালীনাথ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, আজ্ঞে, আমি জানতাম না। এখন যদি অনুমতি করেন, তবে একবার ফোন করি।

—না।

—যা চার্জ হবে আমি দিয়ে দেব।

ধীরাজমোহন চিৎকার করে উঠলেন।

—এত বড় সাহস! কথাটা তুমি আমায় বলতে পারলে? মাইনে করা কর্মচারি হয়ে আমায় টাকা দেখাচ্ছ!

—হিসাবে একটু ভুল হচ্ছে কাকা—

ধীরাজমোহন ফিরে দেখলেন দরজার কাছে প্রেমকিশোর দাঁড়িয়ে।

—ওঁকে চোখ রাঙিও না। প্রেমকিশোর নিজের কথা শেষ করল, উনি তোমার মাইনে করা কর্মচারি কবে হলেন বলতো?

—প্রেম, প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা আছে। আমি চাইনা তুমি সমস্ত কিছুর মধ্যে মাথা গলাও।

—তুমি না চাইলে আমি নাচার। যা সত্যি তা আমি বলবই। তোমার যদি ভাল না লাগে আমার কিছু যায় আসে না।

—বেশি স্মার্ট হবার চেষ্টা করো না। খুবতো বুলি কপচাচ্ছো—পুলিশি

ঝামেলা না থাকলে. ঘাড় ধরে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতাম এখনও বুঝতে পারনি ?

প্রেমকিশোর ঝলসে উঠল।

—কি বললে। ঘাড় ধরে—তুমি কি চাও তোমার সম্মানের কবর আমি এখানেই খুঁড়ে ফেলি। কেউ বাঁচাবে না তোমাকে। বাড়ি—বাড়ি করে এত হম্বিতম্বি করছ কেন? প্রমাণ করতে পারবে এই বাড়িখানা জ্যাঠামশাই তোমাকে দিয়ে গেছেন ?

ধীরাজমোহন কিছু বলার আগেই কালীনাথ বলল, আপনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন প্রেমবাবু। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

প্রেমকিশোর বলল, আজেবাজে কথা শুনলে মাথার ঠিক থাকে না। ভাল কথা, আপনি কি স্থির করলেন ?

—কিসের ?

—কাজকর্মের কথা বলছি। এ বাড়ির অন্নতো আপনার উঠল।

একটু ইতঃস্তত করে কালীনাথ বলল, একটা কাজ জুটে যাবেই। তাছাড়া এখনও বিশেষ অসুবিধা হবে না। এককালীন অনেক টাকা পেয়ে যাচ্ছি।

—বলেন কি। কে দিচ্ছে ?

ধীরাজমোহন গম্ভীর মুখে কিছুটা এগিয়ে গেছেন তখন। কালীনাথ উত্তর দিতে গিয়েও থামল—কারণ দেখা গেল এই বাড়ির এ্যাটর্ণি অধীর মিত্র মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছেন।

মোটামুটি লম্বা। স্বাস্থ্যবান লোক। বয়স পঞ্চাশের উপরে হবে না। ভারী ফ্রেমের চশমা তাঁকে আভিজাত্যময় করে তুলেছে। তিনি ধীরাজমোহনের সামনে গিয়ে থামলেন। কালীনাথ আর প্রেমকিশোরও কয়েক পা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ এ্যাটর্ণির আগমনে আগ্রহ সঞ্চার মনে হতেই পারে।

পর্যায়ক্রমে তিনজনের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মিত্র বললেন, আপনার চিঠি পেয়েই চলে এলাম কালীবাবু।

আকাশ থেকে পড়ল কালীনাথ।

—চিঠি !!!

ব্যাপারটা যখন জানতেন তখন আগে বলেননি কেন ?

—কোন্ ব্যাপার ? কি সমস্ত বলছেন ? বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

অধীর মিত্র পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন।

—এই চিঠিখানা আপনি লেখেননি ?

সকলে ঝুঁকে পড়ল চিঠিখানার উপর।

প্রেমকিশোর চেঁচিয়ে পড়ল—

মান্যবর মিত্র মহাশয়,

সেদিন সন্ধ্যায় আপনি চলে যাবার পর কর্তা উইল

তৈরি করেছিলেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা উইল
বর্তমানে তাঁর শোবার ঘরের কোথাওরয়েছে। বিষয়টি
নিশ্চিত ভাবে জরুরী, আপনাকে তাই জানালাম।

নমস্কার

শ্রী কালীনাথ ঘোষ।

কালীনাথ প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—এ চিঠি আমি লিখিনি। হাতের লেখা আমার নয়।

বিস্মিত মিত্র বললেন, আপনার নয়! তবে—

—কেউ আমাকে ডোবাবার তালে আছে। ভগবান জানেন, আমি তার কি উপকার করেছি। আগেও কয়েকখানা চিঠি আমার নামে লেখা হয়েছে। বিশ্বাস করুন স্যার একাজ আমার নয়।

—কিন্তু কার পক্ষে এই চিঠি লেখা সম্ভব?

—আমি জানি না স্যার। কিন্তু যে লিখেছে, আপনি দেখবেন তার কিছুতেই ভাল হবে না।

প্রেমকিশোর বলল, চিঠিখানা কে লিখেছে তা নিয়ে এখন মাথা না ঘামিয়ে বরং ওঁর ঘরখানা একবার খুঁজে দেখলে হয় না।

—উইলখানা পাওয়া যেতে পারে বলছেন?

গম্ভীর গলার ধীরাজমোহন বললেন, ঘরখানা এখন পুলিশের হাতে। তাদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না দাদা এরকম কিছু করেছেন।

মিত্র বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেদিন উনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, নিজের হাতে উইল লিখলে ভ্যালিড হবে কিনা। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, নিশ্চয় হবে।

—এতেই আপনার ধারণা হচ্ছে উনি উইল করেছিলেন?

—হ্যাঁ। নইলে পরের দিন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও, তাড়াহুড়ো করে আমায় আগের সন্ধ্যায় ডেকে পাঠালেন কেন? যাহোক, থানা থেকে এখন কারুর আসবার কথা আছে কি?

ভারী গলায় ধীরাজমোহন বললেন, কেসটা এখন লালবাজারের হাতে। ওখানকার একজন কর্তাব্যক্তির তো আসবার কথা আছে। তবে কখন আসবেন আমি জানি না।

ওদিকে—

—মা ভীষণ ভাবছেন। পুলিশ আর কতদিন আটকে রাখবে কে জানে।

প্রণিমার কথা শুনে সুবীর মাথা নাড়ল।

বলল চিন্তিত গলায়, আমারও তো ওই অবস্থা। চাকরির ব্যাপারটা তো আছেই, তাছাড়া মাকে বলে এসেছিলাম, দিন দুয়েকের মধ্যেই ফিরব। কি ঝামেলা বলুন তো?

ওরা দোতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

এ বাড়ির লোকজনরা কত খারাপ দেখেছেন। বিশেষ করে ওই নয়নতারা-দেবী—আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

—উনি তো আপনার পিসিমা হন।

মৃদু হেসে পূর্ণিমা বলল, অমন পিসিমা মাথায় থাকুন। যে কেউ বলবে, এ বাড়ির লোকেরা ভাল নয়।

—এ বাড়ির লোকজন তোমার পাকা ধানে মই দিল কবে?

দুজনে চমকে মুখ ফেরাল।

অদূরে দাঁড়িয়ে নয়নতারা। কখন উনি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজনের কেউ বুঝতে পারেনি। একেই বোধহয় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ওদের কথাবার্তা যে উনি শুনেছেন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে।

নয়নতারা কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

বললেন তীক্ষ্ণ গলায়, এসেছিলে কেন শুনি? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

পূর্ণিমার মনের মধ্যেটা জ্বলে উঠল। ইচ্ছে করল এখুনি ফেটে পড়ে। অবশ্য অসীম বলে সংযত করে নিল নিজেকে। তবে চুপ করে থাকাটা যে পিছিয়ে পড়া মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবে এটা স্থির করে নিতে অসুবিধা হল না।

বলল থেমে থেমে, কি চাইছেন বলুন তো? পিছনে লেগে রয়েছেন ফেউ' এর মত। আমার সহ্যের একটা সীমা আছে।

— কি বললে, ফেউ?

—হ্যাঁ। তাই বললাম।

—এতবড় সাহস তোমার? ছোট মুখে বড় কথা! তাও যদি কিছু আমার জানতে বাকি থাকত।

—আপনি কি জানেন?

টেনে টেনে নয়নতারা বললেন, কি জানি না তাই বল? তোমার মায়ের কেচ্ছার পুরোপুরিটাই আমার জানা আছে। শুনবে তো বল? পুরানো কাসুন্দি কিছু ঘাঁটি।

সুবীর আর চুপ করে থাকতে পারল না।

ভারী গলায় বলল, নয়নতারাদেবী, কি দরকার এ সমস্ত কথা বলার। প্রথম থেকেই উনি তো আপনার সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখাননি।

—খুব দরদ দেখছি! দিন কয়েক আগে তো আলাপও ছিল না। এরি মধ্যে এত কাণ্ড?

—আপনি ওভাবে বলবেন না। মানে···

পূর্ণিমা সুবীরের একটা হাত চেপে ধরল।

—আর কথা বাড়াবেন না। ওধারে চলুন।

নয়নতারা এবার গলা ছাড়লেন, ঘেন্নায় মরি। অ্যাঁ—মেজদা মারা যেতে

না যেতেই এবাড়ির এই হাল !

উনি আর দাঁড়ালেন না।

সিঁড়ির মুখে পৌঁছাতেই দেখলেন নিচেকার দল উপরে উঠে আসছে।

প্রেমকিশোর ছিল সবার আগে।

বলল, তোমার মিষ্টি গলা নিচে থেকে শুনতে পেলাম যেন। ব্যাপার গুরুতর কিছু নয়তো ?

গম্ভীর গলায় নয়নতারা বললেন, প্রেম, ঠাট্টা, তামাসা আমার সব সময় ভাল লাগে না। ভুলে যেওনা, আমি তোমার গুরুজন।

—এই দেখ, তুমি রেগে গেলে। তুমি আমার পিসি, তোমার সঙ্গে কি তামাসা করতে পারি ? কি হয়েছিল বলতো ?

—হতে আর কিছু বাকি নেই।

—মানে— ?

খেঁকিয়ে উঠলেন নয়নতারা, বললুম তো হতে আর কিছু বাকি নেই। রাসলীলা আরম্ভ হয়ে গেছে বুঝেছ ?

প্রেমকিশোর কি বলবে ভেবে পেল না।

বাকি তিনজনও অবাক।

এই সময় দুজোড়া জুতোর শব্দ কানে এসে পৌঁছাল। পুলিশ এসে পড়েছে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হলনা কারুর। অজানা কারণেই সকলের মধ্যে একটা তটস্থ ভাব দেখা দিল।

শৈবাল আসেনি।

পুরন্দর সামন্ত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠে এলেন।

প্রথমে বাসবের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার সূত্রে বললেন, ইনি যে অপরাধ-তদন্তের ক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত মানুষ একথা যদি আপনাদের অজানা থেকে থাকে, তবে জেনে রাখুন। আমাদের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আমার বন্ধু হিসাবেই এখন এখানে এসেছেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, বরাবরই লক্ষ্য করেছি, মিঃ সামন্ত আমার সম্পর্কে একটু বাড়িয়েই বলেন। যাহোক, বিরাজবাবু হত্যাকাণ্ডর বিবরণ শুনে কিছুটা আগ্রহ জেগেছে। চলে এলাম। ব্যাপারটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে চাই আর কি ?

অধীর মিত্র বললেন, সুখের কথা আপনি এসেছেন। আমি আমার মৃত মক্কেলের কথা স্মরণ রেখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি, পুলিশ এবং আপনার যৌথ চেষ্টায় এবার হত্যাকারী ধরা পড়বে।

থামলেন মিত্র।

আবার বললেন, আমার পরিচয়টা আপনাকে দিয়ে রাখি, অধীর মিত্র—৫ বিরাজবাবুর আইন ও সম্পত্তি ঘটিত বিষয়গুলি আমিই দেখাশুনা করতাম।

মৃদু গলায় বাসব বলল, আপনার কথা শুনে খুশি হলাম। আশা করছি

আপনার মত বাকিরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রাখবেন।

কেউ কিছু বললেন না।

এই বেসরকারি ব্যক্তিটির আগমনে অনেকেই বোধহয় খুশি নন। অবশ্য এই ধরনের মনস্তত্ত্বের মুখোমুখি বাসব বহুবার হয়েছে। সে সামন্তর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল।

সামন্ত কাঁধ নাচালেন।

বললেন সহজ গলায়, মিঃ ব্যানার্জী, আমরা এবার বিরাজমোহনের ঘরে যেতে পারি —

— নিশ্চয়।

কয়েক পা এগিয়ে সামন্ত থামলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা কেউ এখন বাড়ি থেকে বেরুবেন না। কিছু কথা আছে।

মিঃ মিত্র আপনিও কিছুক্ষণ থাকুন।

বিরাজমোহনের ঘর শীল করা ছিল।

শীল ভাঙ্গতে হল। বলাবাহুল্য একজন কনস্টেবল এই ঘরের সামনে সর্বক্ষণের জন্য পাহারায় নিযুক্ত আছে। ঘরের মধ্যেকার বন্ধ হাওয়া পরিবেশকে ভ্যাপসা গন্ধে ভরিয়ে তুলেছে। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দেওয়া হল।

ঘরে ঢোকার পর বাসব তীক্ষ্ন চোখে চারিধারের তদন্ত আরম্ভ করে দিল। কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ল না। সেকেলে কায়দায় সাজানো একজন ধনী ব্যক্তির শোবার ঘর যেমন হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক তাই। আসবাবের বাহুল্যতা ঘরে নেই বলেই বোধহয় কিছুটা ছিমছাম।

সামন্ত ছাড়া আর কেউ ঘরে ঢোকেনি।

সকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন নিশ্চুপ ভাবে।

বাসব মুখ ফেরাল। সরে এল সামন্তর দিকে।

— এমন কোন চাকর ছিল কি, যে শুধু বিরাজমোহনের কাজ করতো ?

সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। খাস চাকর বলতে যা বোঝায় এমন একজন চাকর আছে। কেন বলুন তো ?

— লোকটার সঙ্গে কথা বলতাম।

—ডেকে দিচ্ছি।

সামন্ত বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে লম্বা গড়নের একজন লোক ঘরে প্রবেশ করল। পরনে খাটো ধুতি। শোড় খাওয়া চেহারা। বয়স আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এখন বেশ ভীত দেখাচ্ছে ওকে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওকে দেখতে লাগল। তারপর প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি ?

—আজ্ঞে শ্রীনাথ।

—বিরাজবাবুর সুখ সুবিধার উপর নজর রাখতে ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কতদিন আছো এখানে ?

শ্রীনাথ কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে।

বলল, পাঁচ বছরের কিছু বেশি হল।

—বিরাজবাবুর জন্য কি কি কাজ তোমায় করতে হত ?

—আজ্ঞে, সব কাজই। নাওয়া ধোওয়ার ব্যবস্থা করা, ঘর গোছানো—

—আর বলতে হবে না। বুঝেছি। আচ্ছা, এবার দেখে শুনে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো।

শ্রীনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

বাসব ঘন ঘন পাইপে কয়েকবার টান দেবার পর বলল, এখন এই ঘরে যেখানে যা ছিল ঠিক তাই আছে না, কিছু এধার ওধার হয়েছে ?

দৃষ্টি পিছলে গেল শ্রীনাথের এধার থেকে ওধার। এগিয়ে এবং পেছিয়ে কি সমস্ত দেখে নিল। শেষে তার দৃষ্টিতে সন্তোষের ছায়া পড়ল।

—আজ্ঞে, সব ঠিকই আছে।

—ঠিক বলছো তো।

শ্রীনাথ ঘাড় চুলকাতে লাগল।

—আজ্ঞে, আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

—ছোটখাটও কিছু হারায়নি? তুমি হয়ত ছোটখাট জিনিষগুলোর দিকে দিকে নজর দাওনি। আচ্ছা, ওই টেবিলটা থেকেই আরম্ভ করা যাক। ওর উপর তো অনেক কিছুই রয়েছে। দেখতো ভাল করে।

স্টিল আলমারির ডান পাশে রয়েছে টেবিল। সাইজে বেশি বড় নয়। গোটা কয়েক ওষুধের শিশি, পেপারওয়েট চাপা দেওয়া কাগজ। প্রেশকিপসান, বোধহয়। সেভিং সেট, থার্মাস, এই ধরনের আরো কিছু টুকিটাকি জিনিষ রয়েছে। শ্রীনাথ এগিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

বলল শেষে, ওষুধ খাবার গেলাসটা নেই বাবু।

—শুধু গেলাস—

—আর সব ঠিক আছে।

—কত বড় গেলাস ?

—ছোটমত। প্লাস্টিকের।

—ঠিক আছে। এবার তুমি যাও।

শ্রীনাথ চলে যাবার পর বাসব ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। একটা গেলাস পাওয়া যাচ্ছে না! এই গেলাসটা হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন রহস্য আছে না, নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার ? ভেবে দেখার বিষয় সন্দেহ নেই।

পাইপ ধরাল বাসব।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে গেল খাটের কাছে। বালিশ ইত্যাদি নেড়ে

চেড়ে দেখল। কাজে লাগে এমন কিছুই পাওয়া গেল না। খাটের সঙ্গে লাগোয়া টিপয়ের উপর পানের ডিবেটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। বাসব দেখল সাজা অবস্থায় এখনো তিন খিলি পান রয়েছে। অবশ্য শুকিয়ে গেছে।

মেঝেতে কয়ারের কার্পেট পাতা।

খাটের তলাটাও দেখা দরকার। বাসব হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ল। খাটের তলায় আলো প্রবেশ করার সুযোগ কম। ছায়া ছায়া ভাব। ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল, মাঝামাঝি জায়গায় সাদামত কি একটা পড়ে রয়েছে। জিনিষটা যে কি এখান থেকে ঠাহর করা গেল না।

আর কোন উপায় না থাকায় বাসব মাথা বাঁচিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালতে গিয়ে দুটো কাঠি নষ্ট করল। তৃতীয় কাঠির আলোয় দেখা গেল, সাদা মত বস্তুটা আহামরি কিছু নয়, ছোট আকারের একটা সাদা কাগজের টুকরো।

হতাশ হল বাসব। আয়তনে দুই স্কয়ার ইঞ্চের বেশি হবে না। দাগ দেখে বুঝতে পারা যায় আগে কয়েক ভাঁজে মোড়া ছিল। হাত দিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিতে যাবার মুহূর্তেই একটা সম্ভাবনা মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। হাত গুটিয়ে নিল। ভাবল মিনিট খানেক, তারপর রুমাল বার করে রুমালের সাহায্যে কাগজের টুকরোটা মুড়ে নিয়ে পকেটস্থ করল।

খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল বাসব।

দাঁড়াবার পরই কোমর টনটন করে উঠল। ঝুঁকে থাকার মাশুল। এ ঘরে আর কিছু করার নেই। হত্যাকারী মোটামুটি নিখুঁত ভাবেই নিজের কাজ শেষ করেছে বলা চলে। অবশ্য নিটোল অপরাধ কর্ম হয় না এতো জানাই কথা। কিন্তু টোলটা যে কোথায় পড়েছে সেটাই ধরা যাচ্ছে না।

বারান্দার দৃশ্য তখন অন্যরকম।

বাড়ির সকলে একধারে দাঁড়িয়ে। অধীর মিত্র একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেছেন পুরন্দরকে। কালীনাথের নামে তাঁকে চিঠি দেওয়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সমস্ত কথাই বলেছেন। দেখিয়েছেন চিঠিখানা। পুরন্দর সামন্ত শোনার পর অবাক হয়েছেন বলা চলে।

বলেছেন তারপর, ভেরি ইন্টারেস্টিং।

—ইন্টারেস্টিং তো বটেই।

-- উইলটা খুঁজে দেখতে হয় কি বলেন?

মিত্র বললেন খোঁজাখুঁজির কাজটা এখুনি করা যেতে পারে।

বাসব এসে দাঁড়াল।

পুরন্দর বললেন সব কথা।

-- হত্যাকারীকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না।—বাসব থেমে থেমে বলল, খুব ভেবে চিন্তেই প্ল্যানটা খাড়া করা হয়েছে। হত্যাকারী বিরাজমোহনের আদিঅন্ত জানতো। কালীনাথের বকলমে সকলকে চিঠি দেওয়া হল আগে।

চিঠি পেয়ে সকলে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। সন্দেহভাজনের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল এইভাবে। পুলিশ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। এরপর আবার এই চিঠি।

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, হত্যাকারী রসিকও।

—বলতে পারেন। আপনারা এবার উইলের খোঁজ আরম্ভ করুন। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলি।

— বেশ।

সামন্ত ঘুরে দাঁড়ালেন।

বললেন গলা উঁচিয়ে, যে যার ঘরে আপনারা চলে যান। মিঃ ব্যানার্জী, আপনাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলবেন। ওঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার অর্থই হল পুলিশকে সাহায্য করা।

কেউ কোন কথা বললেন না।

তবে নয়নতারাদেবী যে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছেন, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বারান্দা ফাঁকা হয়ে গেল। মিত্র আর সামন্ত ঢুকলেন বিরাজমোহনের ঘরে। বাসব চিন্তিত ভাবে মন্থর পায়ে সুবীরের ঘরের দিকে এগুলো।

সুবীরকে ঢুকতে দেখেছিল বলেই বুঝতে অসুবিধা হয়নি সে কোন্ ঘরে থাকে। মিনিট দশেকের বেশি লাগল না কথা শেষ করতে। জানাও গেল না নতুন কোন কথা। বাসব এল পাশের ঘরে এবার। প্রণিমা জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বিব্রত ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এল।

বাসব বলল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আপনার সম্পর্কে সমস্ত কথাই আমি জেনেছি। পুলিশকে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তাও আমার দেখা। তবে—

—আর তো কিছু আমার জানা নেই। যা জানতাম পুলিশকে সবই বলেছি।

— ঠিক কথা। আচ্ছা, যে লোকটা আপনার ঘরে ঢুকেছিল, তার চেহারা মনে করতে পারেন?

— কি করে করব বলুন? ঘরে তো তখন আলো ছিল না। আবছামত একটা ভাব ছিল। লোকটাকে শুধু পালিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

— দুর্ঘটনার পর আপনার মা এখানে এসেছিলেন।

—আজ সকালে এসেছিলেন। ঘণ্টা খানেক থাকার পর সোনারপুর ফিরে গেছেন। বলছিলেন, পুলিশ গিয়েছিল ওঁর কাছে।

—জানি। সোনারপুরের ঠিকানাটা কি?

প্রণিমা টেবিলের উপর রাখা প্যাড থেকে এক সিট কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল। আর কোন প্রশ্ন না করে, একপ্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে বাসব বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এবার তাকে নিচে যেতে হবে।

ওদিকে—

সামন্ত উইলটা পেয়েছেন। খোঁজাখুজি বিশেষ করতে হয়নি। বিছানার

মাথার দিকের গদির তলায় ছিল। নিজের হাতেই উইলটা রচনা করেছেন বিরাজমোহন। সামন্ত দ্রুত চোখে বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে দিলেন মিত্রর দিকে। পড়লেন মিত্র। তাঁর মুখে চোখে সন্তোষের ছায়া পড়ল।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, উইলটা জেনুইন, কি বলেন?

— নিশ্চয়।

— সকলকে উইলের সারমর্ম জানিয়ে দিতে নিশ্চয় কোন বাধা নেই?

— বাধা কিসের? এখনই জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

— আসুন।

সামন্ত মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এলেন।

এই সময় বাসবও বেরিয়ে এল পূর্ণিমার ঘর থেকে।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, উইলটা পেয়েছেন নাকি?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। পত্রলেখক যেই হোক, তার দেওয়া সংবাদে কিন্তু কোন ভুল নেই।

—তাই তো দেখছি। এখন কি করবেন?

—মি. মিত্রর সঙ্গে কথা বললাম। ওঁর ইচ্ছে এবং আমারও, উইলটা সকলকে পড়ে শুনিয়ে দেওয়া যাক।

দশ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা হল।

সকলে পূর্ণিমার ঘরে একত্রিত হলেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলেন খাটে এবং চেয়ারগুলোতে। কারুর মুখে হাসির লেস মাত্র নেই। গাম্ভীর্যের তকমা আঁটা। পুলিশী ঝামেলা ধারাবাহিক ভাবে কারু ভাল লাগতে পারে না।

সামন্ত বললেন, আপনারা শুনলে খুশি হবেন, বিরাজমোহনের উইল আমরা খুঁজে পেয়েছি। তিনি বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, নিজের অর্থ ও সম্পত্তি তিনি সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি। যাহোক, মিঃ মিত্র সেই উইল আপনাদের পড়ে শোনাবেন।

সকলে নড়ে চড়ে বসলেন।

এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ এসে পড়বে কেউ ভাবতে পারেননি। আশা ও সংশয়ের দোলায় সকলে দুলতে আরম্ভ করলেও, উৎকণ্ঠা যেন ক্রমেই সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল।

মিত্র উইলের ভাঁজ খুললেন।

বাসব দেখল, পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বিরাজমোহন নিজের শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মিত্র পড়তে আরম্ভ করলেন—

আমি……এলগিন রোড নিবাসী বিরাজমোহন করগুপ্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রশান্ত চিত্তে নিজের শেষ উইল রচনা করিতেছি। ইহার সহিত কাহারও কোন অনুরোধ উপরোধ বা প্ররোচনার সম্পর্ক নাই।

কৃষ্ণনগর নিবাসী, আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু প্রবীর মিত্র আজ আর ইহজগতে নাই। প্রথম জীবনে আমি তাঁহার অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না

পাইলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতাম না। সে ঋণ পরিশোধ করিবার মত স্পর্ধা আমার নাই। তবু প্রবীরের একমাত্র পুত্র সুবীরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখিয়া যাইতেছি। সে এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমার আত্মা শান্তিলাভ করিবে।

আমার আত্মীয়বর্গ সকলেই লোভী এবং স্বার্থপর। মনে প্রাণে আমি তাহাদের ঘৃণা করি। তবু ওই লোভী ও স্বার্থপরদের আমি বঞ্চিত করিতে চাহিনা। আমার বৈমাত্র ভ্রাতা ধীরাজমোহনকে ত্রিশ হাজার টাকা দিলাম। শর্ত একটাই, তাহাকে বসবাসের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে। আমার দূর সম্পর্কের ভগিনী নয়নতারা ও ভ্রাতুস্পুত্র প্রেমকিশোর যথাক্রমে কুড়ি হাজার টাকা পাইবে। কালীনাথ ঘোষ—আমার পুরাতন কর্মচারি। তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম।

পরিচিত মহলের ধারণা আমি দাম্পত্য জীবন হইতে বঞ্চিত ছিলাম। ধারণাটি ঠিক নহে। প্রমীলাকে অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহ না করিলেও, সে আমার স্ত্রী মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং প্রণিমা আমার আত্মজা। জন্মদাতার প্রতি কন্যার রাগ এবং অভিমান থাকিতে পারে। ইহাই স্বাভাবিক। নানাকারণে উহাদের দীর্ঘদিন উপেক্ষা করার জন্য আমি নিদারুণ লজ্জিত। স্ত্রী ও কন্যার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী।

নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, বাসগৃহ এবং স্থাবর–অস্থাবর-আর যাহা কিছু রহিল সমস্তই কন্যা প্রণিমাকে দান করিলাম। এই সঙ্গে আশীর্বাদ করিতেছি সে যেন যোগ্য স্বামী লাভ করে। আইনঘটিত ব্যাপারে প্রখ্যাত এ্যাটর্ণি শ্রীঅধীর মিত্রর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্য দশ হাজার টাকার ব্যবস্থা রাখিলাম। এই সঙ্গে উল্লেখ রাখিতেছি, উপরোক্ত সমস্ত অর্থই আয়কর মুক্ত এবং হোয়াইট্‌ মানি।

ভবদীয়,
শ্রী বিরাজমোহন করগুপ্ত।
'বিরাজ ভবন'
এলগিন রোড কলিকাতা।

উইল পড়া শেষ করলেন অধীর মিত্র।

কারুর মুখে কথা নেই। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। শুধু প্রণিমা চোখের জল সামলে রাখতে পাচ্ছেনা। কান্না যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সুবীর ওর দিকেই তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। প্রণিমা মুখে আঁচল চাপা দিল।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন সামন্ত।

—ভালই হল বলা চলে। লোক হিসাবে বিরাজমোহন যে খারাপ ছিলেন না তা তিনি প্রমাণ করেছেন। কাউকে বঞ্চিত করেননি।

নয়নতারা বলে উঠলেন, তুমি আমায় কি সমস্ত বলেছিলে না? তার তো কিছুই ফলল না। ভারী হতাশ হলে বোধহয়?

ধীরাজমোহকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল কথাটা।

থমথমে মুখ নিয়ে ধীরাজমোহন উঠে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন গলায় বললেন, এসমস্ত ধাপ্পা — আমি মানিনা—

বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

প্রেমকিশোরের মুখে তীক্ষ্ন হাসি দেখা দিল।

—পৃথিবীতে কত রকম লোকই আছে। পরিশ্রম ছাড়াই ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছে, তবু মনে সুখ নেই!

—আপনি তাহলে সুখী—?

বাসবের দিকে তাকিয়ে প্রেম বলল নিশ্চয়। ফাঁক তালে কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছি খুশি হব না। তাছাড়া মেজকাকা যে টাকাটা ধার দিয়েছিলেন, সেটাও আর ফিরিয়ে দিতে হবে না।

— ডবল লাভ বলুন?

—এক রকম তাই।

—আসুন, এবার বারান্দায় যাই। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বাসবের পিছু পিছু প্রেম বারান্দার একপাশে এসে দাঁড়াল।

— বলুন?

—পুলিশকে কি বলেছেন আমি জানি। ও প্রসঙ্গে আর যাব না। অন্য একটি বিষয়ের অবতারনা করতে চাই।

— আর কিছু তো আমি জানি না। যা জানতাম—মানে, পুলিশ যে প্রশ্ন করেছে আমি তার উত্তর দিয়েছি।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, ঠিক কথা। পুলিশ জানতে চাননি এমনও কিছু প্রশ্ন আমার থাকতে পারে।

কাঁপা গলায় প্রেমকিশোর বলল, পারে অবশ্য। তবে—

— নার্ভাস হবেন না। সঠিক উত্তর দিলে ভয়ের কোন কারণ নেই। আচ্ছা, মইটার সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?

— কোন্ মই?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল বাগানে—আই মিন, আপনার মেজকাকার ঘরের নিচে সেদিন যে মইটা পড়েছিল—। মনে রাখতে হবে, ওখানে মইটা পড়ে থাকবার কথা নয়।

—হতে পারে। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু মই সম্পর্কে কিছু জানি না।

— আমি আপনার কাছ থেকে সত্যি কথাটাই শুনতে চাইছি।

— আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছি মিঃ ব্যানার্জী।

তীক্ষ্ন গলায় বাসব বলল, বলেননি। আরো একটু সতর্ক হলে ভাল করতেন। আপনার বোঝা উচিত ছিল, অপরাধ বিজ্ঞানের একটা মামুলি সূত্র

আপনাকে পরে বিপাকের দিকে ঠেলে দেবে।

—আমি - আমি কিন্তুই বুঝতে পাচ্ছি না।

বাসব কিন্তু বুঝতে পেরেছে তার ধাপ্পা কাজে লেগে যাবে।

—বেশ। আমি বুঝিয়ে বলছি। ওই মইটা থেকে আমরা হাতের ছাপ তুলেছি। সেই ছাপ যে আপনার, মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট পুলিশের জীপে অপেক্ষা করছেন। যদি বলেন, ডেকে পাঠাতে পারি?

প্রেমকিশোরের শরীরে ঘামের বন্যা নামতে আরম্ভ করেছে।

খাবি খাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তার সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই।

—মই বেয়ে উপরে উঠেছিলেন স্বীকার করে নিচ্ছেন তাহলে। ভাল কথা। এরপরের কিছু ঘটনাও আমি আঁচ করতে পেরেছি। খোলা বারান্দার পথ দিয়েই আপনি বিরাজমোহনের ঘরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু মইটা স্থানচ্যুত হওয়ায় ওই পথ দিয়ে আর আপনার নেমে আসা সম্ভব হয়নি। অগত্যা আপনি পাশের খোলা বারান্দায় লাফিয়ে পড়ে, প্রণিমাদেবীর ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

প্রেমকিশোর ভীতমুখে চুপ করে রইল।

বাসব বলল আবার, আপনি দেখলেন, আমার আন্দাজ বাস্তবের কত কাছাকাছি। এবার আসল ঘটনাটা বলুন। চুপ করে থাকার অর্থই হল বিপদ ডেকে আনা। বোঝবার চেষ্টা করুন, সম্ভব হলে একমাত্র আমিই আপনাকে বাঁচাতে পারব।

—আপনি বিশ্বাস করুন খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। মেজকাকা আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ওখান থেকে সরে পড়ি।

—খুব ভাল কথা। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তরটা তো পাওয়া গেল না। অসময়ে ফ্যাণ্টমের কায়দায় ও ঘরে আপনি ঢুকেছিলেন কেন?

—ঢুকেছিলাম······মানে···

—বলুন?

প্রেমকিশোর এবার সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে বলতে আরম্ভ করল, আমার অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। কারণটা জানতে চাইবেন না। সকলেই জানে, মেজকাকার অনেক কালো টাকা আছে। উনি যে ভাবে নিজের শোবার ঘর পাহারা দিতেন তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, টাকাটা ওই ঘরেই আছে। সেদিন বিকেলে সকলে ওই ঘরে জড়ো হয়েছিলাম। আমি দাঁড়িয়েছিলাম খোলা বারান্দার সামনেকার দরজা ঘেঁসে। সকলের অলক্ষ্যে এক ফাঁকে ছিটকিনিটা খুলে রাখি। কালো টাকার পাহাড় থেকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। শেষ রাত্রে মই বেয়ে উঠলাম। তারপর ঘরে ঢুকে কি দেখেছি, ভয় পেয়ে কি ভাবে পালিয়েছি তাতো আপনি জানেন।

এই হল আপনার কাহিনী ? সমস্ত সত্যি বললেন আশা করি ?

অক্ষরে—অক্ষরে। মাথায় ভুত চেপে গিয়েছিল বলেই কাজটা করে ফেলেছি। আমায় বাঁচান মিঃ ব্যানার্জী।

- সত্যি কথা বলে থাকলে ভয়ের কিছু নেই। ঠিক আছে, আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই। এখন আপনি যেতে পারেন।

তৎপরতার সঙ্গে সামন্ত মোড় নিলেন।

স্টিয়ারিং-এর উপর দুহাত রেখেই, ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, নতুন কোন কথা বোধহয় আপনি ওদের কাছ থেকে বার করতে পারেননি।

বাসবের মুখে জ্বলন্ত পাইপ।

-- না। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি।

—কোন্ ব্যাপারে ?

—প্রেমকিশোর সম্পর্কে যে অনুমান করেছিলাম তা সত্যি। বেকায়দায় পড়ে কথাটা স্বীকার করে নিয়েছে।

—এতে কি প্রমাণ হচ্ছে মিঃ ব্যানার্জী ?

—এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে—দেখুন, মূল সূত্রটা কাছে পিঠেই আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, উইল সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

-- ভালই। শেষ পর্যন্ত যে বিরাজমোহন প্রণিমাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এ কম কথা নয়। তাছাড়া—

—আমি কিন্তু উইলের শেষ কটা লাইন সম্পর্কে আগ্রহী। উনি লিখেছেন, উপরোক্ত সমস্ত অর্থই আয়কর মুক্ত এবং হোয়াইট মানি। অর্থাৎ কালো টাকাও তাঁর আছে। এঁদের কেউ কেউ সে কথা আমাদের বলেছেনও। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সমস্ত কালো টাকা গেল কোথায় ? আমার মনে এই বিশ্বাসই ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে, ওই টাকাই হল খুনের প্রকৃত মোটিভ।

—টাকাটা উনি অন্যত্র রেখেছিলেন।

— এখন তাই মনে হচ্ছে। তবে নিজেয় শোবার ঘর এমন সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছিলেন কেন ? নিশ্চয় অকারণে নয়।

আমার মনে হয়। কালো টাকার বোঝা আগে ওই ঘরেই ছিল। কিছু-দিন আগে উনি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্যত্র। কিন্তু সকলকে ধোঁকা দেবার জন্য নিজের ঘরের সুরক্ষার ব্যবস্থা আগের মতই বজায় রেখেছিলেন।

বাসব বলল, একজন শুধু জানতো টাকাটা কোথায় আছে। লোভ তাকে সাপটে ধরেছিল। বলাবাহুল্য সেই হত্যাকারী।

— কে হতে পারে ?

- অবশ্যই সে বিরাজমোহনের কাছের লোক।

—তাতো হবেই —সামন্ত বললেন, প্রেমকিশোর বোধহয় সেই লোক নয়।

—না। কেন নয়, আপনাকে আগেই বলেছি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট আমার যুক্তিকে সমর্থন করেছে।

—মোটামুটি আপনি কি রকম বুঝছেন তাই বলুন?

—খুব খারাপ বুঝছি না। এই কেসের একটা সুরাহা তাড়াতাড়িই হবে। ভাল কথা, আমি একবার প্রমীলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

— সোনারপুর যাবেন?

—আপনারা অবশ্য কথা বলেছেন। আমিও একবার মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বেশ তো। কবে যেতে চান?

—কাল সকালে।

হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের মুখে এসে জিপের মুখ ঘোরালেন সামন্ত।

বললেন, ডিপার্টমেন্টের একজনকে সঙ্গে দিয়ে দেব। পুলিশের লোক সঙ্গে থাকলে মহিলা অসহযোগিতা করতে সাহসী হবেন না।

—ঠিক আছে। ভোরেই পাঠিয়ে দেবেন তাকে। বাই কার যাব।

নটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই বাসব সোনারপুর পেঁছে গেল। কলকাতা থেকে রওনা হতে সামান্য বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, নয়তো আরো আগাম পেঁছে যেত।

শৈবালের হাতে একটা অপারেশন থাকায় সে আসতে পারেনি। অবশ্য গোয়েন্দা দপ্তরের সুদেব সোম আছে।

স্টেশনের একপাশে গাড়ি রেখে ওরা এগুলো।

জানা থাকলেও ছোট জায়গায় সময় সময় ঠিকানা খুঁজে পাওয়া ঝামেলার ব্যাপার হয়ে পড়ে। সামনেই একটা চায়ের দোকান। আড্ডাখানা বলাই ভাল। এখানে সঠিক হদিস পাওয়া যাবেই। বাসবের অনুমান মিথ্যা নয়। একজনকে প্রশ্ন করতেই জানা গেল, সামনের রাস্তা ধরে শতিনেক গজ যাবার পর, বাঁ ধারে হলদে রং-এর একতলা একটা বাড়ি পাওয়া যাবে, ওটাই।

সঠিক নির্দেশই পাওয়া গিয়েছিল।

বারকয়েক কড়া নাড়বার পর দরজা খুলে গেল। সধবা এবং বিধবার মাঝামাঝি রফা করে নেওয়া পোশাকে সজ্জিতা মহিলা দরজার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালেন।

দুচোখে বিস্ময়ের ছায়া। বাসব এক নজরেই বুঝতে পারল, মহিলা এককালে বেশ সুশ্রী ছিলেন। তাঁর চেহারার ছাপেই মেয়ের উপর পড়েছে।

—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। —বাসব বলল বিরাজবাবুর হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার আমাদের উপর রয়েছে। আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বাড়ির ভেতরে যাবার যদি অনুমতি করেন, তবে—

দ্রুত গলায় প্রমীলা বললেন, ভেতরে আসুন। আমি কিন্তু—

সুদেব নিজের পরিচয় পত্র এগিয়ে ধরে বলল, ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। এঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার অর্থই হল পুলিসকে সাহায্য করা।

প্রমীলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, আমি আর কি জানি বলুন? ঘটনাস্থলে তো আর ছিলাম না।

বাসব বলল, জানি। আপনার সঙ্গে পুলিশের কি কথাবার্তা হয়েছে তাও আমার জানা আছে। কথাটা কি জানেন, অতীতে দেখা গেছে, যিনি খুন হয়েছেন তাঁর সম্পর্কে যত বেশি জানা যায় রহস্যের আবরণ তত স্বচ্ছ হয়ে আসে। এই কারণেই আপনার কাছে আমার আসা।

—ভেতরে আসুন।

প্রমীলার পিছু পিছু ঘরে ঢুকলো দুজনে। দামী আসবাবপত্র না থাকলেও ঘরখানা বেশ পরিস্কার এবং সাজানো গোছানো। মোরাদাবাদী বেতের নিচু আকারের দুখানা চেয়ার অধিকার করল বাসব ও সুদেব। প্রমীলাও বসলেন।

ক্লান্ত গলায় বললেন, মেয়ের জন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ওখানে আটকে রয়েছে তো। ও ছাড়া আমার কেউ নেই। বলুন, কি জানতে চান?

—প্রণিমাদেবীর জন্য চিন্তিত হবেন না। বাসব বলল, ওখানে উনি ভালই আছেন। আচ্ছা 'বিরাজ ভবনে' আপনি আগে কখনো গেছেন?

—বহু বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। তখন বাড়িখানা সবে কেনা হয়েছে।

—বিরাজবাবুর সঙ্গে কিভাবে সংযোগ ঘটেছিল তা জানতে চেয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আপনি বলুন হঠাৎ উনি আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে সরে গেলেন কেন?

ইতস্তত: করে প্রমীলা বললেন, মন ভরে গিয়েছিল বোধহয়।

—তাই কি?

—আবার এমনও হতে পারে, উনি অত্যন্ত খেয়ালী লোক ছিলেন, খেয়ালের বশবর্তী হয়েই হয়ত দূরে চলে গিয়েছিলেন। কিম্বা—

—বলুন?

—হয়ত অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। তবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে শেষ করে দেননি।

—কি রকম?

—আমাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন।

—এমাসে পাঠিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। সাত তারিখে টাকাটা পেয়েছি।

—কিছু মনে করবেন না। কত পাঠাতেন?

—আড়াইশ টাকা। ওঁর অসীম অনুগ্রহ। টাকাটা না পেলে আমার বেঁচে থাকা দুষ্কর হত।

—ওই টাকায় আপনার সংসার চলে যায় ?

—কেন যাবে না, বলুন ? বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না। বাড়িখানা উনি আমায় কিনে দিয়েছিলেন। একলা মানুষ —মেয়ে ছোটবেলা থেকেই বোনের কাছে থাকত। বড় হবার পর কাজ করছে। তাছাড়া আমিও টুকটাক করি।

—আচ্ছা, টাকাটা লোক এসে দিয়ে যেত ?

—না। মাণিঅর্ডার আসত।

—বিরাজবাবু নিজের হাতে মাণিঅর্ডারের ফর্ম ভরতেন ?

—আগে নিজেই লিখতেন। এবারে···মানে···বছর তিনেক ধরে উনি আর লিখতেন না। হাতের লেখাটা অন্যকারুর।

—কুপনে কিছু লেখা থাকত কি ?

প্রমীলা একটু থেমে বললেন, উনি নিজে কোন কথা লিখতেন না। ইদানিং লেখা থাকত। মামুলি দুচার কথা।

—যেমন -

— 'এত টাকা পাঠানো হল। প্রাপ্তি সংবাদ দেবেন।' নিচে কোন নাম থাকত না। প্রতিবারই আমি একটা পোস্টকার্ড লিখে প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে দিতাম।

বাসব ভ্রু কুঁচকে কি চিন্তা করল।

বলল তারপর, কুপনগুলো দেখতে পেলে ভাল হত। পাওয়া যাবে কি ?

—কেন পাওয়া যাবে না। আমার কাছে সব কুপনই আছে। যত্ন করে প্রত্যেকটা রেখে দিয়েছি।

—চমৎকার। সব দরকার নেই। এবারের কয়েকখানা পেলে ভাল হত।

—এনে দিচ্ছি।

প্রমীলা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সুদেব এতক্ষণ চুপচাপই প্রশ্ন-উত্তর শুনছিল। তবে তাকে কিছুটা নিরাশ হতে হয়েছে। বাসব এই ধরনের মামুলি সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করবে ভাবতে পারেনি। বড়কর্তারা বাসবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ —

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলব —

—বলুন ?

আপনার প্রশ্নগুলো —

— পানসে লাগল বুঝি ? কথাটা কি জানেন, আমার কাজের ধারাই এরকম। তুচ্ছ সমস্ত ব্যাপার থেকেই অতীতে আমি বহুবার বিরাট সূত্রের কাঠামো গড়ে তুলেছি। আজকের কথাই ধরুন না—

—আপনি কি -

—হ্যাঁ। এখানে না এলে অন্ধকার হাতড়ানো আমার বন্ধ হত না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার পর এখন মনে হচ্ছে, বার আনা কাজই শেষ হয়ে গেল।

—বলেন কি ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

বাসব মৃদু হাসল।

—আমার ধারণায় মাণিঅর্ডারের ব্যাপারটাই মূল চাবিকাঠি।

—বিরাজমোহন এঁকে টাকা পাঠাতেন, এরমধ্যে রহস্যের কি আছে ?

—রহস্য ওখানে নয়। পরে বার হাতের লেখা মাণিঅর্ডার ফর্মে থাকত আমি তাকেই মিন করছি। অর্থাৎ সেই লোক বিরাজমোহনের বিশেষ আস্থাভাজন। অর্থাৎ সেই লোক বিরাজমোহনের সমস্ত কিছুই জানে। অর্থাৎ কালো টাকা কোথায় জমা রাখা হত তাও হয়ত অজানা নয়। অর্থাৎ—এই রকম আরো বহু অর্থাতের বোঝা আমি অচিরেই এবার হাল্কা করে ফেলতে পারব।

সুদেব আর কিছু বলতে পারল না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাসবের দিকে।

প্রমীলা আরো কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন। একটা ট্রে বয়ে এনেছেন। ট্রেতে দু-কাপ ধূমায়িত চা আর বড় একটা প্লেটে চারটে বাড়ির তৈরি নারকেলের মিষ্টি। এত তাড়াতাড়ি চা কি ভাবে তৈরি করা সম্ভব হল বাসব ভেবে পেল না।

বলল, কি দরকার ছিল এসমস্তর।

প্রমীলা বললেন, ও কথা বলবেন না। এতদূরে এসেছেন, সামান্য জলযোগ করবেন না তা কিভাবে হয়। আপনারা আরম্ভ করুন আমি জল নিয়ে আসি।

উনি আবার পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দক্ষিণ হাতের কাজ শেষ হতে মিনিট দশেক লাগল।

বাসব এবার মাণিঅর্ডারের কুপনগুলো নিয়ে পড়ল। একটা প্লাস্টিকের খাপের মধ্যে একগোছা কুপন ছিল। সমস্তই চলতি বছরের। বাসব সাগ্রহে ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। শেষে—

একটা কুপন নিতে চাই।

প্রমীলা বললেন, নিন না। সত্যি কথা বলতে এগুলো আর আমার কোন্ কাজে লাগবে ?

এবার তাহলে উঠি। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

—কি আর এমন সহযোগিতা। আপনাকে দেখে তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। না জানি, কি সমস্ত জিজ্ঞেস করবেন—

—আপনার সহযোগিতা যে কত মূল্যবান বলে বোঝাতে পারব না। ভাল কথা, আপনাকে একটা সুসংবাদ দিই। বিরাজবাবু, প্রণিমাদেবীকে উইল করে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন। বাড়িখানাও।

প্রমীলা হতবাক হয়ে গেলেন।

কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

বাসব আবার বলল, বাস্তব সময় সময় কাহিনীকে ছাপিয়ে যায়। যা বললাম বর্ণে বর্ণে সত্যি। বিরাজবাবু আপনাদের স্বাচ্ছন্দের ভাল ব্যবস্থাই করে দিয়ে গেছেন। এখানে আর অপেক্ষা করবেন না। এখন আপনার মেয়ের কাছে

গিয়েই থাকা উচিত। চলি আজ—

কালীনাথ জড়সড় ভাবে বসেছিল। অবস্থা তার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির' মত। বাসব সামনের সোফায় বসে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। কালীনাথকে একবার ভাল ভাবে দেখে নিয়ে সেণ্টার টপের উপর পাইপ নামিয়ে রাখল।

বলল, আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আপনি যে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন এতে তো ভালই হল। আমার আন্দাজটা যে ঠিক তা প্রমাণ করার সুযোগ পেলাম।

কাঁপা গলায় কালীনাথ বলল, আমার কোন বিপদ হবে না তো?

—বিপদ! কেন—? লোভকে জয় করে আমাকে যখন সব কথা বলে ফেলেছেন তখন আর কোন বিপদ নেই। আপনি যাতে সহজ ভাবে সমস্ত কিছু বলতে পারেন, তাইতো আপনাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছি। ভাল কথা, এখন ওখানকার খবর কি?

– কোন্ খবরের কথা বলছেন?

– কে কি বলছে আর কি?

—ধীরাজবাবু রেগে আছেন। গজগজ করছেন সব সময়।

—কেন?

—উইলের বয়ান ওঁর ভাল লাগেনি।

– এতে কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। বিরাজবাবু নিজের সম্পত্তি ইচ্ছে মত দান করার অধিকারী ছিলেন। নয়নতারাদেবীও বোধহয় খুশি নন।

—না।

– ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন।

এক মিনিট সময় নষ্ট না করে কালীনাথ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। বাসব মৃদু হাসল সে দিকে তাকিয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ফোন স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়েল করতে লাগল। কয়েক বার রিং হবার পর সাড়া পাওয়া গেল।

– কে কথা বলছেন—

—

– প্রেমকিশোরবাবু – নমস্কার আমি বাসব দয়া করে পূর্ণিমাদেবীকে ডেকে দেবেন - দরকার ছিল—

রিসিভার হাতে নিয়ে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পর সাড়া পাওয়া গেল।

—কে, পূর্ণিমাদেবী – নমস্কার— এই সময় বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত

—

—একটা সহযোগিতা চাই—ভাল কথা— আপনাব মা এসেছেন নিশ্চয় –

– গতকাল আমি সোনারপুর গিয়েছিলাম—

—এরকম পরিস্থিতে একটু অস্বস্তিবোধ আসবেই – ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে— যা বলছিলাম — আপনার সহযোগিতা চাই —

বাইরে এই সময় যান্ত্রিক শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ি বারান্দার নিচে তখন লালবাজার থেকে আগত জিপটা এসে থেমেছে। সামন্ত জিপ থেকে নামলেন। গৃহকর্তাকে খবর পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পার্দা সরিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করার পরই লক্ষ্য করলেন, বাসব ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখছে।

—আসুন, মিঃ সামন্ত। নতুন কোন সংবাদ আছে নাকি?

সামন্ত বসতে বসতে বললেন, আমি তো আপনার কাছে এলাম সংবাদের আশায়।

মৃদু হেসে বাসব বলল, একটা সংবাদ এখন প্রস্তুতির পথে। প্রণিমা করকে এইমাত্র ফোন করলাম। কালীবাবুকে ডেকেছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ হল গেছেন। সব মিলিয়ে পরিবেশ জমিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

– তার মানে কেসটা এখন আপনার হাতের মুঠোয়।

—অনেকটা তাই। বাহাদুর এল বলে। চা খেয়েই আমরা বিরাজভবনের উদ্দেশে রওনা হব। তারপর দেখতে হবে, আমি যে জাল ফেলেছি তাতে মাছ ওঠে কিনা।

প্রণিমা আধবোঁজা চোখে বিছানায় শুয়ে আছে। প্রমীলা খাটের ছত্রিধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে উদ্বিগ্নতার ছায়া। সুবীর দাঁড়িয়ে আছে জানলার ধারে। কিছুটা সচকিত সে। রজত সেন এতক্ষণ প্রণিমার শরীর পরীক্ষা করছিলেন। এখন টেবিলের উপর প্যাড রেখে প্রেসকিপশন লিখছেন।

প্রেসকিপশন লেখা হয়ে গেলে ডাঃ সেন বললেন, সাময়িক দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরে গিয়েছিল। চিন্তার কোন কারণ নেই। মিস কর, উঠে পড়ুন। ওষুধ লিখে দিয়েছি। বিকেলের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

কিছুক্ষণ আগে বাথরুম থেকে বেরুবার পরই প্রণিমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। চেষ্টা করেও দেওয়াল ধরতে পারেনি. পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। বারান্দায় তখন সুবীর আর প্রেমকিশোর দাঁড়িয়েছিল। ছুটে এসেছিল ওরা। তারপরই কালীনাথ ডেকে এনেছিল ডাঃ সেনকে। এই ব্যাপারে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। সকলে জড় হয়েছেন বারান্দাতে।

রজত সেন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই নয়নতারা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?

—বিশেষ কিছু না। মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

—বোঝ ব্যাপারখানা। একগাদা টাকা পাচ্ছে তো, এখন মাথা ঘুরলেও ডাক্তার দরকার হয়। আগে বোধহয় টাইফয়েডেও কবিরাজ আসত না।

বিরক্তির সুরে ধীরাজমোহন বললেন, তুমি থামবে?

—কেন থামব? আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। কোথা থেকে হুট করে এসে একেবারে জমিয়ে বসল। আবার মাও এসে জুটেছে সঙ্গে।

—এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোক আমি নই। চুপচাপ দেখে যাওনা আমি কি করি। এমন একখানা চাল দেব যে—

—বেশি চাল মারতে যেও না—প্রেমকিশোর বলে উঠল, হুড়মুড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন সত্যি খেলাটা জমে যাবে।

—প্রেম, বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

প্রেমকিশোর নির্বিকার গলায় বলল, আছে কিনা জানি না। তবে আমি বাড়াবাড়ি করবই। তোমার সাধ্য থাকলে বাধা দাও।

ধীরাজমোহন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

—তুমি ভেবেছটা কি? মুখে যা আসবে তাই বলবে! তুমি কি মনে কর, আমি তোমার খেয়ে পরে বেঁচে আছি।

প্রেমকিশোর কিছু বলার আগেই পুরন্দর সামন্তকে উপরে উঠে আসতে দেখা গেল। পিছনে বাসব। দুজনের কানেই তপ্ত বাক্য বিনিময়ের কিছুটা গিয়েছিল। গোলমালটা কি নিয়ে সামন্ত আঁচ করে নিয়েছিলেন। উনি এসে দাঁড়ালেন সকলের প্রায় সামনে।

কিছুই জানেন না এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, বিশেষ কিছু ঘটেছে কি?

—নতুন আর কি ঘটবে?—প্রেমকিশোর বলল, আমি কিছু বলতে গেলেই আমার পরম পূজনীয় পিতৃব্য রেগে আগুন হয়ে উঠছেন। আসল কথাটা হচ্ছে, উইলের বক্তব্য ওঁর পছন্দ নয়।

—তাই কি?

তীক্ষ্ণগলায় ধীরাজমোহন বললেন, হ্যাঁ, তাই। ওই মেয়েটা দাদার, একথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে? এ সমস্ত পাগলামি বন্ধ করুন। আমি হলাম ওঁর নিকটতম আত্মীয়। ওঁর যা কিছু আছে আমি তার একমাত্র দাবিদার।

শান্ত গলায় সামন্ত বললেন, এ সমস্ত কথা অর্থহীন। যা কিছু লেখবার আপনার দাদাই লিখে গেছেন। তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেই হবে।

—আমি মানব না।

—গায়ের জোরে সব কিছুর সমাধান করা যায় না। আপত্তি থাকলে আইনের আশ্রয় নিন। কোর্টের দরজা খোলা আছে। সেখানে যান।

এবার নয়নতারা ঝলসে উঠলেন।

—উইলটা জাল নয় তার প্রমাণ কি?

—আপনার ক্ষেত্রেও ওই এক কথা। সন্দেহ জেগে থাকলে উইল চ্যালেঞ্জ করুন। তবে আমার ব্যক্তিগত মত যদি নেন, বলব, পণ্ডশ্রম করবেন না। উইলটা জেনুইন। কোর্টে তা প্রমাণ হবে। মাঝ থেকে আপনারা হাস্যাস্পদ হবেন।

সামন্ত এবার ফিরলেন।

—কালীবাবু, কয়েকটা চেয়ারের ব্যবস্থা করুন এখানে। তদন্তের ব্যাপারে সকলের সঙ্গে আমাদের কিছু আলোচনা আছে।

ত্রস্ত গলায় কালীনাথ বলল, চেয়ারের ব্যবস্থা এখুনি হচ্ছে। আমাকেও কি থাকতে হবে স্যার? নইলে ওষুধটা কিনে নিয়ে আসতাম।

—ওষুধ! কার শরীর খারাপ—

রজত সেন এগিয়ে এলেন।

—মিস করের শরীর সামান্য খারাপ হয়েছিল। এখন ভাল আছেন।

—ও। কালীবাবু, আপনি চেয়ারের ব্যবস্থাই করুন। প্রেসকিপশনটা আমায় দিন। কনেস্টবলদের দিয়ে ওষুধটা আনিয়ে দিচ্ছি।

দশ মিনিটের মধ্যে বারান্দায় চেয়ারের ব্যবস্থা হল। সকলে বসলেন বেজার মুখে। প্রমীলাও এলেন। পূর্ণিমাও এসে বসল। বাসব এতক্ষণ কথা বলেনি। একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। এবার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে সামন্তর পাশের চেয়ারখানা দখল করল।

বলল, উইলের প্রসঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে বলে আপনারা ধরে নিন। সত্যি, ওনিয়ে কথা বাড়িয়ে আর কোন লাভ নেই। যাহোক, এবার আমি তদন্তের কথাতেই আসছি। এই কেসের সঙ্গে আমি সরাসরি ভাবে যুক্ত নয় আপনারা জানেন। মিস্টার সামন্তর অনুরোধে আমি আগ্রহ না দেখিয়ে পারিনি। আপনারা শুনে খুশি হবেন তদন্তের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

বাসব থামল।

কেউ কিছু বললেন না।

বাসব আবার বলতে আরম্ভ করল, যে কোন খুনের প্রথম কথা হল মোটিভ। রাগের মাথায় কিছু ঘটে গেল, সে স্বতন্ত্র কথা। প্ল্যান করে যে খুন হবে তার পিছনে একটা মোটিভ থাকতে বাধ্য। আবার এই মোটিভই অনেক ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেয়। কাজেই তদন্তকারীকে প্রথমেই মোটিভের সন্ধান করতে হয়। আমরাও বিরাজবাবুকে হত্যা করার নেপথ্যে যে আসল কারণ আছে তার সন্ধান পেয়েছি। উইলে যে হিসাবটা আপনারা দেখলেন, স্বাভাবিক কারণেই ওটা সাদা টাকা। অথচ আপনারা প্রায় সকলেই জানতেন, বিরাজবাবুর প্রচুর কালো টাকা আছে। তাঁর মৃত্যুর পর কিন্তু সেই টাকার সন্ধান পাওয়া গেল না। মোটিভ ওটাই। সুতরাং আমায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে কেউ একজন ওই টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই বিরাজবাবুকে হত্যা করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটল কি ভাবে? বলাবাহুল্য হত্যাকারী একজন চতুর ব্যক্তি। ভেবে চিন্তে সে প্ল্যানটা খাড়া করেছিল নিপুণ ভাবে।

প্রেমকিশোর কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইসারায় তাকে সামন্ত বললেন, আগে ওঁকে সব কথা বলতে দিন।

বাসব বলে চলল, হত্যাকারী এমন একজন লোক যাকে বিরাজমোহন বিশ্বাস করতেন। নিজের জীবনের সব কথাই নিশ্চয় বলেছিলেন। কাজেই ভাল একটা প্ল্যান খাড়া করতে হত্যাকারীর কোন অসুবিধা হয়নি। এবার খুনের ধরনের কথায় আসা যাক। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে, উনি মারা গেছেন রাত একটার মধ্যে। ঘরের প্রধান দরজা ভেতর দিক থেকে তালা দিয়ে বন্ধ ছিল। খোলা বারান্দার পথ দিয়ে কেউ এসে গভীর রাতে ওঁকে কিছু খেতে বলল উনি সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেললেন, একথা নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্যাপারটা তাহলে ঘটেছিল কি ভাবে? আসল কথা হল, বিরাজমোহনের মৃত্যুর সময় হত্যাকারী তাঁর ধারে কাছে ছিল না। সে এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে বিরাজমোহন নিজেই সায়নাইড খেয়ে মারা গিয়েছিলেন।

সুবীর বিস্মিত গলায় বলল, স্ট্রেঞ্জ। এবার নিশ্চয় বলবেন নাটের গুরু কে?

—সে কথাতেই এবার আসছি।

বাসব আরেক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, ডাঃ সেন, আপনার সঙ্গে ছোট্ট একটা প্রতারণা করার জন্য আমি দুঃখিত।

রজত সেন অবাক হলেন।

—প্রতারণা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে বলুন তো?

—কিছুক্ষণ আগে আমি পূর্ণিমাদেবীকে ফোন করে বলেছিলাম, উনি যেন অসুস্থতার ভান করেন। পেট ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি এমন রোগ যা চিকিৎসকরা চট করে ধরতে পারে না, অথচ রোগীকে বিশ্বাস করে। আসল কথাটা হল, এই সময় আপনাকে আমার এখানে দরকার ছিল।

—কেন বলুন তো?

বাসবের মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল।

—এত কথা শোনার পরও প্রশ্ন করছেন, কেন! পরিকল্পনাটা ভালই করেছিলেন। তবে পেশাদার নন তো, তাই কিছু ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছিল। ওই একটা ফোকর দিয়ে গলে যেতে পেরেছি বলেই আপনার আসল রূপটা এত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হল।

রজত সেন ঝটিতে উঠে দাঁড়ালেন।

প্রায় চিৎকার করে বললেন, কি সমস্ত বকছেন? কিসের পরিকল্পনা? একজন ভদ্রলোককে অপমান করার পরিণাম কি জানেন?

—জানি বইকি। সমস্ত রকম দায়িত্ব নিয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে আপনি ঠাণ্ডা মাথায় যে একটা খুন করেছেন, আপনাকে দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে যখন ফিরে আসেন, তখন একটা ওষুধের ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন। হয়ত বলেছিলেন শুতে যাবার আগে খেয়ে নিতে। এতে কোন অস্বাভাবিকত্ব ছিল না। গৃহচিকিৎসক হিসাবে এরকম নির্দেশ আপনি সহজেই দিতে পারেন। সরল বিশ্বাসে বিরাজমোহন

কোন: পাউডার জাতীয় ওষুধের মেশানো সায়নাইড খেয়ে ফেলেছিলেন।

— আপনি এ সমস্ত প্রমাণ করতে পারবেন ?

— কোর্টে প্রমাণ দাখিল করার দায়িত্ব আমার নয়, পুলিশের। পুলিশের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে উপযুক্ততার পরিচয় যে দেওয়া হবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে সামান্য দু-চারটে প্রমাণ এখনই যে উপস্থিত করতে না পারি তা নয়। যেমন ধরুন, যে মোড়কে ওই বিশেষ ধরনের ওষুধ বিরাজমোহনকে দিয়েছিলেন, আমি সেটা খাটের তলা থেকে উদ্ধার করেছি। পরীক্ষা করলেই তাতে সায়নাইডের উপস্থিতি ও আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে। যে গেলাসে উনি ওষুধ গুলে খেয়েছিলেন, পরের দিন সকালে এসে ওটা সরিয়েছেন আপনি। কি বলেন কালীবাবু ?

কালীনাথ ত্রস্ত গলায় বলল, আমি তো তাই দেখলাম স্যার। সকলে যখন মড়া নিয়ে ব্যস্ত উনি তখন মাটি থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলেন।

— গেলাসটা সরানো দরকার ছিল। বাসব বলল, ডাঃ সেন, আপনি চাননি প্রমাণ হোক, বিষ বিরাজমোহন নিজেই খেয়েছেন। কারণ, সন্দেহটা তাহলে বাড়ির কারুর না কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সকলের মনেই বোধহয় প্রশ্ন জাগছে, গেলাস ঘটিত ব্যাপারটা কালীবাবু জানেন এ কথা আমি জানলাম কি ভাবে ? ধীরাজবাবুর একটা কথা আমাকে সচকিত করেছিল। তিনি জানান, কালীবাবু নাকি বলেছেন, এখানে চাকরি না থাকলেও ওঁর কোন অসুবিধা নেই। অনেক টাকা পেতে চলেছেন। আমি ব্ল্যাকমেলিং-এর গন্ধ পেলাম। কালীবাবুকে ডেকে পাঠালাম বাড়িতে। চেপে ধরলাম। উনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, ডাক্তারবাবুকে গেলাসটা সরিয়ে ফেলতে দেখেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন খুনটা কে করেছে। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার একটা পরিকল্পনা ওঁর ছিল।

বাসব দম নিয়ে আবার বলতে থাকল, বিরাজমোহন যে ডাঃ সেনকে বিশ্বাস করতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, নিজের গুপ্তজীবন সম্পর্কে সব কথাই জানিয়ে ছিলেন এবং প্রমীলাদেবীকে মাসে মাসে টাকা পাঠাবার ভার ইদানিং ওঁকেই দিয়েছিলেন। কিছু মনিঅর্ডার কুপন আমি সংগ্রহ করেছি। তাতে যে হাতের লেখা আছে তার সঙ্গে, কিছুক্ষণ আগে প্রণিমাদেবীর জন্য প্রেসক্রিপশন করেছেন তার লেখা মিলে যাবে। বিরাজমোহনের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে আমি মিলিয়ে দেখেছি – হাতের লেখা এক।

রজত সেন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

—কালো টাকা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সেই বিপুল অর্থ এ বাড়িতে নেই। বিরাজমোহন বিশ্বাসী ডাঃ সেনের হাত দিয়ে টাকাটা অন্যত্র সরিয়েছিলেন নিজেকে আইনের চোখে নিরাপদ রাখার জন্য। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মৃত্যুর পরওয়ানাতেও স্বাক্ষর করেছেন। আমার মনে হয়, ডাঃ সেনের বাড়ি বা চেম্বার তল্লাস করলেই টাকাটা পাওয়া যাবে। এ সমস্ত কাজে পুলিশের দক্ষতা

সন্দেহাতীত। মিঃ সামন্ত, এবার উঠলাম। কাল কোন সময় লালবাজার আসছি।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

রজত সেন এখনো নিশ্চুপ। চেয়ারে একটু হেলে বসে আছেন। চোখ আধবোঁজা। ঘামের বন্যা মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

শ্রীমতী বহুবল্লভা

ভবানীশঙ্কর অ্যাশট্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

তাঁর চওড়া জোড়া ভ্রূ এমন ভাবে কুঁচকে রয়েছে যাতে মনে হয় ময়াল সাপ এঁকে বেঁকে এগোতে এগোতে এইমাত্র থেমেছে। ভারি গোল মুখে হাসির আভাস নেই, কেমন থমথম করছে। জমকালো গোঁফে হাত বুলিয়ে নেবার অভ্যাসের কথাটা এখন তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। এয়ারকুলার চলছে, তবু চিটচিটে ঘামে মুখ তেলতেলে হয়ে উঠছে।

ভবানীশঙ্কর সান্যাল একজন নামী স্টিবেডর। নিজের চেষ্টায় অবশ্য তিনি এই বিশাল ব্যবসা খাড়া করতে পারেননি—পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। সুন্দরী-মোহন এভিনিউ'এ আধুনিক কেতায় তৈরি অনেক বাড়ি আছে, তবে পথচারিরা একবাক্যে স্বীকার করেন 'সুজাতা'-র সঙ্গে তুলনা আর কারুর চলে না। 'সুজাতা'-র নির্মাণ শেষ করতে সান্যালের লাক ছয়েক পড়েছিল।

বর্তমানে ঘরে তিনি একা নেই। ডান ধারের সোফার হাত কয়েক দূরে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেনি বলেই মনে হয়। উচ্চতা ভালই—ছ'ফিটের এক আধ ইঞ্চি ওপরেই হবে। মোটামুটি সুগঠিত দেহ, রং একটু চাপা হলেও মুখ-চোখে শ্রী আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। সব মিলিয়ে ভাল লেগে যায় এমন এক ব্যক্তিত্ব। এখন সে কিছুটা বিনীত ভঙ্গি নিয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভবানীশঙ্কর সুদৃশ্য অ্যাশট্রের ওপর থেকে এবার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। বললেন ভারী গলায়, কি যেন বললে তোমার নাম ?

—আজ্ঞে নিশীথ মৈত্র।

—হুঁ। ইরাকে তুমি বিয়ে করতে চাও ?

সসংকোচে নিশীথ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কত টাকা মাইনে পাও তুমি ?

—আটশ টাকার মত।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ভবানীশঙ্কর, তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ইরা কত বড়ঘরের মেয়ে জানো কি ? তোমার মত মাইনে পাওয়া কত কর্মচারি তার বাপের আছে, সে খোঁজ রাখ কি ?

—আমার সব জানা আছে।

—এর পরও তুমি ইরার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ ! মেণ্টেন করা দূরের কথা, তার কসমেটিকের খরচ চালাতে পারবে কি ?

কি উত্তর দেবে নিশীথ ভেবে পেল না।

—চুপ করে থেক না। আমি যখন গার্জেন, তখন আমার সব কিছুই জানা দরকার। ভাল কথা, ইরা জানে, তুমি আজ আমার কাছে আসবে?

—জানে।

— কেন আসবে তা জানে?

—আজ্ঞে তাও জানে।

ভবানীশঙ্কর মুখ ফিরিয়ে গলা ছাড়লেন, দীননাথ!

বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

—মিসিবাবাকে ডাকো।

তিনি আর নিশীথের দিকে তাকালেন না। ঘরে যেন কেউ নেই এমন একটা ভাব নিয়ে সিগার ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কয়েক টান দেবার পরই ইরা এসে উপস্থিত হল। বয়স তেইশের কোঠা এখনও অতিক্রম করেনি। মুখখানা ভারি মিষ্টি। মাজা মাজা গায়ের রং। একহারা শরীরের সঙ্গে সমস্ত কিছুই যেন চমৎকার মানানসই।

—আমায় ডেকেছ বাবা?

—হ্যাঁ। এই ছেলেটি কি বলতে এসেছে তুমি জান?

—মানে—ইয়ে···

—আমতা আমতা কর না। আমি পরিষ্কার উত্তর চাই, হ্যাঁ কি না।

—হ্যাঁ।

—কতদিন থেকে তুমি একে চেন?

—প্রায় দু' বছর।

—কি ভাবে আলাপ হল?

ইরা তার একরোখা বাপকে ভালই চেনে। জেদ যখন ধরেছেন তখন যা জানতে চান, পুরোপুরি তা না জেনে নিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। অস্বস্তি বোধ অবশ্য ওকে চেপে ধরেছে। এরকম অবস্থায় পড়লে কেউ খুশি-খুশি থাকতে পারে না।

যতদূর সম্ভব সহজ গলায় উত্তর দিল, উনি দাদার বন্ধু। সেই সূত্রেই—মানে···

—হুঁ। সস্তা উপন্যাসের নায়িকা হয়ে উঠেছ! এখন তুমি যেতে পার।

—বাবা, আমি বলছিলাম···

—না। তুমি কিছু বলবে না। আমি পছন্দ করি না কেউ আমার মুখের উপর কথা বলুক. তুমি তো তা জান। যাও···

ভবানীশঙ্কর এবার নিশীথের দিকে মুখ ফেরালেন।

—অনেক সময় নষ্ট করেছ আমার। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি বড়ই নির্মম। তবে তোমাকে কিছুটা দয়াই দেখাব। দরোয়ান ডাকার আগেই তুমি এখান থেকে চলে যাও।

ভেতরে যেতে যেতেই কথাটা শুনতে পেল ইরা। অভিমান আর রাগের

মিশ্রিত আবেগ ওর শরীরকে জাপটে ধরল। ইচ্ছে করল ফিরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। পাশে গিয়ে দাঁড়ায় নিশীথের। কিন্তু—কিন্তু দাম্ভিক, একরোখা বাপের মুখের ওপর ওসব কিছু করার সাহস কুলালো না। নিশীথ তখন চৌকাঠ অতিক্রম করেছে। অপমানে সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার।

যতদূর সম্ভব দ্রুত পায়ে বারান্দা অতিক্রম করে, পোর্টিকো মাড়িয়ে বাগানে এসে পড়ল। চাপা মিষ্টি গন্ধে চারিধার ভরে রয়েছে। অবশ্য বাগানের বিস্তার এমন কিছু বড় নয়। কাঠাখানেক হবে কিনা সন্দেহ। এখন নিশীথের মনে হচ্ছে কেন আসতে গেল এখন? এরকম যে একটা ব্যাপার ঘটবে তা তো সহজেই অনুমান করে নিতে পারত।

গত পরশুর কথা।

গঙ্গার ধারে ঘণ্টা দুয়েক ধরে দুজনের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা চলছিল। ওই আলোচনার মধ্যে অনেক খুঁটিনাটির বিষয় ও স্থান পাচ্ছিল। সন্ধ্যা ঘন হয়ে যাবার পর দুজনে উঠল। পোর্টকমিশনার্স-এর লাইন টপকে রাস্তায় এসে পড়ল। ইরার কুমকুম রংয়ের ফিয়েট একধারে পার্ক করা ছিল।

আচমকা কথাটা তখনই বলল নিশীথ।

- সব তো হল। কিন্তু একটা কথা আমরা একেবারেই রাখছি না। আর তো তোমার বাবাকে হিসাবের বাইরে রাখা যায় না।

ফিকে হেসে ইরা বলল, যায় নাই তো। তিনি যে শুধু দাম্ভিক তাই নয়, অত্যন্ত রাগীও। হয়ত স্থির করে বসে আছেন, তাঁর জামাই হবে কোন কোটি-পতি ঘরের নাড়ুগোপাল।

— তাহলে উপায়?

—তাই তো ভাবছি।

ব্যাপারটা আর ফেলে রাখা যায় না—নিশীথ বলল, যা থাকে কপালে, দু-একদিনের মধ্যেই আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।

—আমি বলছিলাম, ওঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে একবার মার সঙ্গে কথা বলে নাও। আমার ধারণা তিনি আমাদের ব্যাপারটা মোটামুটি জানেন। তারপর নাহয়···

—বেশ।

পরের দিন সকালে নিশীথ ফোন করল প্রমীলা সান্যালকে। ইরার যখন মা মারা যান, তখন তার বয়স পনের বছরের বেশি নয়। ভবানীশঙ্কর যে আর বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন না এ সম্পর্কে প্রায় সকলে সুনিশ্চিত ছিলেন। তারপর কোথা থেকে যে কি হল—মধ্যযৌবনে নয়, দেখা গেল বয়স চড়ে যাবার পর প্রমীলাকে ঘরে এনেছেন উনি। প্রমীলা উগ্র আধুনিকা, নিজেকে নিয়ে একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত থাকেন—এ সমস্তই ঠিক, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, ইরার উপর বৈরি সুলভ মনোভাব তাঁর নেই।

ও-প্রান্ত থেকে হালকা মিষ্টি গলা ভেসে এল, হ্যালো—কে কথা বলছেন ··

—আমি নিশীথ— আপনি বোধহয় আমাকে···

—চিনি বইকি—তুমি তো অশোকের বন্ধু···

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনি বোধহয় অশোকের মুখে শুনে থাকবেন—মানে···

আবার হাসি ভেসে এল।

—তুমি কি ইরার কথা বলছ—ব্যাপারটা শুনছিলাম—ইরাকে ডেকে দেব নাকি···

—না—না আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাইছিলাম···

প্রমীলা সান্যালের গলায় এবার বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগল।

—আমাকে খুঁজছ—কথাটা কি বল তো···

—আমি মিস্টার সান্যালের সঙ্গে কাল বিকেলে দেখা করতে চাই—বুঝতেই পারছেন কেন দেখা করতে চাইছি—আপনি দয়া করে যদি কথাটা তাঁকে বলে রাখেন···

—বেশ—আর কিছু···

—আজ্ঞে না···

প্রমীলা লাইন কেটে দিলেন।

এর পরই নিশীথ গিয়েছিল ভবানীশঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে।

গেট পেরিয়ে বাইরে পা দেবার আগেই অশোকের সঙ্গে দেখা হল। সে তখন সবেমাত্র ট্যাক্সি থেকে নেমেছে। নিশীথের সঙ্গে বয়সের বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে শরীরের দিক থেকে অনেক বেশি বলবান। ওকে দেখে একজন অচেনা লোক বলবে একজন ওয়েট লিফটার না হয়ে যায় না। ভবানীশঙ্করের ফার্মের সে প্রাণ স্বরূপ।

ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করল, কি হল?

নিশীথের কাছ থেকে তীক্ষ্ম উত্তর এল, যা হবার তাই হয়েছে। তোমার কাকা শুধু দয়া করে আমায় গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেননি।

—আমি দুঃখিত নিশীথ। কাকার স্বভাবের জন্য কেউই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট নয়। তুমি নিরাশ হয়ো না, আমরা ভেবেচিন্তে একটা পথ বার করবই।

—আমার কিছু ভাল লাগছে না। এখন চলি···

অশোককে পাশ কাটিয়ে নিশীথ চলে গেল। এরকম অপমানজনক অবস্থায় পড়লে, সকলেরই মনের অবস্থা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে অশোক বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকল। ভবানীশঙ্কর তখনও ড্রইংরুমে একই ভাবে বসে আছেন। অবশ্য সিগারের ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে চলেছে। ভাইপোকে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখলেন তিনি।

—অশোক!

—আজ্ঞে···

—বসো, ওখানে।

অশোক বসল।

—নিশীথ না কি যেন নাম ছোকরার? ওরকম বন্ধু তোমার আর ক'জন আছে?

—আপনার কথটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

—হিব্রু বা আরবী আমার জানা নেই। বাংলাতেই প্রশ্ন করেছি। শোন, তোমার বন্ধুদের জানিয়ে রেখ, তারা যেন কেউ আমার সামনে সাহস দেখাতে না আসে।

—চমৎকার। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, অশোকের বন্ধুরা কি তোমার খাস তালুকের প্রজা?

চমকে মুখ ফেরালেন ভবানীশঙ্কর।

দরজার গোড়ায় লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন প্রমীলা সান্যাল। যদিও গত শ্রাবণে তাঁর বয়স চল্লিশ অতিক্রম করেছে—তবু স্বীকার করতে বাধা নেই, আশ্চর্য কায়দায় যৌবনকে তিরিশের নিচেই বেঁধে রেখেছেন তিনি। উগ্র রূপসী বলতে যা বোঝায় তিনি তাই। সাজপোশাকেও চূড়ান্ত আধুনিকা।

প্রমীলা এগিয়ে এলেন।

—কি হয়েছে বল তো? অশোকের কোন বন্ধু তোমার দম্ভের মিনার চুরমার করে দিয়েছে নাকি?

গম্ভীর গলায় ভবানীশঙ্কর বললেন, সব ব্যাপারে তুমি মাথা গলাও আমি তা চাই না।

—চাও না নাকি! ভারি মজার কথা তো!

প্রমীলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

—অশোক, আমার ঘর থেকে টেপরেকর্ডারটা নিয়ে এস তো। তোমার কাকার কথাগুলো টেপ করে নিই। মাঝে মাঝে বাজিয়ে শোনা যাবে।

অ্যাশট্রের মধ্যে নির্মমভাবে সিগারটা গুঁজে দিয়ে ভবানীশঙ্কর বললেন, কি সমস্ত আরম্ভ করলে? অশোক, তুমি এখন এখান থেকে যাও। ভাল কথা, কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমি বম্বে যাচ্ছি। যে কোন ভাবে একটা রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা দেখ।

অশোক মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রমীলা সোফায় বসলেন।

– ছেলেটি এসেছিল। তাকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ?

তার অধিকারের সীমা কোন্ পর্যন্ত, সেটাই শুধু বুঝিয়ে দিয়েছি।

—কথাটা একই। মেয়েকে তাহলে আজীবন মাদুলি করে গলায় ঝুলিয়ে রাখবে?

—ভাল ঘরে তার বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব। ওকথা এখন থাক। কোথায় গিয়েছিলে জানতে পারি কি?

—ক্লাবে।

—ড্রিঙ্ক করেছ ?

— বেহেড় মাতাল হইনি।

ভ্রূ-কুঁচকে ভবানীশঙ্কর বললেন, তুমি জান এ-সমস্ত আমি পছন্দ করি না। আমাদের বাড়ির বৌ ক্লাবে বসে মদ খাচ্ছে, এ একেবারে অসহ্য।

বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে প্রমীলা বললেন, অসহ্য হলেও উপায় নেই। সুন্দরী দ্বিতীয়পক্ষকে যে কোন ক্ষেত্রে বরদাস্ত করে যাওয়াই হল রেওয়াজ।

—প্রমীলা!

—চোখ রাঙিও না। জান তো, তোমাকে ভয় করতে আমার ভাল লাগে না। ভবিষ্যতে আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আর কখনো হাত দিতে আসবে না। আমি হুইস্কি খাব কি জলেই সন্তুষ্ট থাকব, তা নির্ভর করবে আমার নিজের ইচ্ছের ওপর।

—ব্যক্তি-স্বাধীনতার নাম করে তুমি যা ইচ্ছে তাই করে যাবে নাকি? আমার সহ্যের একটা সীমা আছে। রাশ যেমন ঢিলে দিতে জানি, তেমনি জানি কিভাবে টেনে রাখতে হয়। তুমি কি মনে কর কোন খোঁজ আমি রাখি না? তোমার পেয়ারের গুপ্তসাহেবের কথা আমার কানে এসেছে।

প্রমীলার মুখে বিদ্রুপের হাসি ঝলসে উঠল।

—চমৎকার! স্ত্রীর পিছনে গোয়েন্দা লাগান হয়েছে।

—তোমার গুপ্তসাহেবকে বলে দিও, যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিনই আমি তাকে চাবকাব।

—মনে হয় না পারবে। গুপ্তসাহেবের বয়স কম। স্মার্ট। তোমার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। সত্যি কথা বলতে কি ওই ধরনের লোককে আমি বেশি পছন্দ করি।

ভবানীশঙ্কর রাগে কাঁপছিলেন।

তীক্ষ্ন গলায় বললেন, একটা কথা তোমার জেনে রাখা ভাল, গুপ্তসাহেব মার্কা লোকদের কাছে তোমার কদর আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের জন্য—আমার প্রতিষ্ঠার জন্য। আজ যদি তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিই, তারা তোমায় জায়গা দেবে না। কোথায় যাবে শুনি?

প্রমীলা নির্বিকার গলায় বলল, যাবার জায়গার অভাব কি? সোজা লালবাজার চলে যাব। কালো টাকার পাহাড় কোথায় আছে—বাঁকা পথ দিয়ে তুমি কিভাবে রোজগার করছ তার ফিরিস্তি আমায় দিতে হবে। পুলিশ রেড হবে—হাতকড়া পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে জেলে। তোমার হিমালয়ের মত উঁচু সম্মান ফুটপাথে গড়াগড়ি খাবে। নাটক বেশ জমে উঠবে, কি বল?

ভবানীশঙ্কর থতিয়ে গেলেন।

—তাই বলছিলাম—প্রমীলা আবার বললেন, আমাকে ঘাঁটিও না। যা করছ করে যাও, আমি যা করছি আমায় করতে দাও। তাতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল।

ঠিক এই সময় টেলিফোনের ঝনঝনানি শোনা গেল।
ভবানীশঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে মন্থর পায়ে এগিয়ে গেলেন ফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে।
প্রমীলা দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

চারটে বাজার কয়েক মিনিট আগেই নিশীথ অফিস থেকে বেরুল।

সাড়ে দশটা থেকে এতক্ষণ সে যে কিভাবে সময় কাটিয়েছে তা একমাত্র সেই জানে। কাজ-কর্মে মন বসাতে পারেনি। সহকর্মীরা তার হাবভাব দেখে অবাক হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে সমিতিভুক্ত এক কোম্পানিতে সে ভাল পদে কাজ করে। ভবিষ্যতে অনেক ওপরে ওঠার সম্ভাবনা জ্বলজ্বল করছে।

সারাটা দুপুর তাকে চাবুকের মত ঘা মেরেছে গত সন্ধ্যায় বলা ভবানী-শঙ্করের কথাগুলো। টাকা পয়সা আর মর্যাদা থাকলেই কি মানুষকে অমানুষ হয়ে যেতে হবে? মেয়ের বিয়ে কার সঙ্গে দেবেন আংশিকভাবে যে তা তাঁর ইচ্ছাধীন একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলে এত অভদ্র তো না হলেও চলে। ভদ্রতাবোধ বলেও তো একটা কথা আছে।

মাঝে মাঝে ইরার কথাও মনে পড়েছে। সে এখন কি ভাবছে ভগবান জানেন। নিশ্চয় এবার তার ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করা হবে।' যখন তখন আর বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হবে না। গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা হবে। সহজে আর ইরার সঙ্গে দেখা হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য একটা উপায় বার করতে হবে। অশোকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

ভারাক্রান্ত মনকে অন্য দিকে ফেরাবার জন্য ঘন্টাখানেক অকারণেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরাল। বলা বাহুল্য, মনের অবস্থার উন্নতি বিন্দুমাত্র হল না। নিজের ফ্ল্যাটের দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল ছটা বেজে দশ মিনিটে। একরকম ভাগ্যক্রমেই সস্থায় এই চমৎকার ফ্ল্যাটখানা পেয়ে গেছে নিশীথ। বাড়িওয়ালা ডাক্তারি করেন গয়ায়। মাঝে মাঝে আসেন সপরিবারে। ইচ্ছে আছে অথর্ব হয়ে পড়ার মুখে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন।

নিশীথও গয়ার ছেলে। ডাঃ রায়ের সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে। এই বাড়িটার কথা তার অজানা ছিল না। চাকরি পেয়ে কলকাতায় আসার সময় তাই এখানে থাকার ব্যবস্থা সহজেই হয়ে গেল। নামমাত্র ভাড়া। কথা রইল একতলাটা নিশীথ ব্যবহার করবে। দোতলার নিয়মিত ঝাড়া-পোঁছার ব্যবস্থা করতে হবে তাকেই। সপরিবারে স্থায়ীভাবে যখন ডাক্তারবাবু এখানে বসবাস করতে আসবেন, তখন একতলাটা ছেড়ে দিতে হবে। এত ভাল টার্মসে রাজি না হওয়ার কোন মানে হয় না। যে দরোয়ান এতদিন বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল সে গয়ায় ফিরে গেল।

আজ তিন বছর হয়ে গেল এই বাড়িতে নিশীথ আছে।

চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। প্রথমটাই হল বসবার ঘর। মোটামুটিভাবে সাজান। বেতের তৈরি মুরাদাবাদী গড়ানে চেয়ারটায় গা

এগিয়ে দিল নিশীথ। সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দেবার পরই তার একটা কথা মনে হল, ঘরে আলো জ্বলছে কেন ? সকালে আলো জেলে দিয়ে অফিসে বেরিয়েছে এমন তো হতে পারে না। তবে—? এই সময় তার নজরে পড়ল, শোবার ঘরেও আলো জ্বলছে।

ব্যাপারটা কি ?

নিশীথ তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠতে যাবার মুখেই এমন কিছু দেখল যাতে তার হতবুদ্ধি না হয়ে উপায় নেই। শোবার ঘরের দিক থেকে ইরা এগিয়ে আসছে। তাকে অসম্ভব শুকনো দেখাচ্ছে। মুখে ম্লান হাসি। কত অবিশ্বাস্য ঘটনাই সময় সময় ঘটে যায়। নিশীথ বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে গিয়ে সবলে জড়িয়ে ধরল ইরাকে।

কারুর মুখে কথা নেই।

আবেগ কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে বইকি।

শেষে···

—তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে ?

বিস্ময়ের সুরে ইরা বলল, ভুলে গেলে! ডুপ্লিকেট চাবিটা তো আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলে।

—তাই তো। তোমার গাড়ি কোথায় ?

— বাড়ির পিছনে পার্ক করা আছে।

দুজনে বসল।

ইরা আবার বলল, বেলা সাড়ে এগারটার সময় ইউনিভার্সিটি যাবার নাম করে বেরিয়েছি। এতক্ষণে বোধহয় খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে। আমি কিন্তু আর বাড়ি ফিরছি না।

— তোমার কথা শুনে যে আমার কি ভাল লাগছে ইরা, বলে বোঝাতে পারব না। তবে—হয়ত ওঁরা তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানেও এসে পড়তে পারেন।

—এলেই বা। জোর করে আমায় নিয়ে যেতে পারবেন না। আইন আমার দিকে। বাইশ বছরের যে কোন মেয়ে নিজের ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার রাখে।

—সবই ঠিক। তবে···

কি হল ? ভয় পাচ্ছ ?

ইরার হাত চেপে ধরল নিশীথ।

—ভয়! না, না - ভয় পাব কেন ? আমি ভাবছি অন্য কথা।

— কি ভাবছ তুমি ?

— এ বাড়িতে আর কেউ নেই। কিভাবে তুমি এখানে থাকবে ? মনে রাখতে হবে আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি। ঠিক আছে, আমি একটা অন্য ব্যবস্থা করছি।

গলা নামিয়ে ইরা বলল, বিয়ে হয়নি। এখনই কি আমাদের বিয়ে হয়ে যেতে পারে না ?

—এখনই ! কিন্তু…

আর আমায় বেহায়া করে তুলো না। আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। যে কোন ভাবে হোক এখনই তোমায় ব্যবস্থা করতে হবে।

—সময়টা ঠিক যুৎসই নয় বলেই তো চিন্তা হচ্ছে। দুপুর-টুপুর হলে কোন অসুবিধা হত না ! আচ্ছা, অশোককে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বল তো ?

—কেন ?

—তাকে কোন কিছু লুকিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। আমাদের পক্ষেই তো রয়েছে। তার সাহায্য এখন দরকার হবে।

ঠিক এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

চমকে উঠল দুজনে।

নিশীথ উঠে দাঁড়াতেই ইরা দ্রুত অদৃশ্য হল শোবার ঘরে। থেমে থেমে কলিংবেল বেজে চলেছে। কে এখন আসতে পারে এই চিন্তাই নিশীথকে উতলা করে তুলেছে। ভবানীশঙ্কর নয় তো ? বিশ্রী এক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে। দরজা খুলে দিল।

ব্যগ্র ভঙ্গিতে অশোক দাঁড়িয়ে আছে।

নিশীথ হেসে ফেলল।

—মেঘ না চাইতেই জল। আমি যে তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—অশোক ভেতরে এসেই ক্লান্ত ভাবে বসে পড়ল চেয়ারে।

—ইরা এসেছে এখানে ?

—হ্যাঁ।

—বাঁচালে ! আমি তো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আজকালকার মেয়েদের মতিগতির কথা তো কিছু বলা যায় না ! হয়ত…

—রাজধানী এক্সপ্রেসের তলায় গলা দিয়েছি ?

অশোকের গলা শুনে ইরা এ ঘরে চলে এসেছিল।

মৃদু হেসে অশোক বলল, গলাটা ধড়ের উপর ঠিকই রয়েছে দেখছি। তারপর, এখন তোমাদের প্ল্যানটা কি ?

—প্ল্যান তো ভাই একটাই—নিশীথ বলল, সমাজের চোখে আমাদের সম্পর্কটা যাতে আইনসিদ্ধ হয়ে যায় তার চেষ্টা দেখা। তোমাদের বাড়িতে বোধহয় হৈচৈ পড়ে গেছে ?

—এখনও পর্যন্ত অবস্থা বেশ শান্ত। ইরার অনুপস্থিতিটা বুঝতে পারা যায়নি। আসল কথা হল, দুপুরে কাকা কৃষ্ণনগর গেছেন কি একটা কাজে। ফিরবেন সন্ধ্যার পর। হৈচৈ আরম্ভ হবে তখন।

ইরা প্রশ্ন করল, মা কোথায় ?

—যথা নিয়মে 'ফরটি থি্র' ক্লাবে। কি বলছিলে নিশীথ, আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা? আমারও ওই মত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া উচিত।

—যত তাড়াতাড়ি মানে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বুঝতেই পারছ···

মুখে হাসি টেনে বলল অশোক, সব বুঝতে পারছি। ব্যবস্থা তাহলে করে ফেলা যাক।

—কি ভাবে করবে? এখন কোন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিস খোলা নেই। হিন্দু মতে অনেক ঝামেলা অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করে ওঠা যাবে না। আর্য সমাজী বা অন্য কোন মতে করতে গেলেও কাল দুপুরের আগে সম্ভব হচ্ছে না।

—কেন জাত দিতে যাবে! হিন্দু মতেই তোমাদের বিয়ে হবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হবে। কালীঘাটের মন্দির থাকতে ভাবনা কি? কিছু খরচ করতে পারলেই হল।

ইরা আর নিশীথ দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এত সহজ সমাধান হাতের কাছে থাকতেও এতক্ষণ মনে পড়েনি। এইজন্যে বলে চোখের পাশে নাক থাকতেও লোকে নাক দেখতে পায় না। আর ভাবনা নেই। সমস্যা মিটে গেল।

মোলায়েম গলায় নিশীথ বলল, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না। তুমি যেন আমাদের কাছে দেবদূত হয়ে এসেছ।

হাসতে হাসতে অশোক বলল, এতবড় পোস্ট আমাকে দিও না, ঘাবড়ে যাব। কথাটা কি জান, কাকার ব্যবহারে আমরা সকলেই অতিষ্ঠ। তাঁর ভ্যানিটিতে এই ধরনের ধাক্কার একটা প্রয়োজন আছে।

এছাড়া ইরা খুশি হবে, এও কম কথা নয়। যাক, তোমরা তৈরি থাক। সমস্ত ব্যবস্থা করে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।

সার্কুলার রোড যেখানে শরৎ বোস এভিনিউকে কার্ট করেছে, তার অল্প কিছু দূরেই অতি বিখ্যাত চেস্টনাট কালারের সেই দোতলা বাড়িখানা। হাল্কা বেগুনি রংয়ের নিয়ন সাইনে গেটের ওপর লেখা আছে, 'ফরটি থি্র ক্লাব।' স্থাপিত ১৯৪৩।

এই ক্লাবের সদস্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েও জায়গা পাওয়া যায় না। জায়গা পাবার একমাত্র উপায় হল, যদি কোন সদস্য মারা যান বা পদত্যাগ করেন তবেই। ১৯৪৩ সালে তেতাল্লিশজন নারী-পুরুষ মিলে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখনই স্থির হয়েছিল সদস্য তেতাল্লিশের বেশি কখনই বাড়বে না। সেই নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আজও মেনে চলা হচ্ছে। বলতে গেলে এটা একটা গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য প্রতিষ্ঠাতা

সদস্যরা সকলেই যে আজ বেঁচে আছেন তা নয়। অধিকাংশই গত হয়েছেন। তাঁদের জায়গায় স্থানলাভ করেছেন ধনী ও মানী সমাজের অনেকে।

ক্লাবের গেট পেরিয়ে একটা মার্ক টু কার পার্কে গিয়ে দাঁড়াল।

ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে দাঁড়ালেন যে ভদ্রলোক তাঁকে স্মার্ট বলতেই হবে। চল্লিশের কোঠা সবেমাত্র পার হয়েছেন। ভাব ভঙ্গিতে অত্যন্ত বেপরোয়া। পরণে দামী মভ কালারের স্যুট—গলায় গাঢ় রু জমির ওপর বুটিদার টাই। সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি অবশ্য একা নেই। সঙ্গে আরো একজন আছেন। বয়স একটু বেশি, দামী স্যুট তার পরণে।

দ্বিতীয়জন বললেন, আমি অবাক হয়ে ভাবি, তুমি এখনও ওই একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারছ না কেন?

—একঘেয়েমি?

—প্রমীলা সান্যালের কথা বলছি।

গুপ্তসাহেব গলা ছেড়ে হাসলেন।

—মহিলাকে আমার পছন্দ। সম্পর্কটা আরো কিছুদিন বজায় রাখব।

—একটু গায়ে পড়া নাকি?

—তুমি ঠিকই বলেছ সেন। তবুও বলব, সি ইজ স্প্লেনডিড। অমন রূপসী মহিলা ভবানী সান্যালের মত জানোয়ারের হাতে পড়েছে ভাবতেও খারাপ লাগে।

সেন বললেন, বার-এ কিন্তু এ নিয়ে খুব কানাকানি হচ্ছে। একজন প্রৌঢ়া মহিলাকে নিয়ে তুমি নাচানাচি করছ দেখে সকলেই অবাক।

গুপ্ত অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, অবাক হলে আমি নিরুপায়। সকলকে জানিয়ে দিও, আমাকে নিয়ে যেন আর কেউ মাথা না ঘামায়। চল, যাওয়া যাক।

দুজনে এগোলেন।

গুপ্তসাহেবের পুরো নাম বসুদেব গুপ্ত। রায়গঞ্জের এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। স্কুল ও কলেজে ধারাবাহিক ভাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। তারপর সাগর পেরিয়ে লণ্ডনে পেঁছান ব্যারিস্টারি পড়তে। সচরাচর যেমন দেখা যায়, বিদেশী ছাত্ররা ওখানে নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। গুপ্তসাহেবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। লিজা প্যানসনবির প্রেমে তিনি আকণ্ঠ ডুবে গেলেন।

পরীক্ষা শেষ হল এক সময়। ভাল ভাবেই পাশ করলেন গুপ্তসাহেব। দেশে ফেরবার সময় অবশ্য একা ফিরলেন না। লিজাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন কলকাতায়। গোলমাল বাধল তারপরই। ইংরাজ পুত্রবধূকে গুপ্তসাহেবের মা-বাপ স্বীকার করলেন না। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ছেলের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ করলেন তাঁরা। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে গুপ্তসাহেব ভাবেননি। যাহোক নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নিলেন। মহা উৎসাহে যোগ দিলেন হাইকোর্টে।

ছ' মাস যেতে না যেতেই কঠোর বাস্তব তাঁকে অতলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তাঁর মত তরুণ ব্যারিস্টারকে কেউ ডাকে না। ব্রিফ নেই — আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। লিজা অতদূর থেকে এখানে আসেনি যেমন তেমন খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য বা ঘরের যাবতীয় কাজের জন্য বিরামহীন ভাবে গতর খাটাতে। সে এসেছে আরো স্বাচ্ছন্দ পেতে — নতুন দেশটাকে প্রাণ ভরে দেখতে। মোহভঙ্গ হবার পরই লিজা বুঝতে পারল, তার স্বামীর যে শুধু আয় নেই তা নয়, ব্যাংক ব্যালেন্স বলেও কিছু নেই। বুদ্ধিমতী মেয়ে। সময় নষ্ট না করে কলকাতার ইংরাজমহলে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুফল পাওয়া গেল অচিরেই। বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসের একজন কর্মচারির সঙ্গে রাতটাত কাটিয়ে তাকে ভাল ভাবেই ম্যানেজ করতে পারল। এবং তারই সঙ্গে একদিন লণ্ডন সরে পড়ল। গুপ্তসাহেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বলতে গেলে এর পর থেকেই তাঁর ব্যবসা জমে উঠতে আরম্ভ করল। এতদিন যেন লিজাই তাঁর উপর কুগ্রহর প্রভাব ফেলে রেখেছিল।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। গুপ্তসাহেব এখন একজন সুখ্যাত ব্যারিস্টার। দু'হাতে রোজগার করেন। বিয়ে অবশ্য আর করেননি। তাই বলে নারী জাতি সম্পর্কে যে দুর্বলতা রহিত একথা বলা চলে না। অনেক ভেবেচিন্তে সঙ্গিনী বাছাই করেন। কেন জানা যায় না বিবাহিতাদের দিকেই তাঁর ঝোঁকটা বেশি। ক্লান্ত বোধ করলেই আবার নতুনের সন্ধান দেখেন।

ইদানিং তাঁকে প্রমীলা সান্যালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যাচ্ছে।

গুপ্তসাহেব সেনকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভেতরে এলেন।

বিশাল হল। আলোয় ঝলমল করছে হলের প্রতিটি খাঁজ। এক নজরেই বুঝতে পারা যায় উঁচু সুরে বাঁধা পরিবেশ। সুদৃশ্য মার্বেলের গোল টেবিল কেন্দ্র করে কয়েকজন সদস্য চড়া বাজীতে 'রামি' খেলছেন। কথাবার্তা একরকম হচ্ছে না বললেই চলে। বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান এই হলেই প্রতিবার সাড়ম্বরে পালিত হয়।

হলে প্রবেশ করলেন না গুপ্তসাহেব। পাশের প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে পড়লেন ছোট একটা হলে। একধারে বিলিয়াড' বোর্ড পাতা। নেমে আসা জোরাল আলোর ছটায় টেবিলের উপরকার সবুজ বনাতকে অসম্ভব উজ্জ্বল করে তুলেছে। স্টিকের মৃদু আওয়াজ—বলগুলির দ্রুত আনাগোনা। টেবিলের পাশে কয়েকজন নারী-পুরুষ জড়ো হয়েছেন। আক্ষেপ আর প্রশংসা দুই শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

হলের অন্যধারে বার-কাউন্টার। এখানে এমন সমস্ত বিদেশী পানীয় পাওয়া যায়, যার সন্ধান কলকাতার অনেক বড় বারেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বার-ম্যান পিটার গোমেজ গোয়ার লোক। চটপটে আর মিষ্টভাষী

হিসাবে তার সুনাম আছে। কাউণ্টারের এধারে রাখা একসারি লাল চামড়ায় মোড়া উঁচু টুল। তারই মধ্যেকার দুটোয় সেন আর গুপ্তসাহেব বসলেন।

গোমেজ হাসিমুখে এগিয়ে এল।

—গুড ইভনিং স্যার।

—ইভিনিং। গুপ্তসাহেব বললেন, ড্রাই-মার্টিনি ডাবল। সঙ্গে সোডা নয়, সেফ জল।

—আপনাকে কি দেব স্যার?

সেন বললেন রথবোর্নস আছে? থাকলে আমাকেও ডাবল। এক ফালি লেবু দিতে ভুলো না। সঙ্গে সোডা।

অবিলম্বে দু' গেলাস পানীয় এসে গেল।

মৃদু চুমুক দিতে দিতে দুজনের আলোচনা এগোতে লাগল। বলা বাহুল্য পেশাগত কথা। এইভাবে অতিক্রান্ত হয়ে গেল আধঘণ্টাটাক। বিলিয়ার্ড খেলা তখনো পুরোদমে চলেছে। এই সময় প্রমীলা সান্যাল দেখা দিলেন। হল যেন হেসে উঠল। কে বলবে যৌবনকে তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন!

—হ্যালো মিলি, আজ তোমার এত দেরি?

গুপ্তসাহেবের অন্যপাশের টুলটায় বসলেন প্রমীলা।

—দেরি হয়ে গেল। মিঃ সেন, ভাল আছেন? আজকাল তো আপনাকে দেখতেই পাই না।

সেন বললেন, একটু ব্যস্ত ছিলাম। আপনার সব ভাল তো? আমি কিন্তু এবার উঠব।

—কেন?

—দোতলায় যাই। এক সারকিট ব্রীজ খেলার ইচ্ছে আছে।

সেন বিদায় নিলেন।

গুপ্তসাহেব বললেন, আমাদের অসুবিধার কারণ হয়ে থাকতে চায় না আর কি। কি নেবে বল? আমি তো আরেকবার ড্রাই মার্টিনি নেব।

—আমার কোন ভাল ব্র্যাণ্ডের জীন হলেই চলবে। লেমন থাকে যেন।

অর্ডারটা গোমেজকে বুঝিয়ে দিলেন গুপ্তসাহেব। তারপর প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে বার-কাউণ্টার থেকে সরে এলেন। কাছেই একটা টেবিলের মুখোমুখি গিয়ে বসলেন। দুজনের সম্পর্কের কথা ক্লাবের সকলেই জেনে ফেলেছেন। কাজেই সঙ্কোচের বালাই ওঁদের নেই।

—তোমাকে না জানিয়েই একটা কাজ করে ফেলেছি।

ভ্রূ ভঙ্গি করে প্রমীলা বললেন, কি বল তো?

—অমৃতসর মেল-এর এয়ার কণ্ডিসনড বগীতে দুটো বার্থ রিজার্ভ করেছি। লাক্ষ্নৌ পর্যন্ত অবশ্য।

—লাক্ষ্নৌ কেন?

—ওখান থেকে বাই-কার নৈনিতাল যাব। দশদিনের প্রোগ্রাম। চমৎকার সময় কাটবে, কি বল?

—রিজার্ভেশন কবেকার?

—কালকের।

আকাশ থেকে পড়লেন প্রমীলা সান্যাল।

—কাল। সে কি?

বেয়ারা পানীয় দিয়ে গেল।

গেলাস তুলে নিয়ে গুপ্তসাহেব বললেন, কর্তার অনুমতি পাবে না বুঝি?

—অনুমতি! তুমি যেন আমাকে নতুন করে চেনবার চেষ্টা করছ? ওল্ড হস'কে আমি টিট করে রেখেছি। তার ক্ষমতা নেই আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেয়।

—তুমি তাহলে কাল যাচ্ছ?

—নিশ্চয়। আমার পরিচয়টা বোধহয়···

—অবশ্যই মিসেস গুপ্ত। দশদিন নৈনিতালে তুমি আমার স্ত্রী হয়েই থাকবে।

কথাটা শেষ করে গুপ্তসাহেব হাসলেন।

—কি রকম গরম কাপড় নিতে হবে।

—যা আছে সবই নেবে।

এই সময় বেয়ারা এসে জানাল, সেনসাহেবের ফোন এসেছে। প্রমীলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। ফোন আছে অফিস ঘরে। কাজেই ওঁকে এখন দোতলায় উঠতে হবে। গুপ্তসাহেব আর কি করবেন—গেলাসটা শেষ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটল কিন্তু এর পরই। শেষ চুমুক দেবার পর, গেলাস নামিয়ে রাখতে যাবার সময় লক্ষ্য করলেন, মাত্র দু-হাত দূরে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছেন ভবানীশংকর।

—আপনি বোধহয় মিঃ গুপ্ত।

—হ্যাঁ।

—আমার পরিচয় হল···

—বলতে হবে না। জানি।

—আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

—বসুন!

ভবানীশংকয় বসলেন।

বিস্মিত গুপ্তসাহেব বললেন, বলুন এবার।

—কথাটা আমার স্ত্রীকে নিয়ে···

—উচ্চাঙ্গের রসিকতা স্বীকার করতেই হবে। ব্যাপারটা কি বলুন তো? আপনার স্ত্রী সম্পর্কে আমার কি অনেক কিছু জানার কথা?

ভারি গলায় ভবানীশংকর বললেন, কথার ফুলঝুরি কেটে আপনি আসল

ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই ক্লাবেই এমন বহু সাক্ষী পাওয়া যাবে যাঁরা আপনার ও আমার স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের কথা পরিষ্কার ভাষায় বলবেন।

—বলে যান।

—আজ অবশ্য আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে আসিনি। কোনরকম বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্যও আমার নেই।

—কিছু মনে করবেন না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে তবে আমার কাছে এলেন ?

ভবানীশংকর সিগার ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আপনি আমার সম্পর্কে কতটা জানেন জানি না। আসল কথাটা হল, আমি একজন ক্ষমতাশালী এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আপনাদের কাজ কারবারে আমার আভিজাত্য ঘা খাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে আমি রেহাই পেতে চাই।

– আমি কি করতে পারি বলুন ?

—সরে দাঁড়াতে পারেন।

—আপনার স্ত্রীকে একথা বলেছেন ?

—বলা নিরর্থক। সে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। বলিনি, কারণ আমার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে নাও আনতে পারে।

গুপ্তসাহেবের মুখে চওড়া হাসি দেখা দিল।

—চমৎকার। নিজের স্ত্রীকে যে কনট্রোল করতে পারে না, সে অন্যের দরজা নক করতে আসে কোন্ সাহসে ? মনে হয়, আপনার আর কিছু বলার নেই।

অপমানে ভবানীশংকরের মুখ লাল হয়ে উঠল।

থেমে থেমে বললেন, আগেই বলেছি, বিবাদের মনোভাব নিয়ে এখানে আসিনি। বেশ, পরিষ্কার কথাই হোক। কত দাম চাইছেন ?

— দাম !

—কিম্বা বলতে পারেন সরে দাঁড়াবার মূল্য। অন্য কেউ হলে অমন স্ত্রীকে ডাইভোর্স করত। আমি পারছিনা। সম্মান নষ্ট হবার ভয়েই পারছি না।

ভবানীশংকর পকেট থেকে চেকবই বার করলেন।

—বলুন, কত টাকার কাটব ?

নিরুত্তাপ গলায় গুপ্তসাহেব বললেন, দশ লক্ষ।

—ছেলেমানুষী করার অবস্থায় আমরা কেউ নেই। এমন কিছু বলুন যা সম্ভবপর হয়। আমি ত্রিশ হাজার টাকা দেব। ভদ্রলোকের চুক্তি। টাকাটা নেবার পর আর আপনি প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না।

—মাত্র ত্রিশ হাজার ! শুনুন মি সান্যাল, চেকবই আমারও আছে। যখন তখন মোটা অঙ্কের চেক কাটাই আমার অভ্যাস। কাজেই আমাকে টাকা দেখিয়ে লাভ হবে না। পরের বৌকে নিয়ে মাছের বাজারের দরাদরি অসহ্য। আপনার নোংরা প্রস্তাবটা রাখতে পারলাম না বলে [illegible] করবেন না। আসুন তাহলে --

ভবানীশংকর উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর পিঙ্গল চোখ দুটি জ্বলে উঠল।

বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ব্যাপারটা মিটে গেলেই ভাল হত। হবার যখন নয় তখন আর কি করা যাবে। চলি! আবার দেখা হবে।

উনি স্থান ত্যাগ করার আগেই প্রমীলা দেখা দিলেন।

এই সময় মহিলা নিজের কর্তাকে এখানে আশা করেননি।

কিছুটা শংকিত হলেন সেই সঙ্গে বিরক্তও।

তুমি এখানে?

চিবিয়ে চিবিয়ে ভবানীশংকর বললেন, আমিও এই ক্লাবের সদস্য ভুলে যাচ্ছ কেন? এখানে তো নিয়মিত আসি না, গুপ্তসাহেবের সঙ্গে তাই আলাপ ছিল না। ভদ্রলোককে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম।

—তাই দেখ। ওদিকে, তোমার মেয়ে যে আচ্ছা করে তোমাকে বাজিয়ে নিল সে খবর রাখ?

—তার মানে…

রসিয়ে বলার ভঙ্গিতে প্রমীলা বললেন, দুপুরে ইরা খাতাপত্র নিয়ে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার মুখেও তার দেখা নেই। কিছুটা চিন্তা নিয়েই ক্লাবে এসেছিলাম। এখন ফোন পেলাম অশোকের কাছ থেকে, কিছুক্ষণ আগে ইরা আর নিশীথের বিয়ে কালীঘাটে হয়ে গেছে। ওরা এখন গেছে কোন্ বড় হোটেলে ডিনার সারতে। তোমার গার্জেনগিরির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বুঝেছ।

ভবানীশংকর হতভম্ব হয়ে গেলেন।

এক মিনিট চুপ করে থাকার পরই ফেটে পড়লেন তিনি: ষড়যন্ত্র! আমাকে অপদস্থ করার জন্য তোমরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছ! আমি কিন্তু এবার ভীষণ বেপরোয়া হয়ে পড়লাম। কাউকে আর রেহাই দেব না। ভবানী সান্যাল যে কি বস্তু এবার তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

কারুর কোন কথা শোনার অপেক্ষায় তিনি আর রইলেন না।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন ওখান থেকে।

গুপ্তসাহেব বললেন, ভদ্রলোককে অতিমাত্রায় চটিয়ে দিয়েছ।

—বানিয়ে তো কিছু বলিনি। যা ঘটেছে তাই বলেছি। চটে গেলে আমি নিরুপায়।

সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। তুমি এবার বাড়ি যাও। কাল সন্ধ্যায় আমাদের যাওয়ার কথাটা মনে রেখ। আমি দুপুরের দিকে যোগাযোগ করব একবার।

অনিচ্ছার সঙ্গেই প্রমীলা বিদায় নিলেন।

গুপ্তসাহেব বার কাউন্টারের সামনে আবার বসলেন।

—গোমেজ, আবার একবার ড্রাই মার্টিনি চালাও।

পানীয় এসে পড়ল। আজকের সন্ধ্যা যে এমন তেত হয়ে উঠবে আগে ভাবেননি। সন্দেহের অবকাশ নেই ভবানীশঙ্কর তাকে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করবে। লোকটা অসম্ভব প্যাঁচাল। টলটলে নেশার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর তিন চুমুকে গেলাস শেষ করলেন। মুখের চামড়ায় টান ধরল, ছোট্ট একটা ঢেকুর তুললেন। মনের মধ্যে মিষ্টি আমেজ ক্রমেই জমছে। এই সমস্ত অবসরে নিজেকে অত্যন্ত একা মনে হয়। গুপ্তসাহেব কাউন্টারের ওপর একটু ঝুঁকে পড়লেন।

—গোমেজ···

— বলুন স্যার

—আজকের রাতটা ভাল ভাবে কাটে এমন কোন ব্যবস্থা করতে পার ?

— পারি স্যার।

— কত লাগবে ?

—একশ টাকার মত পড়বে।

গুপ্তসাহেব পকেট থেকে ওয়ালেট বার করলেন, ঠাসা নোট। করকরে একটা একশ টাকার নোট বার করে তিনি গোমেজের দিকে এগিয়ে দিলেন। নোটটা পকেটে পুরে গোমেজ আজকের ড্রিঙ্কের হিসাবটা এগিয়ে দিল। সই করলেন গুপ্তসাহেব। মাসের শেষে পেমেন্ট করার নিয়ম। কাউন্টার থেকে সরে এসে সিগারেট ধরালেন কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে।

দশটার সময় পেঁছে যাবে।

---চেহারা আর বয়স টয়স যেন ঠিক থাকে।

গোমেজের কালচে মুখের ওপর হাসি খেলে গেল।

- সব ঠিক থাকবে। আপনার পছন্দ আমি জানি স্যার।

সিগারেটে টান দিতে দিতে গুপ্তসাহেব এগোলেন। গোমেজের এটা সাইড ইনকাম। কয়েকটা মেয়ের সন্ধান তার জানা আছে। সাহেবরা ইচ্ছে প্রকাশ করলেই সে সংগ্রহ করে দেয়। ভাল মত কমিশন না বাঁচবার কথা নয়। কারিডর পেরিয়ে উনি টানা বারান্দায় এসে থামলেন। ছ'পেগ ড্রাই মার্টিনি পেটে যাওয়ায় নেশা বেশ জমে উঠেছে। সেন এই সময় নেমে এলেন দোতলা থেকে। সঙ্গে বিরূপাক্ষ দস্তিদার। উনিও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি। আইনের আঙ্গিনায় গুপ্তসাহেব বহুবার ওঁকে ঘায়েল করেছেন। এই কারণেই কিনা জানা যায় না উনি গুপ্তসাহেবের প্রতি সদয় নন।

বিরূপাক্ষ মুখে বাঁকা হাসি টেনে বললেন, গুপ্ত ভায়ার যে একেবারে বেসামাল অবস্থা দেখছি।

তীক্ষ্ন গলায় গুপ্তসাহেব বললেন, নেশা একটু হয়েছে। তবে আমাকে বেসামাল অবস্থায় দেখতে গেলে আরো চারজোড়া চোখ থাকা দরকার। আপনাকে কিন্তু কোর্টে অনেকেই বেসামাল অবস্থায় দেখেছে।

- আপনাকেও এবার কোর্টে অনেকে ওই অবস্থায় দেখতে পাবে।

—তার মানে ?

—কয়েকদিনের মধ্যেই নোটিশ পাচ্ছেন।

—নোটিশ ! কিসের নোটিশ ?

টেনে টেনে বিরূপাক্ষ বললেন, পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা এক মারাত্মক অফেন্স। পেনাল কোড-এ এর জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

—আপনি কি বলতে চাইছেন ? ভাসা ভাসা কথা আমার ভাল লাগে না। যা বলবার পরিষ্কার করে বলুন ?

—ভবানী সান্যাল আমার ক্লায়েণ্ট, আপনি বোধহয় জানেন না

—জানতাম না।

—জেনে খুশি হলেন বোধহয়। এই সঙ্গে আরেকটু জেনে রাখুন, উনি মিনিট পনের আগে আমার সঙ্গে দেখা করে ছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের কেশটা গট-আপ করতে বলেছেন।

সেন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন।

এবার বললেন, এসমস্ত বিষয় নিয়ে এখন আলোচনা করার কোন মানে হয় না। যা হবার তা তো কোর্টে হবে, নয় কি ?

গুপ্তসাহেব ভারি গলায় বললেন, আপনার মক্কেলকে বলে দেবেন, ডিফেন্স কিভাবে নিতে হয়, আমি জানি। এই সঙ্গে আরো বলে দেবেন, পাল্টা চোট কিভাবে মারতে হয়, তাও আমার জানা আছে।

বিরূপাক্ষ গর্জে উঠলেন, হামবাগ ! লং টক বরদাস্তের বাইরে।

—হোয়াট ! আপনি আমাকে গালাগাল দিচ্ছেন ?

—হামবাগকে যদি হামবাগ বলে থাকি তাতে হয়েছে কি ?

—কিছু হয়নি বুঝি ? তাহলে স্বচ্ছন্দে আপনার দু-পাটি দাঁত খসিয়ে আনা যায়, তাতেও কিছু হবে না। গুপ্তসাহেব বিরূপাক্ষর টাই চেপে ধরলেন।

পরিবেশ নাটকীয় হয়ে উঠল।

কাঁপতে কাঁপতে বিরূপাক্ষ বললেন, আপনি আমাকে মারবেন ! এত নিচে নেমে গেছেন। এটা 'ফরটি থ্রি ক্লাব'। এখানে গুণ্ডাদের জায়গা হবে না।

সেন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনকে আলাদা করে দিলেন।

—কি হচ্ছে কি ? নিজেদের মান-সম্মানের কথাও মনে রাখতে পারছেন না দুজনে ? এখুনি সকলে ছুটে এলে কি হবে বলুন তো ?

দাস্তিদার হাঁপাচ্ছিলেন।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, আমি চাই সকলে এসে পড়ুক। অভিজাত মস্তানের খেলা দেখে সকলে আনন্দ পাক। আপনাকে বলে রাখছি মিস্টার সেন, হেস্তনেস্ত একটা করবই। কামিং মান্থলি মিটিং-এ স্থির হবে, এই ক্লাবে আমি থাকব না এই লোকটা থাকবে।

গুপ্তসাহেব আর কিছু না বলে গম্ভীরভাবে স্থান ত্যাগ করলেন।

সেন এলেন তাঁর পিছু পিছু।

ক্লাব বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছাকাছি পেঁছাবার পর সেন বললেন, এইভাবে তোমার মেজাজ খারাপ করার কোন মানে হয় না। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।

— তার জন্য ভয় পাই না। আমি স্বীকার করছি নেশা আমার একটু হয়েছে। নেশা না হলেও দস্তিদারের ইডিয়টপনা আমি বরদাস্ত করতাম না। যে কেস এখনও কোর্টে ওঠেনি, তাই নিয়ে ভাবী প্রতিপক্ষকে ভয় দেখানো কোথাকার আইন ?

— লোকটা গাড়ল। তাই বলে ··

— আমি ফেড আপ। ও প্রসঙ্গ থাক। চল, তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিই।

গুপ্তসাহেব গাড়িতে উঠতে যাবেন, অশোক এসে উপস্থিত হল।

মুখ-চেনাচেনি ছিল দুজনের। সেন অশোককে চেনে না।

— কি খবর অশোকবাবু ?

— কাকিমার খোঁজে এসেছিলাম।

— একটু আগে ফোন করেছিলেন তো। মিসেস সান্যাল বলছিলেন বটে, আপনি আসবেন। কিন্তু উনি তো নেই। চলে গেছেন।

অশোক বিস্মিত গলায় বলল, চলে গেছেন ! আমায় বললেন···

— এখানে অপেক্ষা করবেন, মৃদু হেসে গুপ্তসাহেব বললেন, ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু আপনার কাকা এসে এমন একটা সিনক্রিয়েট করলেন যার দরুণ ভদ্রমহিলা আর অপেক্ষা করতে পারলেন না।

— কাকা এসেছিলেন !

— এসেছিলেন বইকি। সে অনেক কথা। আসুন গাড়িতে, নামিয়ে দিয়ে যাব।

তিনজন বসলেন ভেতরে। গাড়ি সচল হল।

জওহরলাল নেহেরু রোডে এসে পড়ার পর অশোক বলল, এখানেই নামব। এসপ্লানেডে একটা কাজ আছে। ওটা সেরে বাড়ি ফিরব।

অশোক নেমে যাবার পর গুপ্তসাহেব আর সেন দক্ষিণ দিকে চললেন।

অলকা ফোন নামিয়ে রাখল।

রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দ্রুত হাতে চিরুনি চালিয়ে নিয়ে চুল ঠিক করে নিল। নাকের পাশেটাসে পাফ বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে ভাল করে দেখে নিল। ভারি মিষ্টি লাগছে। নিজের মনেই হেসে উঠল মদালসা ভঙ্গিতে।

— কিগো, এত হাসাহাসি কেন ? অসময়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

মায়া দরজা ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা বলল।

— গোমেজ ফোন করেছিল। হাতে একেবারেই সময় নেই। দশটার সময় পেঁছাতে হবে।

—গোমেজ মুখপোড়া আমাকে অনেকদিন খবর দেয়নি। ওকে কড়কে দিতে হবে। আমি কি লোককে খুশি করতে পারি না? তা খদ্দেরটি কে?

—একজন হাইকোর্টের লোক। আরেক দিন ওখানে যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি। চলি মায়াদি। সকালে ফিরে এসে সব কথা বলব।

অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেণীমাধব দত্ত স্ট্রীটের একটা দোতলা বাড়ির পুরো একতলাটা ভাড়া নিয়ে অলকারা থাকে। ওরা আছে মোট ন'জন। বাথরুম, রান্না ইত্যাদি ছেড়ে দিলে শোবার ঘর মাত্র তিনখানা। একটু সেকেলে ধরনের বাড়ি। সুবিধার মধ্যে টেলিফোনটা পাওয়া গেছে। জনদুয়েক বাদ দিলে, বাকি সাতজন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে কলকাতায়। তারপর ঘটনাচক্রে একত্রিত হয়েছে এই বাড়িতে।

ওরা সকলেই মিডওয়াইফ বা সেবা-টেবার কাজ করে। অনেকে বেসরকারি প্রসূতি সদনের সঙ্গে যুক্ত। আবার কেউ কেউ বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসব করিয়ে আসে বা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা রুগীকে দেখাশুনা করতে যায়। এই কাজকর্মে অবশ্য এমন আয় হয় না যাতে সখ আহ্লাদ মোটামুটি মেটানো যায়। অগত্যাই ওদের বাঁকা পথ দিয়ে আনাগোনা করতে হয়।

ক্লাব বা হোটেলে গোমেজের মত কিছু লোক আছে। যারা এই সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কমিশনের বিনিময়ে খদ্দের জুটিয়ে দেয়। অলকারাও খুশি। পরের বিছানায় মাসের মধ্যে পাঁচ-ছ রাত কাটালে যদি মোটামুটি রেস্ত হাতে আসে, খুশি না হয়ে উপায় কি? এই ন'জনের মধ্যে চারজনের বাজার-দর ভাল। বয়স তাদের চব্বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। জেল্লাদার গড়ন, মুখে চটক আছে।

রাস্তায় নেমে অলকা আরেকবার রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিল। এখনও সময় আছে কিছু। গোমেজের এই এক দোষ, সময় হাতে রেখে কখনও খবর দেবে না। প্রতিবারই এইরকম তাড়াহুড়ো করতে হয়। মোড়ের মাথায় মিনিট দুয়েক দাঁড়াবার পরই বাস পাওয়া গেল। ভাগ্যক্রমে বাসে তেমন ঠেসাঠেসি নেই। বসার জায়গা পাওয়া গেল।

অলকা কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেনি।

দীপেন বাসের সামনের দিকে উঠেছে। বন্ধুরা একে একে চলে যাবার পর ও একটা রকে বসে একলাই সিগারেট ফুঁকছিল। অলকাকে এই অসময়ে সেজে গুজে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে একটা সন্দেহ মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। বন্ধুরা বলছিল, ও-বাড়ির মেয়েরা নাকি দিনের বেলায় ওখানে কাজ করে আর রাত্রে বাবু যোগাড় হলে তার সঙ্গে রাত কাটায়।

কথাটা বিশ্বাস করেনি দীপেন। এই ধরনের নোংরা কাজ আর যেই করুক, অলকা করতে পারে না। মাস ছয়েক ধরে একটু একটু করে অলকার সঙ্গে তার প্রেম দারুণ জমে উঠেছে। চাকরিতে আর একটা প্রমোশন পেলে ওকে বিয়ে

করবে এক রকম ঠিক। বেচারা দীপেন কি ভাবেই বা জানবে, আস্ত ফলের সন্ধান না করে সে ছিবড়ের পিছনে ছুটছে।

আসল কথাটা হল, অলকার মত মেয়েরা একটা ছেলে বেছে নিয়ে আস্কারা দিতে থাকে। তারা এটা ভালই জানে মক্কেল ধরে ধরে সমস্ত জীবন কাটান যাবে না। এমন দিন আসবে যেদিন এত আয় থাকবে না, দেহের বিনিময়ে একটা টাকাও কেউ দিতে চাইবে না। আসবে প্রচণ্ড ক্লান্তি। সেদিন চাই একজন স্বামী – নির্ভর করার মত একজন লোক। তাই দীপেনের মত ছোকরাদের এখন প্রশ্রয় দিয়ে যেতে হবে।

অলকাকে অসময়ে বাড়ি থেকে বেরতে দেখে দীপেনের মন সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল। কোথায় চলেছে এখন – তবে কি বন্ধুরা যা বলেছে তার মধ্যে সত্যের ছোঁয়া আছে? দেখা দরকার ও কোথায় চলেছে। দীপেন তাই বাসের সামনের দিকে উঠে একটু আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নির্দিষ্ট স্টপেজে অলকা নামল।

ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে একটা কাগজের টুকরোয় ঠিকানাটা লেখা আছে। যাক, কয়েকবার আওড়ে যাওয়ার দরুণ বেশ মনে আছে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই দোতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা পাওয়া গেল। প্রথমেই সিঁড়ি। একধারের দেওয়ালে কাঠের বোর্ড লাগান। চারজন ভাড়াটের নাম লেখা রয়েছে তাতে। দুজন ওপরে, দুজন নিচে। গুপ্তসাহেব থাকেন ওপরে। অলকা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। দরজায় নাম লেখা প্লেট আটকানো।

বারান্দার অপর প্রান্তে হাল্কা পাওয়ারের বাল্ব জ্বলতে থাকায় জায়গাটা তেমন আলোকিত নয়। অলকা দেখল, দরজার কড়ায় তালা ঝুলছে। সে বিরক্ত হল। এ কি ধরনের ভদ্রতা। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নিজেই অনুপস্থিত! মনে মনে মুণ্ডপাত করল গোমেজের! ঠিক এই সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজার কাছ থেকে দ্রুত ওধারে অলকা সরে গেল। একজন স্মার্ট ভদ্রলোক দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলতে যাবেন – অলকা কাছ ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন।

—একি!

কুণ্ঠিত গলায় অলকা বলল, গোমেজের কাছ থেকে খবর পেয়ে এলাম।

—গোমেজ!

—ফরাট থ্রি ক্লাবে কাজ করে। আরেক দিন ডাক পেয়েছিলাম, অসুস্থ থাকায় আসতে পারিনি। আজ খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি।

—হুঁ। কিন্তু এখন তো আমি ব্যস্ত। মানে…

— কিন্তু আপনার নির্দেশ পেয়েই তো গোমেজ…

— ঠিক আছে। গোমেজকে আমি বলেছিলাম। কাজের চাপটা এসে

পড়ল তারপরই। এক কাজ করুন, এই টাকাটা রাখুন। পরে আপনাকে খবর দেব।

নোটগুলো হাতে নিয়ে অলকা বলল. পঞ্চাশ টাকা! আমি তো পঁচাত্তর টাকা নিয়ে থাকি। তাছাড়া গোমেজের কমিশন—.

আরো পাঁচটা দশ টাকার নোট হস্তান্তরিত হল।

—এখন আসুন। ওই কথাই রইল তাহলে।

অলকা আর কিছু না বলে, নোটগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরতে ভরতে সিঁড়ির দিকে এগুলো। কত রকম মানুষ যে আছে পৃথিবীতে। নিজের প্রয়োজন না মিটিয়েই এক কথায় একশ টাকা দিয়ে দিলে! মরুকগে যাক। রাতে ঘুমের আশা ত্যাগ করেই এসেছিল। এখন আর কোন ঝামেলা রইল না। অলকা খুশি খুশি মনেই ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাসে আর নয়, একটা ট্যাক্সির সন্ধান দেখা যাক। আজ একটু আরামেই ফেরা যাক আস্তানায়।

—এই যে…

চমকে অলকা মুখ ফেরাল।

মাত্র হাত দুয়েক পিছনে দীপেন দাঁড়িয়ে। বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

—অভিসার বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল?

—তুমি এখানে?

—আমার কথা থাক। প্রশ্নের উত্তর দাও।

অলকা হাসল।

এমনভাবে প্রশ্ন করছ যেন তুমি আমার গার্জেন। অভিসার আবার কি? এসেছিলাম একটা কল পেয়ে। গুপ্তসাহেব একজন হোমড়া চোমড়া লোক। তাঁর কোন এক আত্মীয় অসুস্থ। আমি তাঁকে কয়েকদিন অ্যাটেণ্ড করতে পারব কিনা তাই নিয়েই কথা হল।

ভারি গলায় দীপেন বলল, তোমার কথা বিশ্বাস করা শক্ত। টাকার বিনিময়ে তোমরা নাকি সব রকম নোংরা কাজই করে থাক। শোন অলকা, আমি তোমার কথা ভেরিফাই করতে চাই। বুঝতেই পারছ, এর ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি রকম থাকবে।

—তুমি গুপ্তসাহেবের কাছে যাবে?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোকের উপাধী তাহলে গুপ্ত। নামটা কি?

—না দীপেন, ছেলেমানুষীর একটা সীমা আছে। ওখানে তোমার যাওয়া চলবে না।

—আমি জানতে চাই, কেন?

—এ ধরনের প্রশ্নের কোন মানে হয় না। তোমার উপস্থিতিতে ভদ্রলোক ভড়কে যাবেন। কত কি ভাবতে পারেন। মাঝ থেকে মোটা টাকার কাজটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

—যেতে আমায় হবেই। তিনি যাতে ভড়কে না যান সেই ভাবে কথা বলব। কাজ হাতছাড়া হবে না। একটা কথা বুঝতে পারছি না সত্যি কথা যদি বলে থাক—তোমার ভয় পাবার কি আছে ?

—আমার ভয় পাবার কি আছে। তবে—একটা কথা শোন…

দীপেন আর শুনল না। দ্রুত ঢুকে গেল ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে। দুর্ভাবনার পাহাড় নেমে এল অলকার মাথার ওপর। দীপেন কি বলবে ওই ভদ্রলোক সেই সমস্ত কথার উত্তরে কি বলবেন—সমস্ত পরিস্থিতিটাই জটিল হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁট কামড়ে ধরে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে রইল অলকা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

একটা ট্যাক্সি পাওয়া দরকার।

ওদিকে…

একতলার দুটো ফ্ল্যাটের নেমপ্লেট পড়ে দেখে নেবার পর দীপেন দোতলায় উঠল। এবার আর অসুবিধা হল না গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে। কলিং বেল ঠিক জায়গা মতই লাগান। পুশারে বার দুয়েক চাপ দেবার পর দরজা খুলে গেল। স্মার্ট চেহারার এক ভদ্রলোক তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

—আপনি কি মিস্টার গুপ্ত ?

—হ্যাঁ। আপনি…

—দীপেন রক্ষিত। অলকা সম্পর্কে

—অলকা! ও, যে মেয়েটি একটু আগে এসেছিল ?

—হ্যাঁ। তার সম্পর্কে কিছু কথা ছিল। মানে…

—ভেতরে আসুন।

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে দীপেন ভেতরে ঢুকল।

—কুমকুম রং এর ফিয়েট মন্থর গতিতে যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন সাড়ে নটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি রয়েছে। গাড়ি থেকে প্রথমে নামল ইরা, তারপর নিশীথ। তারা ভরা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ওরা অকারণেই হেসে উঠল। মধুর আমেজে মোড়া অথচ এমন দুঃসাহসিক বাঁক আজই সন্ধ্যায় নিতে হবে—একথা কি সকালেই ওরা ভেবেছিল ?

সময় সময় এমনই অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে যায় আচম্বিতেই।

নিশীথ অপমানিত হয়ে চলে যাবার পর গোটা রাতটা ইরা ঘুমোতে পারেনি। মনকে উতলা করে রেখেছিল রাগ আর অভিমান মিশ্রিত এক বিচিত্র আবেগে। ইরা ভেবে পায়নি, বাবা তাকে এত প্রশ্রয় দিয়েছেন, কোন অভাবই অপূর্ণ রাখেননি—এরপর সে যদি নিজের মনের মত জীবন-সাথী নির্বাচন করে থাকে তাতে তাঁর সানন্দে রাজি হয়ে যাবারই কথা। পরিবর্তে তিনি এমন মারমুখি হয়ে উঠলেন কেন ?

যাহোক, সকাল হবার পরই মনস্থির করে ফেলল। কোন আপত্তি, কোন বাধা ইরা আর মানবে না। এখন তার একমাত্র কাজ হল নিশীথের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আভিজাত্যের মিনার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে দেখে ভবানীশংকর রাগে অন্ধ হয়ে উঠবেন এটা ঠিক। হয়ত মেয়েজামাইকে বিপাকে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাবেন।

ইরা ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। ও-সমস্ত কথা ভাববে না। যা হবার হবে। এখন তার একমাত্র কাজ হল নিশীথের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সে কাজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই করেছে ইরা। এর পরের সমস্ত কিছু ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত আর নিয়মানুগ ভাবে।

নিশীথ পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বার করতে করতে বলল, অশোককে ধন্যবাদ জানাবার সময় পেলাম না। ওর বাহাদুরী আছে বলতেই হবে। কি রকম তাড়াতাড়ি কালীঘাটের মন্দিরে আমাদের ব্যবস্থাটা করে ফেলল বল তো ?

—দাদা আমাকে ভীষণ ভালবাসে।—ইরা বলল, সত্যি কথা বলতে কি, দাদার সহযোগিতা পাব নিশ্চিত ছিলাম বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।

—এতক্ষণে নিশ্চয় তোমাদের বাড়িতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। তোমার বাবা বোধহয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

—ও কথা থাক। ভাবতে ভাল লাগে না।

ইরা গাড়ি লক করল।

নিশীথ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করল। দরজায় বড় আকারের প্যাড লক ঝুলছিল। তালাটা খোলবার পর দুজনে ভেতরে ঢুকল। দেখাসাক্ষাৎ করতে যাঁরা আসেন, তাঁদের—এই ঘরে বসান হয়। অল্প দামের সোফাসেটি দিয়ে মোটামুটিভাবে সাজান।

সোফার উপর গা এলিয়ে দিল নিশীথ।

—আমাদের দাম্পত্যজীবন তাহলে আরম্ভ হল!

ছোট্ট উত্তর দিল ইরা, হুঁ।

—কাল পর্যন্ত আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না, কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে। আজ আর কোন ভাবনা নেই, কি বল ?

ইরা সোফার হাতলের ওপর বসল।

—সাহস দেখাতে পারলে কোন সমস্যাই সমস্যা নয়।

—স্বীকার করতেই হবে, তুমি দারুণ সাহস দেখিয়েছ। এবার একটা কাজের কথা বলি। শাস্ত্রে না কোথায় যেন বলা হয়েছে, পতি পরম গুরু। কথাটা শুনেছ তো ?

—এরকম একটা কথা সেকালে প্রচলিত ছিল বটে।

ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে নিশীথ বলল, একালে আমি ব্যাপারটা চালু করতে চাই। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমি তোমার পরম গুরু। আমার প্রতিটি আদেশ মুখ বুজে পালন করে যাওয়াই হল তোমার ধর্ম।

—বটেই তো। পরম গুরু এবার আদেশ করুন কি করতে হবে?

—কঠিন কোন আদেশ এখন নেই। হোটেলের সুখাদ্যে আমাদের পেট ভরপুর। এখন আমাদের দু-কাপ কফি হলেই চলবে। রান্নাঘরে চলে যাও। তারপর ··

—তারপর দু-কাপ কফি তৈরি করে আনব?

- তা তো আনবেই। তারপর সারারাত আমি তোমাকে বিরামহীন ভাবে আদর করে যাব।

তখন তুমি কি করবে বল তো?

নিশীথের কাঁধের ওপর ছোট্ট একটা চিমটি কেটে ইরা উঠে দাঁড়াল।

—তোমার মত অসভ্য লোকের পাশে আমি শোবই না।

তারপর এক ঝলক হাসি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এর পরই আছে ছোট্ট একটা করিডর। করিডরের ওধারে শোবার ঘর। তারপর বারান্দা। বারান্দার শেষপ্রান্তে রান্নাঘর। একতলায় আরো কয়েকখানা ঘর অবশ্য আছে। প্রয়োজন পড়ে না বলে সেগুলো তালা দিয়ে রেখেছে নিশীথ।

সিগারেট নিভে গিয়েছিল। আবার ধরিয়ে নিল। নিজেকে এখন কলকাতার সেরা সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছে। সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে নিশ্চুপ পরিবেশ তীক্ষ্ণ চিৎকারে খানখান হয়ে গেল। কি রকম হল? ইরা এরকম চিৎকার করে উঠল কেন?

সোফা থেকে নিজেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে করিডরে গিয়ে পড়ল। শোবার ঘরের দরজা ধরে ইরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছাকাছি যেতেই লক্ষ্য করল ঠকঠক করে কাঁপছে সে। মুখের যে পাশটা দেখা যাচ্ছে—ঘামে ভিজে উঠেছে। ব্যাপারটা কি?

—কি হয়েছে?

ইরা উত্তর দিল না।

ওর কাঁধ চেপে ধরে নিশীথ ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করল, কি হয়েছে?

—খাটের দিকে তাকিয়ে দেখ।

খাটের দিকে তাকাতেই নিশীথ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দৃশ্যটা যেমন অভাবনীয় তেমনই অবিশ্বাস্য।

ভুল দেখছে না—এটা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেও, নিশীথ হাত দিয়ে একবার নিজের দু চোখ কচলে নিল। অবশ্যই দৃশ্যের কোন তারতম্য হল না। ব্র্যাকেটে আটকানো দুটো একশ পাওয়ারের বাল্ব ষোল বাই চৌদ্দ মাপের ঘরখানাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। নিচু খাটখানা জানলার প্রায় ধারেই। হাল্কা গোলাপি রংয়ের বম্বে ডাইং-এর চাদর পাতা বিছানার ওপর জোড়া বালিশে মাথা রেখে একজন চিৎ হয়ে রয়েছে।

দামি বিদেশী পোশাক তার গায়ে।

অপরিচিত পুরুষ।

গলার ঠিক নিচে একটা ছোরা বিঁধে রয়েছে।

পুরো ব্লেডটাই ঢুকে গেছে ভেতরে। পেতল বা ওই জাতীয় কোন ধাতুর তৈরি বাঁটটা শুধু দেখা যাচ্ছে। বাঁটের উপর লাল সবুজ মিনার কাজ। বুটিদার টাই আর সাদা একাংশ ভিজে উঠেছে রক্তে। অবশ্য রক্তের রং এখন গাঢ় লাল নেই। ক্রমেই শুকিয়ে উঠতে থাকায় কালচে হয়ে আসছে।

দুজনের হতভম্ব ভাবটা কাটতে কয়েক মিনিট সময় লেগে গেল।

শেষে···

কাঁপা গলায় ইরা বলল, লোকটাকে চেন ?

—না। তুমি—?

—আমিও চিনি না।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের শোবার ঘরে একজন অপরিচিত লোককে খুন করে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?

—মাথাটা ঝিমঝিম করছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

ইরা চৌকাঠের পাশে বসে পড়ল।

ব্যস্তভাবে নিশীথ বলল, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে ?

—আমার এক মিনিট এখানে ভাল লাগছে না। রক্ত দেখলেই মাথাটা কেমন করতে থাকে। গা বমি-বমি করে।

—এখানে তোমায় থাকতে হবে না। বসার ঘরে চল।

নিশীথ ইরাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বসার ঘরে এসে সোফার ওপর শুইয়ে দিল। ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল পাখাটা। ভয়, উত্তেজনা আর বিস্ময়ের মিলিত চাপ ওকে এখন সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। জীবনের চরম সুখাবেশের দিনে এরকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি যে কাউকে দাঁড়াতে হয়, কল্পনাও করা যায় না।

– শরীর কি খুব খারাপ লাগছে ? ডাক্তার ডাকব ?

ইরা উঠে বসল।

— ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি ঠিক আছি। ওই ব্যাপারটা নিয়ে এখন

—পুলিশকে ফোন করছি, ওরা আসুক।

— পুলিশ ! ! !

—পুলিশকে তো জানাতেই হবে। নইলে···

ইরা দ্রুত গলায় বলল, না, না পুলিশকে জানান চলবে না। তুমি বুঝতে পারছ না ! আমরা ভীষণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব। একটা লোক খুন হয়ে আমাদের শোবার ঘরের বিছানায় পড়ে আছে, আমরা ও সম্পর্কে কিছুই জানি না, পুলিশ এ-কথা বিশ্বাস করবে না।

তারা আমাদের খুনী ভাববে ?

—নিশ্চয়ই ভাববে। এটা ভাবাই স্বাভাবিক। তারা ভাববে, খুনটা করার করার পর আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি ভালমানুষী দেখাবার জন্য। ইচ্ছে

করেই আমরা কিছু না করার ভান করছি।

নিশীথ দ্রুত চিন্তা করতে লাগল।

ইরা মিথ্যা বলেনি। কথাতেই আছে পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। তারপর আজকালকার পুলিশের ঘাড়ে এত রকম ঝামেলা চেপে রয়েছে যাতে তারা অনেক কিছুই গভীরভাবে ভেবে করার অবসর পায় না। তাছাড়া যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ওদের হত্যাকারী ভেবে নেওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই।

—একদিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছ। তবে···

—বল ?

—মৃতদেহটা তো অনন্তকাল ধরে আমাদের বিছানায় পড়ে থাকতে পারে না। কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—তাতো হবেই।

—কি করা যায় বল তো ?

—ভাগ্যক্রমে গাড়িটা রয়েছে। গাড়ির কেরিয়ারে বডিটা তুলে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে এলে হয় না ?

—মন্দ বলনি। কিন্তু ফেলে আসার মত একটা নির্জন জায়গা তো চাই।

—গঙ্গার ধারই হল সবচেয়ে ভাল জায়গা।

—খুব সহজে কি পারব আমরা কাজটা করে আসতে ?

—কেন ?

—এখন গরমকাল। মাঝি-মাল্লাদের জেগে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া বেদেরা ওখানে আড্ডা গেড়েছে আমরা কয়েকদিন আগেই দেখেছি। এছাড়া কেরিয়ার থেকে ডেডবডি বার করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। সমস্তটাই দারুণ রিস্কি। আমার মতে স্পট হিসাবে গঙ্গার ধারটা সুবিধাজনক হবে না।

ইরার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল ?

সত্যি কথা বলতে কি ওর কান্না পাচ্ছিল। এমন বিপদে মানুষে পড়ে !

নিশীথ আবার বলল, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। যা কিছু করার রাত্রের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। মনের মত একটা জায়গার কথা আমি ভাবছি, তুমিও ভাব।

ইরা কিছু বলতে যাচ্ছিল—বলা আর হল না।

দরজায় কেউ করাঘাত করছে। চমকে উঠল দুজনে। এই অসময়ে আবার কে এল ? এ এক উটকো ঝামেলা। নিশীথ দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে এল। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আসতে ভুলল না। থেমে থেমে তখন দরজায় করাঘাত হচ্ছে।

কাঁপা গলায় ইরা বলল, কে এল বল তো ?

—দেখছি। তুমি সহজ হবার চেষ্টা কর। হাসি-হাসি থাক—যেন দারুণ আনন্দে আছ এমন একটা ভাব।

নিশীথ ছিটকিনি খুলে, পাল্লা ফাঁক করে মুখ বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের মধ্যে বরফের স্রোত বয়ে গেল। অধৈর্য ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন মধ্যবয়স্ক পুলিশ কর্মচারি। আগেও ভদ্রলোককে কোথাও দেখেছে। মনে হয় স্থানীয় থানার কেউ হবেন। কিন্তু এই সময়ে এখানে কেন? খবরটা কোন রকমে জানাজানি হয়ে গেছে নাকি!

নিশীথ তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

যতদূর সম্ভব নিজেকে সহজ করে নিয়ে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলল মুখে।

কাকে খুঁজছেন?

— নিশীথ মৈত্র এখানে থাকেন?

—আমার নাম। বলুন?

ইন্সপেক্টর বললেন, হেড অফিসের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। ইরা সান্যাল নামে কোন মহিলা এখানে আছেন?

—ইরা মৈত্র নামে একজন এখানে আছেন। অবশ্য আগে তিনি সান্যাল ছিলেন।

—তার মানে?

—গোলমেলে কোন কথা তো আমি বলিনি। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে পদবী পাল্টে যাওয়াই স্বাভাবিক।

—দেখুন, আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে, ইরা সান্যাল কলেজে যাবার নাম করে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। যখন তিনি বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি অবিবাহিত। এখন আপনি অন্য রকম কথা বলছেন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—আপনাদের কে জানিয়েছে, তাকে আমার কাছে পাওয়া যাবে?

— ও'র বাবা। তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি নিশ্চয় জানেন। উপর-মহলে তাঁর বিশেষ খাতির।

তীক্ষ্ন গলায় নিশীথ বলল, সেই খাতিরের ধাক্কায় আমরা গরীবরা অনর্থক জবাই হব—এর কি কোন মানে আছে? আপনি এখন আসুন ইন্সপেক্টর। আমাদের ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয়েছে।

— মহিলার সঙ্গে দেখা না করে আমি যেতে পারি না নিশীথবাবু। তাঁকে এখানে একবার ডাকুন, কিম্বা আমায় ভেতরে যেতে দিন।

এই সময় ইরা বাইরে বেরিয়ে এল।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সে সবই শুনেছে। বলল বেশ দৃঢ় গলাতেই, আমি ইরা। আপনি আমায় কি বলতে চান?

ইন্সপেক্টর বললেন, আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন?

—ওই ধরনের কথা বলে আমাকে অপমান করবেন না। যা করেছি, ভেবেচিন্তেই করেছি। আমার বয়স বাইশ বছর। স্বাধীন ভাবে নিজের সম্পর্কে কিছু করার অধিকার আইন আমায় দিয়েছে।

নিশীথ বলল, এত কথায় কাজ নেই। আমি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইছি ইন্সপেক্টর, আমাদের বিরুদ্ধে কি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে?

ইন্সপেক্টর বললেন, না, নেই। আমি দেখতে এসেছিলাম, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওঁকে দিয়ে কিছু করানো হয়েছে কিনা।

—নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন সেরকম কিছু হয়নি।

ইরা বলল, বাবাকে গিয়ে বলবেন, আমি ভাল আছি। যথেষ্ট শান্তিতে আছি। পরে সুবিধা মত তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

একটু চুপ করে থাকার পর ইন্সপেক্টর বললেন, বেশ। প্ররোচনা ছাড়াই যখন আপনি যা করবার করেছেন, তখন আর বলার কিছু রইল না। ভাল কথা, বিয়েটা আপনাদের হল কোথায়?

নিশীথ বলল, কালীঘাটের মন্দিরে।

—চলি।

ভদ্রলোক গেট পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওরা দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘরে এসে বন্ধ করে দিল দরজাটা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুজনে। বিরাট একটা বিপদ মাথার ওপর ঝুলছে, এই সময় আবার উটকো ঝামেলা। আবার লোকটা কোন অজুহাত নিয়ে ফিরে না এলে বাঁচা যায়।

নিশীথ বলল, গোদের ওপর বিষফোঁড়া। এরপর তোমার বা আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউই এসে পড়লেই চিত্তির। তাদের তো আর বাইরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

—তা তো যাবেই না। হাতে আমাদের সময় নেই বললেই চলে। মড়াটা কোথায় চালান দেওয়া যাবে কিছু স্থির করতে পারলে?

—একটা জায়গার কথা মনে পড়েছে। সরকারের ঘাড়ে মড়াটা চাপিয়ে দেওয়া যায়। অথচ আমরা থাকব সন্দেহের বাইরে।

— একটু বুঝিয়ে বল?

—লেফট্ লগেজের কথা বলছি। ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা প্রয়োজন হলে যেখানে মাল জমা রাখে, আমরাও এই মৃতদেহটা একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্ধ করে, যাত্রী সেজে স্টেশনে পৌঁছাব। তারপর ট্রাঙ্কটা লেফট্ লগেজে জমা দিয়ে সরে পড়ব। প্ল্যানটা কেমন বল?

— ভালই। তবে—

—আবার কি হল?

—এত বড় ট্রাঙ্ক আছে বাড়িতে।

—ট্রাঙ্কটা আছে বলেই তো প্ল্যানটা মাথায় এল। আর দেরি করে লাভ নেই, এস, কাজে নেমে পড়া যাক।

— কোন স্টেশনে যাবে?

—আমি হাওড়ারই পক্ষপাতি।

রং চটা একটা বড় আকারের ট্রাঙ্ক নিশীথ টেনে বার করল রান্নাঘরের পাশের

ছোট ঘরটা থেকে। গয়া থেকে এখানে আসবার সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু এই ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে এসেছিল।

এরপর মৃতদেহ ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরে ফেলতে গিয়ে ওরা গলদঘর্ম হল। হবারই কথা। মৃতব্যক্তির চেহারা হাড়-জিরজিরে নয়—রীতিমত ওজনদার।

প্রায় পনের মিনিট চেষ্টার পর পা দুটোকে মুড়ে কোনরকমে দেহটা ট্রাঙ্কের মধ্যে ঠেসে দেওয়া সম্ভব হল। কে খুন করেছে, এমন কি কে খুন হয়েছে তাও জানা নেই—অথচ প্রাণান্তকর দায়িত্ব এখন ওদেরই। নিশীথ ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করে দিয়ে তালা লাগাল। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল, দশটা বেজে পাঁচ।

গাড়িটাকে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে আসা হল। ট্রাঙ্কটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। ইরার পক্ষে একদিক তুলে ধরা অসম্ভব শ্রমসাধ্য ব্যাপার। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটুখ লাল করে, ঘামতে ঘামতে কোন রকমে নিজের দায়িত্বটা পালন করল। এতবড় ট্রাঙ্কটা যে ঠিকমত কেরিয়ারে রাখা সম্ভব হল তা নয়, ঢাকনাটা একটু উঁচু হয়ে রইল। তা থাক, পড়ে যাবার ভয় নেই।

স্টিয়ারিং-এর সামনে গিয়ে বসল ইরা।

ওর পাশে বসে নিশীথ বলল, হাওড়া চল।

—শিয়ালদা গেলে কি হয়? কাছে পড়বে।

ওখানকার কয়েকজন রেল কর্মচারি আমার পরিচিত। তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আরো ঝামেলা বাড়বে।

আর কোন কথা হল না।

কুমকুম রং-এর ফিয়েট দ্রুত ধাবিত হল হাওড়ার দিকে। রাত্রির ব্রীজ যান-বাহনে ঠাসা ছিল না। বেশ ফাঁকাই পাওয়া গেল। স্টেশনে নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে অসুবিধা হল না। একটা কুলির আশায় নিশীথ তাকাতে লাগল এধার ওধার।

এই সময় কথাটা বলল ইরা।

—এখান থেকে সরাসরি যদি তুমি লেফট্ লগেজে যাও, তাহলে কিন্তু কুলির চোখেই ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হবে।

—কেন?

—লেফট্ লগেজে মাল রাখে কারা? ট্রেন থেকে যারা নামছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নয় কি? আমরা আসছি শহরের দিক থেকে। তাই বলছিলাম···

—ঠিক বলেছ। কথাটা আমার মনেই আসেনি। এক কাজ করা যেতে পারে। আমি ট্রাঙ্কটা নিয়ে স্টেশনের ভেতরে চলে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে কুলিটাকে বিদায় করব। তারপর অন্য একটা কুলির মাথায় ট্রাঙ্কটা চাপিয়ে লেফট্ লগেজে চলে যাওয়া যাবে।

—এইভাবে কাজটা করা যেতে পারে। তবে খালি হাতে তোমার প্লাটফর্মে যাওয়া ঠিক হবে না, একটা টিকিট কাটিয়ে নাও।

—কোথাকার টিকিট কাটাই বলতো ?

—কোথাওকার একটা।

—বর্ধমানেরই কাটাচ্ছি। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে যাহোক।

নিশীথ গাড়ি থেকে নামল।

একটা কুলি ততক্ষণে এসে পড়েছে।

—বর্ধমানে যাবার এখন কোন্ গাড়ি আছে ?

কুলি বলল, দশ মিনিটের মধ্যে পাবেন। জনতা এক্সপ্রেস শেষ গাড়ি হুজুর। তাড়াতাড়ি করুন।

—আমি টিকিট কাটিয়ে আসছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

নিশীথ টিকিট কাউন্টারের দিকে দৌড় মারল। ভাগ্যক্রমে কাউন্টার খালি ছিল। টিকিট নিয়েই দৌড়ে ফিরে এল গাড়ির কাছে। কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক চাপাতে আবার গলদঘর্ম হতে হল। কুলির শরীরটা ভারে প্রায় বেঁকে গেল।

—বেজায় ভারি হুজুর।

—কাঁসার বাসন আছে। চল…

ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন আপ জনতা এক্সপ্রেস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হযে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গার্ড নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। কুলি যতদূর সম্ভব দ্রুত একটা কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিশীথ বলল, ভেতরে যেতে হবে না। বাইরেই রাখ ট্রাঙ্কটা।

কুলি অবাক হয়ে গিয়ে বলল, বাইরে রাখব কি বলছেন হুজুর। আপনি তো বললেন বর্ধমান যাচ্ছেন।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল নিশীথ।

—এই দেখ, কি বলতে কি বললাম। দেখছ কি। তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কটা ভেতরে গিয়ে রাখ। গাড়ি ছাড়ার সময় হল।

নিশীথ ভেবে দেখল এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। লেফট্ লগেজে গিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে অনেক ভাল। এখন রাত। সকাল হবার আগে ট্রাঙ্কটাকে মালিকবিহীন বা সন্দেহজনক মনে হবার কথা নয়। ততক্ষণে কলকাতা কয়েকশ মাইল পিছনে।

খুব একটা ভিড় ছিল না কামরায়। কুলি বাঙ্কের উপর ট্রাঙ্ক নামিয়ে রাখল। ভাড়া নিয়ে সে চলে যাবার পর নিশীথ যাত্রীদের দিকে তাকাল। অধিকাংশই বিহার বা উত্তরপ্রদেশের লোক। তারা এখন শোবার আয়োজন করতে ব্যস্ত। এই সময় ট্রেন দুলে উঠলে শুনতে পাওয়া গেল ডিজেল ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

বাথরুমে যাবে এমন একটা ভঙ্গি করে নিশীথ প্যাসেজে এসে দাঁড়াল। গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। দরজা খোলাই ছিল। শরীর একটু ঝুলিয়ে নেমে পড়ল। গাড়ির গতি সম্ভব মত দ্রুত। একটা মরীয়া ভাব ওকে পেয়ে বসেছে। ওর মত অনেক লোকই অবশ্য তখন ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমেছে।

তারা প্রিয়জনদের তুলতে এসেছিল। কাজেই নিশীথের কার্যকলাপ সন্দেহ-জনক মনে হল না কারুর। সাপের মত বেঁকতে বেঁকতে জনতা এক্সপ্রেস এগিয়ে চলেছে নিশীথ তখন হাঁটছে বিপরীত দিকে।

গাড়ির কাছে যখন পৌঁছাল, তখন বেশ নিশ্চিন্ততা এসে গেছে মনে। এক প্রাণান্তকর ঝামেলাকে কোনরকমে পাশ কাটানো সম্ভব হল। স্টিয়ারিং-এর ওপর হাত রেখে চিন্তাচ্ছন্ন মুখে ইরা বসেছিল।

- কি হল ?

—কাজটা ভাল ভাবেই উতরেছে। চল ফেরা যাক।

নিশীথ ইরার পাশে গিয়ে বসল।

ওদিকে

জনতার গতিবেগ তখন বেড়েছে। অধিকাংশ যাত্রীই শুয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ বড় আলোই নেভান। আজকে ভিড়ও কম—প্রচুর বার্থ খালি যাচ্ছে। পিকু চারমিনারে টান দিতে দিতে আসছিল। কি মনে হওয়ায় জানলার ধারে একটা খালি জায়গা পেয়ে বসে পড়ল। গোটা পাঁচেক কামরা পরিদর্শন করে সে এখন ফিরছে। কোন অসুবিধা নেই। করিডরের ব্যবস্থা আছে। কামরা থেকে না নেমেই ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাওয়া যায়।

পিকুর মন-মেজাজ ভাল নেই। এই ট্রেনটাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কেন কে জানে মালকড়ি তেমন রোজগার করা যায় না। যে জনতা দিল্লী যায়, সেটা বরং ভাল। কিন্তু ওস্তাদের কি যে খেয়াল মাঝে মাঝেই এই বাই উকিল দেরাদুন-জনতায় তাকে জুড়ে দিচ্ছে। আজ মৃদু আপত্তি তুলেছিল, পরিবর্তে ওস্তাদের ভারি থাপ্পড় খেয়েছে।

পিকু আগে ময়দান অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বায়ুসেবি আর খেলার হুজুগে মাতোয়ারা মানুষের পকেট হাল্কা করতে তার অসুবিধা হত না। হবেই বা কেন ? অভিজ্ঞতা তো আর কম দিনের নয়। এই লাইনে যখন হাতেখড়ি হয়, তখন দশ বছরে পা দিয়েছে, আর আজ ছাব্বিশ চলছে তার। ভাগ্য বলতে হবে এখনও পর্যন্ত পুলিশের চোখে পড়েনি।

ময়দান থেকে পিকুকে বদলি করা হল হাওড়া স্টেশন।

তারপর কাজ ট্রেনে ট্রেনে। ব্যস্ত, অন্যমনস্ক বা নিদ্রিত মানুষের পকেট মারার উপযুক্ত জায়গা। তাছাড়া সুযোগ পেলে সুটকেশ বা ওই জাতীয় কিছু নামিয়ে নিতেও অসুবিধা হয় না। আসানসোল পর্যন্ত যাবে পিকু। তারপর কোন গাড়িতে চেপে ব্যবসার সুযোগ সুবিধা দেখতে দেখতে ফিরে আসবে হাওড়ায়।

সিগারেট ছোট হয়ে এসেছিল। টুকরাটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল কামরার ওই অংশটায়। জনা-আটেক লোক ঘুমোচ্ছে। রং-চটা টিনের সুটকেশ আর পোঁটলাপুঁটলি কিছু রাখা রয়েছে। অর্থাৎ মালদার খদ্দের

এখানে কেউ নেই। পিকু অবশ্য লক্ষ্য করল, একটা বড় আকারের ট্রাঙ্ক তার মাথার উপরকার বাঙ্কে রয়েছে। ওটা এদের মধ্যে কার কে জানে।

পিকু উঠে দাঁড়াল। এখন চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। ধান্দার সময়। মনটা আবার তেত হয়ে উঠল। এমন খালি গাড়িতে ভাল রোজগারের আশা করা যায় না। ওস্তাদ এ সমস্ত কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। ভারি ঝামেলায় পড়া গেছে! পিকু পা বাড়াবার আগেই একজন পাশের বাঙ্ক থেকে নামল।

—দেশলাই আছে?

পিকু দেশলাইটা পকেট থেকে বার করে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে লোকটা বলল, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ট্রাংকটা নিচে নামিয়ে রেখে ওপরে উঠে শুয়ে পড়ুন না।

—হ্যাঁ, মানে···কেউ আবার আপত্তি করলে···

—আপত্তি!

যাত্রী অবাক হয়ে গেল।

—আপনি নিজের জিনিস নামিয়ে রাখবেন তাতে আবার কার কি বলবার আছে।

একটু ইতস্তত করে পিকু বলল, তা তো বটেই। ইয়ে··আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

—মোরাদাবাদ। এখানে আমরা যে-কজন আছি সকলেই মোরাদাবাদ যাচ্ছি। আপনি—?

—কাছেই! বর্ধমান যাব।

যাত্রী বাথরুমের দিকে চলে গেল।

পিকু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। কেমন যেন বড় লাভের গন্ধ পাচ্ছে। এখানে যারা আছে, সকলেই মোরাদাবাদ যাচ্ছে। ট্রাংকটা ওদের কারুর নয়। তাহলে লোকটা ওই ভাবে কথা বলতো না। অন্য কারুর। সেই লোকটা গেল কোথায়? করিডর দিয়ে আর কোন কামরায় গিয়ে থাকতে পারে অবশ্য। এখন অপেক্ষা করে থাকাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। বর্ধমানের মধ্যে দাবীদার না এলে ট্রাঙ্কটা নামিয়ে নেবে।

পিকু আবার বসে পড়ল।

সেই যাত্রী বাথরুম থেকে ফিরে এসে বসল ওর সামনে।

মিনিট পনের গল্প-গুজোব হবার পর হাই তুলতে তুলতে সে নিজের বাঙ্কে গিয়ে উঠল। পিকু আর কি করে—সিগারেট ধরাল। আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে ওর মন। আর্ত চিৎকার তুলে তুলে এক্সপ্রেস ছোটখাটো স্টেশন অতিক্রম করে চলেছে। প্রথম থামবে বর্ধমানে। সেই বর্ধমান নিকটতর হচ্ছে ক্রমেই।

পিকু ঢুলতে আরম্ভ করল।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানে না। গাড়ি থেমে যেতেই ওর চটকা

ভাঙ্গল। আলোয় ভরা প্ল্যাটফর্ম। লোকজনের ছুটোছুটি। বর্ধমান এসে গেছে। পিকু উঠে দাঁড়িয়ে চারিধার তাকিয়ে নিল। না, ট্রাঙ্কের মালিক আসেনি। ধীর পায়ে গেটের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। হিসাবটা অবশ্য ঠিক মিলছে না। না মিলুক- ট্রাঙ্কটা নামিয়ে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এরকম দাঁও কালেভদ্রেই আসে!

এরপর কুলির সাহায্যে ট্রাঙ্কটাকে অন্য প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার হল না। অবশ্য জনতা না ছাড়া পর্যন্ত পিকু বেশ ভয়ে ভয়েই রইল। বাকি রাত কাটল ট্রাঙ্কের উপর বসেই। ফার্স্ট লোকালে পিকু ফিরে চলল কলকাতায়। আর তেমন ভয় করছে না। কি জিনিস পাওয়া যেতে পারে সেই জল্পনাতেই এখন সে ব্যস্ত। ট্রাঙ্কটার ভার দেখে মনে হয় মালপত্র ভালই আছে।

বাধ্য হয়েই হাওড়াতে ট্যাক্সি নিতে হল। রাজাবাজারের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার পরই পিকু দেখতে পেল মুন্না রাস্তার কলে স্নান করবার তোড়জোড় করছে। পিকু ওকে ডাকল গলা ছেড়ে।

—আরে শালা, এদিকে শোন্।

মুন্না এগিয়ে এল।

—খুব যে রং দেখাচ্ছিস বে? একেবারে ট্যাক্সিতে! সোনার খনি-টনি পকেটে ভরে নিয়ে এলি নাকি?

—ওস্তাদ কোথায়?

—ঘরেই আছে।

—একটা বাক্স আছে। হাত লাগা মাইরি।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল পিকু। কেরিয়ার থেকে ট্রাঙ্কটা বার করা হল। তারপর দুজনে ধরাধরি করে ওস্তাদের ঘরে নিয়ে গেল। ডোরা-কাটা লুঙ্গি আর হাত-কাটা গেঞ্জি পরা বিপুল-কলেবর ওস্তাদ খাটিয়ায় শুয়ে বিড়ি টানছিল। দুই সাগরেদকে একটা বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল।

পিকু বলল. জবর হাত মেরেছি ওস্তাদ। ট্রেন থেকে খসিয়ে এনেছি।

—সাবাস! আরে মুন্না হাঁ করে দেখছিস কি? দরজাটা বন্ধ কর। তারপর দেখ একটা বড় ফড় কিছু আছে কিনা!

খোঁজাখুঁজি করতেই বড় আকারের একটা স্ক্রু ড্রাইভার পাওয়া গেল। তাই দিয়ে বার কয়েক চাড় দেবার পরই ভেঙে পড়ল তালা। লোভ আর আনন্দ তখন তিনজোড়া চোখ থেকে ঝড়ে পড়ছে। মুন্নাই ডালাটা তুলে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শব্দ তুলে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। খুন হয়ে যাওয়া মানুষটা তখন বেশ ফুলে উঠেছে।

বহুদর্শী ওস্তাদ লহমার মধ্যে বুঝে ফেলেছে সমস্ত কিছু। কোন চতুর ব্যক্তি মড়াটা চালান করে দিচ্ছিল অন্যত্র। তার বোকা সাগরেদ অগ্রপশ্চাৎ

বিবেচনা না করেই মোটা লাভ হল ভেবে নিদারুণ বিপদ এখানে বয়ে নিয়ে এসেছে। গর্জনের মত একটা শব্দ তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপরই প্রচণ্ড এক থাপ্পড় গিয়ে পড়ল পিকুর গালের ওপর। আঁক করে একটা শব্দ তুলেই সে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল ঘরের এক কোণে।

—শালা—হারামি! কুত্তার বাচ্চা! ফাঁসির দড়ি একেবারে পকেটে ভরে নিয়ে এসেছে ?

—ওস্তাদ আমি···

—চুপ শালা!

ওস্তাদ এগিয়ে গিয়ে কলার ধরে পিকুকে দাঁড় করাল। আবার কয়েকটা চড় পড়ল তার মুখের ওপর। বেচারা হাউ হাউ করে কেঁদেই উঠল। নাক আর ঠোঁট বেয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে।

মিনতি ভরা গলায় মুন্না বলল, ওকে এখন ছেড়ে দাও ওস্তাদ। মড়াটার এখন কি করবে তাই ভাব।

এখন তো কিছু করা যাবে না। নিমচাঁদকে খবর দে। নিজেরই ট্যাক্সিটা নিয়ে সাড়ে এগারটার পর এখানে যেন চলে আসে।

ওস্তাদ আবার ফিরে দাঁড়াল পিকুর দিকে।

—লাতখোর হারামি এই তো কাজের ছিরি, আবার বড়াই করা হয়, ওস্তাদের আমি প্রধান সাগরেদ। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিতে হয়···

প্রচণ্ড লাথি পড়ল পিকুর পিঠের ওপর।

মুন্না কাঁপা গলায় বলল, আর মের না ওস্তাদ। মরে যাবে।

—মরুক শুয়োরের বাচ্চা!

ওস্তাদ অবশ্য আর কিছু করল না। নিজের বিশাল দেহটা এলিয়ে দিল খাটিয়ার ওপর। মুন্না তাড়াতাড়ি বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দিল। পিকু একটানা কাতরে চলেছে।

সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে পরাশর দত্ত ঘটনাস্থলে পেঁছিলেন। সেখানে তখন জনসমুদ্র। উত্তেজনা তো আছেই—গুজবেও চারধার ছয়লাপ। চাপ বাঁধা ভিড়ের মধ্যে রাস্তা করে ঠিক জায়গায় পেঁছানো ইন্সপেক্টর দত্তর পক্ষে কখনই সম্ভব হত না। কয়েকজন কনস্টেবল প্রাণান্তকর ঠেলাঠেলি করে তাঁকে পেঁছে দিল। কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। কালো রং-এর ট্রাঙ্কটার ডালা তখনও নামান।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে ভোরেই।

এমন কিছু বায়ুসেবি আছেন যাঁরা নিয়মিত দেশবন্ধু পার্কে ভোরবেলায় আসেন। এঁরা বয়স্ক, কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। পার্কে কয়েক চক্কর দেবার পর এঁরা এখানে ওখানে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলেন। তারপর রোদ্দুর একটু চড়লে যে যাঁর বাড়ি ফিরে যান। আজও এই অলিখিত নিয়ম

ছক-কাটা পথ ধরে এগোতে আরম্ভ করেছিল।

রামলোচন সমাদ্দারের চোখেই প্রথমে ট্রাঙ্কটা ধরা পড়ল। তিনি দু-চক্কর দেবার পর একটা বেঞ্চে এসে বসলেন। সিগারেটের বাক্সটা বার করলেন পকেট থেকে। প্রতিদিন এই রকমই করেন। একটা সিগারেট ছাই করে দেবার পর আবার পরিক্রমা আরম্ভ করেন। সিগারেট ধরাতে যাবার আগেই দৃষ্টি এক জায়গায় আটকে গেল।

—এত মন দিয়ে কি দেখছ সমাদ্দার ?

রামলোচন চমকে উঠলেন। অরবিন্দ শিকদার এসে দাঁড়িয়েছেন।

—ওই কালো মত ওটা কি বলতো ? যতদূর মনে হচ্ছে, বাক্স !

--কোথায় ?

—ওই তো, পুকুরের রেলিং-এর পাশটায়।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড় গোছের ট্রাঙ্ক বলেই মনে হচ্ছে ! ব্যাপার কি হে ? তাড়াহুড়োয় চোরের দল ফেলে যায়নি তো।

—মন্দ বলনি। চল তো গিয়ে দেখি।

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন।

ট্রাঙ্কটা নতুন নয়। বেশ পুরনো। তালা লাগাবার জায়গাটা ভাঙ্গা। ব্যাপারটা আরো সন্দেহজনক। চোরেদের কাণ্ড না হয়ে যায় না। তিনি ভালই জানেন, এ সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি বাধা দেবার আগেই অরবিন্দ শিকদার ট্রাঙ্কের ডালাটা তুলে ফেলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গলা চিরে বেরিয়ে এসেছে চিৎকারের মত কিছু একটা। দুজনে পিছিয়ে এসেছেন সভয়ে। ডালা ঝনৎকার শব্দ তুলে নেমে এসেছে আগের জায়গায়।

—আমি যেন দেখলাম—কথাটা শেষ করতে পারলেন না শিকদার।

—ছোরা বেঁধান একটা মড়া ! লোকটাকে খুন করে বদমাসরা এখানে ফেলে গেছে !

একে একে আরো অনেকে জুটলেন। এই সমস্ত সংবাদের গতি হাওয়ার চেয়ে বেশি। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেল। ক্রমেই বাড়তে লাগল ভিড়। অবশ্য কেউই আর ডালা তুলে মড়াটা দেখার চেষ্টা করেনি। উপস্থিত লোকেদের মধ্যেই কে একজন ফোন করে দিল পুলিশকে। পরাশর দত্ত এনকোয়ারিতে বেরিয়েছিলেন, দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

দত্ত থানায় ফিরেই সংবাদটা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসেছেন। ততক্ষণে প্রাথমিক যা কিছু করার সমস্ত শেষ হয়েছিল। এবার মৃতদেহ সনাক্তকরণের কাজ আরম্ভ হল। অনেকেই মৃতব্যক্তিকে দেখলেন, কিন্তু কেউই বলতে পারলেন না এই লোকটি তাঁদের পরিচিত বা মুখ-চেনা অথবা কোথাও দেখেছেন।

বেলা দশটার সময় মৃতদেহ থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পরাশর দত্ত অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারি। অনেক দেখেছেন, অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। তিনি একরকম স্থিরনিশ্চিত হলেন, মৃতব্যক্তি স্থানীয় কেউ নয়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে কাজটার মধ্যে একটা পেশাদারি ভাব রয়েছে। এটা একটা স্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড—অন্য কোথাও সাধিত হয়েছে, তারপর মৃতদেহ ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে এখানে। তাছাড়া যেভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, পচন আরম্ভ হয়েছে, তাতে মনে হয় মূল ঘটনাটি দিন দুয়েকের পুরনো।

ইন্সপেক্টর থানায় আসার পর মৃতদেহ ট্রাঙ্ক থেকে বার করা হল। কোট এবং ট্রাউজারের পকেট তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। রুমাল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পরিচয় রয়ে গেল অন্ধকারেই। ছোরাটা তখনও বেঁধানই ছিল। ওটা খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করলেন পরাশর। চওড়া ব্লেডের ভারি ছোরা। বাঁটের উপরকার কারুকার্য দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে মোরাদাবাদের তৈরি।

সহকারি বলল, সাজ-পোশাক তো বেশ দামি। ভিকটিম হা ঘরের লোক ছিল না বুঝতে পারা যায়। ওই পর্যন্তই। পরিচয় বার করবার তো কোন সূত্রই হাতে এল না।

পরাশর বললেন, আমাদের সেই সাবেকি কায়দায় এগোতে হবে। কোট এবং ট্রাউজারে নিশ্চয় ধোপার মার্কা আছে। সেই ধোপাকে খুঁজে বার করা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। এর পরই ভিকটিমের পরিচয় আমরা জানতে পারব। তুমি আর দেরি কর না, কাজে লেগে পড়। আমি বডি পোস্টমর্টেম করার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

পুরো একটা দিন সময় লেগে গেল।

পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই। পরের দিন জানা গেল, মৃতব্যক্তির পরণের স্যুট চৌরঙ্গির অভিজাত ড্রাই ক্লিনার 'চেন হুয়া'তে কাচানো হয়েছিল। পরাশর দত্ত ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ছিমছাম পরিবেশ। পুলিশ দেখে কিছুটা ঘাবড়ালেও মুখে হাসি টেনে লণ্ড্রীর প্রৌঢ় মালিক এগিয়ে এলেন। সময় নষ্ট না করে কাজের কথা পাড়লেন পরাশর।

চৈনিক মুখে ব্যস্ততার ভাব ফুটল। খাতা-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলেন ভদ্রলোক। জানা গেল, স্যুটের মালিক এখানকার পুরনো খদ্দের। ধনী লোক। এখনও গোটা দুয়েক স্যুট রেডি হয়ে রয়েছে তাঁর। ভদ্রলোকের নাম মিঃ গুপ্ত। দোকান মালিকের যতদূর ধারণা উনি ব্যারিস্টার। ঠিকানাও পাওয়া গেল। পরাশর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে রওয়ানা হলেন ব্যারিস্টারের ঠিকানায়।

গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাটের সামনে তখন অন্যরকম দৃশ্য।

ফুটবলের মত চেহারার এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একধারে দাঁড়িয়ে মিঃ সেন সিগারেট টানছেন। কপালের কুঞ্চন দেখে মনে হয় তিনি কিছুটা চিন্তিত। ওখানে আরো একজন রয়েছেন।

বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই। গুপ্তসাহেবের ক্লার্ক তাপস কর। তার মুখেও চিন্তার ছায়া।

মাড়োয়ারি বললেন, কি ঝামেলায় পড়লাম বলুন তো ? কাল সকালে এলাম, গুপ্তসাহেব নেই। সন্ধ্যায় এলাম, নেই। অথচ আজ আমার কেস।

সেন বললেন, না বলে-কয়ে কোথায় চলে গেল ভগবান জানেন। এক কাজ করুন, অন্য কাউকে দিয়ে আজ কাজ চালিয়ে নিন।

—তাই বা কি করে হবে। কাগজপত্র সব ওঁর কাছে। আপনাকে দিয়েই তো করিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু কেস শুরু করতে গেলে পেপার তো চাই।

—তা বটে। ডেট নিন, উপায় যখন নেই। ইয়ে—তাপস, তোমাকে এমন কিছু বলেনি যাতে মনে হয় কোথায় যেতে পারে ?

তাপস বলল, না স্যার। পরশু সন্ধ্যার মুখে আমার সঙ্গে শেষ দেখা। তখন তেমন তো কিছু বলেননি।

ঠিক এই সময় পরাশর দত্ত দেখা দিলেন। সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি। পরিবেশ নাটকীয় হয়ে উঠল। উপস্থিত তিনজন স্বাভাবিক কারণেই পুলিশের আগমনে সচকিত হলেন। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক কিছুটা ভীতই হলেন বলা চলে। পরাশর দত্ত তিনজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নেমপ্লেটটা এক নজর দেখে নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন তারপর, আপনারা এখানে কি করছেন ?

সেন বললেন, এই ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন তাঁর খোঁজে এসেছিলাম। এঁরা বলছেন, দুদিন থেকে তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—হুঁ। আপনাদের পরিচয়টা জানতে পারি কি ?

—নিশ্চয়। আমি সুব্রত সেন। গুপ্তর কোলিগ, অর্থাৎ হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করি। ইনি হরিরাম কেডিয়া—কেস-এর সুবাদে এখানে এসেছেন। আর এ হল তাপস কর। গুপ্তর ক্লার্ক। আচ্ছা, কি ব্যাপার বলুন তো ইন্সপেক্টর, আপনারা সদলবলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন !

গাম্ভীর্য বজায় রেখে পরাশর বললেন, আসতেই হল। আপনারা একটা খারাপ খবর শোনার জন্য তৈরি হোন। গুপ্ত মারা গেছেন।

সেন দু পা পেছিয়ে গেলেন।

কেডিয়া আর তাপসের অবস্থাও ভাল নয়।

—মারা গেছেন ! মানে···তাপস কথাটা শেষ করতে পারল না।

- খুন হয়েছেন।

ককিয়ে উঠলেন কেডিয়া।

—হায় হনুমানজি, একি শুনছি ! গুপ্তসাহেব খুন হলেন। আহাহা। আমি এবার যাই। খুন-খারাপির কথা শুনলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।

দাঁড়ান শেঠজি। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনারা তিনজন সাক্ষী।

—আমার কোর্টে কেস আছে ইন্সপেক্টরবাবু ! আমায় ছেড়ে দিন।

—কিছুক্ষণ পরে নিশ্চয় ছেড়ে দেব।

পরাশর দত্ত দরজায় লাগান তালাটা পরীক্ষা করলেন এবার। প্যাডলক, অন্য কোন চাবি দিয়ে খোলা যাবে না। ভেঙে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। সেইরকমই নির্দেশ দিলেন সহকারিদের। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দরজার কড়া খুলে এল। সকলে ঢুকলেন ভেতরে। অফিসরুম। এই ঘর যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ ব্যবহার করেন, এক নজরেই বুঝতে পারা যায়।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর অনেক কিছুর সঙ্গে সুদৃশ্য স্ট্যাণ্ডে আটকান একটা ফটো ছিল। বেপরোয়া ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা একজনের বুক পর্যন্ত তোলা ছবি। স্ট্যাণ্ডটা হাতে তুলে নিলেন পরাশর। ভাল করে দেখলেন। যদিও তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ফোটোগ্রাফখানা ভিকটিমের। তবু এগিয়ে ধরলেন মিঃ সেনের দিকে।

দেখুন তো ছবিখানা কার ?

— গুপ্তর।

এখানকার কাজ হয়ে গেলে আপনাদের আরো একটু কষ্ট দেব। মর্গে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করতে হবে। এটা একটা নিয়মমাফিক কাজ আর কি।

সকলে এবার পাশের ঘরে এলেন।

বিপরীত দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হল। সাজানো ঘরের মধ্যে যেন খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। তোসক গোটানো অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে আছে। গদি খাট থেকে ঝুলছে। আলমারির পাল্লা খোলা। জামা-কাপড় ছড়িয়ে পড়েছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা টয়লেট গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। দুটো জিন-এর বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক কথায় লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

পরাশর বললেন, আপনারা কোন কিছুতে হাত দেবেন না। হত্যাকারীর হাতের ছাপ পাওয়া যেতে পারে। বিনয়, আজই ঘরখানা ডাস্ট করাবে।

— আচ্ছা, স্যার।

এরপরে আরো একখানা ঘর আছে। তার অবস্থা অবশ্য তেমন শোচনীয় নয়। কেউ কিছু খোঁজাখুঁজি করেছে সেটা শুধু বুঝতে পারা যায়। এবার কিচেনটা দেখে নেবার পর সকলে বাথরুমে এলেন। আধুনিক কেতায় সাজানো বাথরুম। ওধারে আরো একটা দরজা রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে পরাশর লক্ষ্য করলেন ছিটকিনি লাগান নেই। অর্থাৎ দরজা খোলা।

টান দিতেই পাল্লা খুলে গেল। ওধারে লোহার সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। প্রয়োজন বোধে মেথর যাওয়া-আসা করতে পারে এই পথে—তাই বোঝা গেল। বিচিত্র ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে। ফ্ল্যাটের সামনের দরজায় তালা ঝুলছে অথচ পিছনের দরজা খোলা। ক্রমেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।

সকলকে নিয়ে পরাশর দত্ত আবার অফিসরুমে ফিরে এলেন।

কেডিয়া বললেন, আমাকে এবার ছেড়ে দিন ইন্সপেক্টর সাব। কোর্টে গিয়ে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। ঠিকানা ক্লার্কবাবুর কাছে আছে। যখন ডাকবেন, উপস্থিত হব।

—বেশ যান।

পরাশর দত্ত এবার তাপসের দিকে মুখ ফেরালেন।

—আপনার বস চাকরবাকর রাখতেন না?

বিমর্ষ ভঙ্গিতে তাপস বলল, ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য ঠিকে চাকর একটা আছে। ভোরে এসে কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। আসল কথা, উনি বোহিমিয়ান লাইফ লিড করতেন। আর দশজনের মত গুছিয়ে সংসার করার দিকে ওঁর দৃষ্টি ছিল না।

—ওঁর আত্মীয়-স্বজনদের সন্ধান দিতে পারেন?

—আমি যতদূর জানি, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া তাঁরা কেউ কলকাতায় থাকেন না।

—আচ্ছা, ওঁর গাড়ি আছে?

—আছে। মার্ক টু!

একজন পুলিশ কর্মচারি এবার বলে উঠল, ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে একটা চকোলেট রংয়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটা কি?

—হ্যাঁ।

পরাশর বললেন, বিনয়, তুমি গিয়ে গাড়িটা ভাল করে দেখে নাও। অবাঞ্ছিত হাতের ছাপটাপও পাওয়া যেতে পারে। সতর্কভাবে পরীক্ষা করবে।

তিনি এবার সেনের দিকে তাকালেন।

—আপনার সঙ্গে মিস্টার গুপ্তর শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

—শনিবার সারা সন্ধ্যাটা আমরা একরকম একই সঙ্গে ছিলাম। ন'টা আন্দাজ সময় আমি আর অশোকবাবু গুপ্তর গাড়িতেই ক্লাব থেকে বেরিয়ে ছিলাম।

—অশোকবাবু কে?

—স্টিবেডর ভবানী সান্যালের ভাইপো।

—কোন্ ক্লাব থেকে আপনারা বেরিয়েছিলেন?

মিঃ সেন সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ফর্টি থিন্ ক্লাব। অভিজাত মিলন কেন্দ্র।

—তারপর কি হল?

—জহরলাল নেহেরু রোডে অশোকবাবু নেমে গেলেন। গুপ্ত পেঁছে দিল আমাকে বাড়িতে। এরপর আর তার সম্পর্কে কিছু জানি না।

—আপনি যখন গাড়ি থেকে নামলেন, তখন উনি কি কিছু বলেছিলেন?

—সেন একটু ভেবে বললেন, আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম, বাসায় ফিরছ তো?' উত্তর দিয়েছিল, একজনের আসার কথা আছে। দশটার মধ্যে ফিরতেই হবে, তবে তার আগে চৌরঙ্গিতে একটা কাজ সেরে আসব।'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না পরাশর দত্ত। দুজনের ঠিকানা লিখে নিয়ে, ফ্ল্যাট সীল করে নিচে নেমে এলেন। পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত কিছু দেখার ব্যবস্থা হবে। নিচে নেমে এসে দেখলেন গুপ্তসাহেবের মার্ক টু র সামনে তাঁর সহকারিরা অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—কি হল ?

গাড়ি লক করা রয়েছে স্যার। গেট খোলবার ব্যবস্থা না করলে··

—হুঁ। দুজন কনস্টেবল পাহারায় থাক। থানায় ফিরেই একজন মিস্ত্রীর ব্যবস্থা দেখ। সে এসে গেট খুলুক। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসুক থানায়, আমি এখন এক জায়গায় যাচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরব।

মার্ক টু'র ভেতর বাইরে ডাস্ট করিয়েও কিছু পাওয়া গেল না। এমনকি কারওনার গুপ্তসাহেবের হাতের ছাপও নয়! এতে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত গাড়িটা মুছেছে, যাতে তার হাতের ছাপ কেউ আবিষ্কার করতে না পারে। অতি সতর্ক ব্যক্তি। তবে কি এই ব্যক্তিই হত্যাকারী? পরাশর দত্ত দ্বিধা আর চিন্তার মাঝে দুলছেন। হেঁজিপেঁজি কেউ নয়, খুন হয়েছেন হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। এক্ষেত্রে নিজেই তদন্ত চালিয়ে যাবেন, না ভাল মানুষের মত কেসটা লালবাজারে চালান করে দেবেন ?

এই রকম যখন মনের ভার, ঠিক সেই সময় কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া গেল। মৃতদেহবাহী সেই ট্রাঙ্ক থেকে কয়েকটা হাতের ছাপ তোলা হয়েছিল। সেই সমস্ত ছাপ হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়েছিল রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য। হাজার হাজার দাগী আসামীর হাতের ছাপ সেখানে সযত্নে রাখা আছে। যদি কারুর সঙ্গে মিল হয়, তবে কাজের কিছুটা সুবিধা হবে।

ভাগ্যক্রমে দুটো ছাপের মিল পাওয়া গেল। দুই ছিঁচকে অপরাধী - পিকু আর মুন্না। এরা কয়েকবার অল্প মেয়াদে জেল খেটেছে। তবে রেকর্ডে কোথাও লেখা নেই. তারা আজ পর্যন্ত খুন-জখমের ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়েছে। কিন্তু ট্রাঙ্কের ওপর যখন হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, তখন চুপচাপ বসে থাকা যায় না। খোঁজ-খবর নিতেই হয়।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই দুজনকে থানায় হাজির করা হল। সন্ধ্যা হওয়ার মুখ থেকে ওদের কাজ-কারবার। দূর-পাল্লার ট্রেনে ডিউটি মারে। নিজেদের ডেরায় শুয়ে রাতের ক্লান্তি দূর করছিল, পুলিশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। অপরাধটা কি বুঝতে না পারলেও দুজনে ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভেঙে পড়ল পরাশর দত্তর পায়ের ওপর।

দত্ত বললেন, ন্যাকামি থামাও! তোমরা এবার বেশ বিপদে পড়েছ। সত্যি কথা না বললে ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই পাবে না।

—ফাঁসি! পিকু কঁকিয়ে উঠল।—আমরা বড়বাবু পকেট মারি। ছোটখাট মাল কায়দায় পেলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাই। ফাঁসির কথা বলছেন কেন—?

—খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে রয়েছ তোমরা দুজনে। প্রমাণ আমার হাতেই আছে। নির্মল, ট্রাঙ্কটা এ-ঘরে আনাবার ব্যবস্থা কর।

ট্রাঙ্ক এল।

—এটাকে চেন?

পিকু আর মুন্নার মুখ শুকিয়ে উঠল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওরা চিনতে পেরেছে, এই সেই অভিশপ্ত ট্রাঙ্ক। পার্কে যখন ফেলে আসা হয়েছিল, পুলিশ এটা নিয়ে যাবে এ তো জানা কথা। তবে এত তাড়াতাড়ি ওদের সন্ধান কি ভাবে পেল, সে রহস্যের সমাধান কিছুতেই করতে পারছিল না দুজনে।

—চুপ করে থেক না। বল, এই ট্রাঙ্কটা আগে কখন দেখেছ?

পিকু বলল, না, বড়বাবু।

—তুমি?

মুন্না বলল, এই প্রথম দেখছি।

গর্জে উঠলেন পরাশর দত্ত।

—শুয়োরের বাচ্চারা যুধিষ্ঠিরের চেলা। রামধোলাই খাবে তারপর ফাঁসি কাঠ তো আছেই।

ওরা দুজন তোতলাতে লাগল। অসংলগ্নভাবে মিথ্যার জাল বুনে চলল।

—থাম! তোমাদের ভালর জন্যই বলছি, আমি জানি তোমরা খুনটুনের ব্যাপারে থাক না। এই ট্রাঙ্কটার মধ্যে একটা মড়া ছিল। ডালার ওপর পাওয়া গেছে তোমাদের হাতের ছাপ। কোন কারণে তোমরা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলে বলে আমার বিশ্বাস। সমস্ত কথা খুলে বললে বাঁচার আশা এখনও আছে। নইলে আমি বাধ্য হয়েই…

—বিশ্বাস করুন বড়বাবু, খুন আমরা করিনি।

পিকুকে এক ঝলক দেখে নিলেন দত্ত।

—কি করেছ তবে?

—মানে · হাওড়া স্টেশনে ··

—হাওড়া স্টেশন! পরিষ্কার করে বল। নাও, সিগারেট ধরাও। লজ্জার কিছু নেই। তুমিও একটা ধরাও। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও তো দেখি। তারপর খুলে বল সব কথা।

পিকু আর মুন্না সিগারেট ধরাল।

আজেবাজে বলে পাশ কাটাতে গেলে যে বড় বেশি ঝুঁকি নিতে হবে, একথা দুজনে ভালই বুঝেছিল। তার চেয়ে যা ঘটেছে পরিষ্কার বলে দেওয়াই ভাল। তাতে বরং অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। পিকু আর দ্বিধা না করে একে একে সমস্ত কথা বলে গেল। পরাশর দত্ত বুঝলেন, এবার তাঁর গন্তব্যস্থল হল হাওড়া স্টেশন।

পিকু আর মুন্নাকে আপাততঃ লকআপে পাঠান হল।

দত্ত হাওড়ায় পৌঁছালেন বেলা পড়ে আসার পর। ট্রাঙ্কটাও জিপে চাপিয়ে

নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্টেশন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে কথাবার্তা হল। কিভাবে তদন্তর বৃত্ত ছোট করে আনা হবে আগেই স্থির করা ছিল। আহ্বান করা হল সেই সমস্ত কুলিদের যারা সেদিন সন্ধ্যার সময় মাল বওয়ার কাজ করেছিল।

সে এক এলাহি ব্যাপার। কুলিদের সংখ্যা দেখে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় পরাশর দত্তের। তবে তিনি বহুদর্শী অফিসার। ধৈর্যকে তিনি মুঠোর মধ্যে আটকে এগিয়ে যেতে অভ্যস্থ। ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃত্ত আরো ছোট করে আনা হল। তখন সেই সমস্ত কুলিরা রইল যারা সেদিন জনতা এক্সপ্রেসে যাত্রীদের মাল তুলে দিয়েছে।

তাদের একে একে ট্রাঙ্কটা দেখান হল।

বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে দুজন ট্রাঙ্কটা দেখেই চিনতে পারল। একজন ট্রাঙ্কটাকে মোটরের কেরিয়ার থেকে বার করে প্লাটফর্মে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়-জন ওটাকে চাপিয়েছিল ট্রেনে। দত্ত দুজনকে আলাদা নিয়ে গিয়ে, প্রশ্নের পর যা জানতে পারলেন, তার সার কথা হল—এক জোড়া তরুণ-তরুণী ট্রাঙ্কটা মোটরে চাপিয়ে স্টেশনে নিয়ে এসেছিল। এবং গাড়িটার রং গাঢ় লাল।

এবার গাড়ি থেকে যে ট্রাঙ্ক নামিয়েছিল সেই কুলিটিকে স্টেশনের সেই অঞ্চলে আনা হল যেখানে মোটর পার্ক করা হয়। নানা মডেলের বহু মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সেই ধরনের কোন মোটর এখানে আছে কিনা—থাকলে কোনটা? একে একে মোটরগুলো খুঁটিয়ে দেখল কুলিটা। তারপর একটা ফিয়েটের সামনে দাঁড়িয়ে জানাল, ঠিক এই রকম দেখতে। শুধু রংটা গাঢ় লাল।

সিগারের বাক্সটা সামনেই রাখা ছিল।

ধীরে সুস্থে একটা সিগার বাছলেন ভবানীশঙ্কর। তুলে নিয়ে নাকের কাছে এনে শুঁকলেন। তারপর তাকালেন বিরূপাক্ষ দস্তিদারের দিকে। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অপর প্রান্তে তিনি বসেছিলেন। তাঁকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কুশল প্রশ্ন বিনিময় ছাড়া আর কোন কথা হয়নি দুজনের মধ্যে। অথচ বিরূপাক্ষ এসেছেন মিনিট ছয়-সাত হয়ে গেল।

ডানহিল লাইটার দিয়ে সিগার ধরালেন ভবানীশঙ্কর।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আজ আপনাকে কিছুটা বিমনা দেখাচ্ছে। কি হল? শরীরের দিক থেকে··

—ভালই আছি। আজকের কাগজ পড়েছেন?

—পড়েছি। আপনি বোধহয় গুপ্তর কথা বলতে চাইছেন? লোকটা খুন হয়ে আমার কিছু খরচ বাঁচিয়ে দিল। বুঝলেন মিস্টার দস্তিদার, ভগবান আছেন। অকারণে কারুর সংসারে আগুন জ্বাললে রেহাই পাওয়া শক্ত।

—বলেছেন ঠিকই। তবে···

—কি হল আবার ? গুপ্ত খুন হওয়ায় আপনি কি খুশি হননি ?

দস্তিদার বললেন, খুশি না হবার কিছু নেই। তার মত লোকের উচিত মৃত্যুই হয়েছে ; তবে কি জানেন, দীর্ঘদিন ধরে কোর্টে সে আমায় বেকায়দায় ফেলে আসছিল। এতদিন পরে আমি একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। একবার তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলে আর দেখতে হত না। সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না।

—আফশোষ করে আর কি করবেন। যা হবার তাই হয়েছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি, তাই বলি।

দস্তিদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমি উইল করতে চাই।

—উইল! তার কি কোন দরকার আছে মিস্টার সান্যাল ? আমি যতদূর জানি, আপনার স্ত্রী আর মেয়ে সমান অংশে সমস্ত কিছু পান—এই রকম একটা ব্যবস্থা আপনি করে রেখেছেন।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই জানেন। তবে অবস্থা বিপাকে ওই ব্যবস্থার একটু রদবদল করতে হচ্ছে। আপনি জানেন কিনা জানিনা, আমার মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা থার্ড ক্লাস ইডিয়টকে সিনেমার কায়দায় বিয়ে করেছে। ব্যাপারটা আমার মত লোকের পক্ষে পরিপাক করা শক্ত। কাজেই···

— আপনি মেয়েকে বঞ্চিত করতে চান, এই তো ? তবে···

—বলুন ?

· আমি আবার আপনাকে বিষয়টি ভাল ভাবে দেখতে অনুরোধ জানাব মিস্টার সান্যাল। হাজার হলেও সে আপনার একটি মাত্র সন্তান। বয়স অল্প —ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছে। এখন আপনি যদি তাকে ক্ষমা না করেন, কে করবে ?

ভারি গলায় ভবানীশঙ্কর বললেন এতদিন দেখেও আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি! আমার শাস্ত্রে ক্ষমা বলে কিছু নেই। অবাধ্যতার শাস্তি পেতেই হবে।

দ্রুত গলায় দস্তিদার বললেন, ঠিক আছে। এ সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই। আপনি এবার বলুন, খসড়া কিরকম হবে।

ভবানীশঙ্কর কিছু বলার আগেই প্রমীলা ঘরে প্রবেশ করলেন।

গুপ্তসাহেবের মৃত্যুর পর তাঁকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। বরং কিছুটা তাজাই দেখাচ্ছে। এই সাত-সকালে তিনি এমন পরিপাটি ভাবে সেজেছেন যে, উঠতি ছোকরাদেরও মাথা ঘুরে যাবে। স্ত্রীর দিকে তাকালেন ভবানীশঙ্কর। অনেকবার ভাবা সেই কথাটা নতুন করে মনে পড়ল তাঁর। নিজের বয়স বিশ বছর পেছিয়ে দেবার কৌশল কি চমৎকার ভাবেই না আয়ত্ব করেছে এই মহিলা।

—আমি এখন উঠি। আপনি···

—আমি সন্ধ্যার সময় আপনার চেম্বারে আসছি। তখন বিশদভাবে কথা হবে। আপনি অন্য কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখবেন না।

—বেশ।

দস্তিদার বিদায় নিলেন।

প্রমীলা সামনের সোফাটায় বসলেন।

উপেক্ষার সুরে বললেন, এই লোকটা এখানে কেন আসে ?

ভ্রূ-কুঞ্চকে ভবানীশঙ্কর বললেন, কেন আসে মানে ?

—শহরে কি আর উকিল নেই ? একটা থার্ডক্লাস হর্সকে ব্যাক করে লাভ কি ?

—সেটা আমি বুঝব। দস্তিদারের ওপর আমার আস্থা আছে। ও কথা থাক। আজকের কাগজ পড়েছ ? তোমার গুপ্তসাহেব ··

—খুন হয়েছেন। জানি তো। কাজটা যদি তুমি কাউকে দিয়ে করিয়ে থাক অবাক হব না। টাকা থাকলে সবরকম নোংরামি করা যায়।

—যায় নাকি ? বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল ভবানীশঙ্করের মুখে : তবু তোমার জেনে রাখা ভাল, ওই শুয়োরের বাচ্চাকে আমি মারিনি, তোমার মত আর কজন পরের বৌকে সে খেলাচ্ছিল ভগবান জানেন। তাদের মধ্যেই কেউ —একদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা ভালই হয়েছে। আমার মান-সম্মানটা অন্ততঃ রক্ষা পেল।

একটু থামলেন তিনি।

বললেন আবার, এত সেজেগুজে কোথায় চলেছ জানতে পারি কি ?

বিদ্রুপের হাসি হাসবার পালা এবার প্রমীলার।

—তোমার মান-সম্মান নতুন করে জলাঞ্জলি দিতে চলেছি।

—তার মানে !

এত বড় ব্যবসাদার—কত কিছু বুঝতে হয়, আর এই সামান্য কথাটুকু বুঝতে পারছ না। তুমি কি ভেবেছিলে, গুপ্তসাহেবের মৃত্যুতে আমি শোকে ভেঙে পড়ব ? সঙ্গী হিসাবে লোকটা চমৎকার ছিল। তোমার মত আনস্মার্ট নয়। দারুণ রোমাণ্টিক—ভাল লাগত তাই। ওই পর্যন্ত, আর কিছু নয়। সে নেই বলে যে রোমাণ্টিক লোকের অভাব হবে, একথা তোমায় কে বলেছে ?

—প্রমীলা···

—প্লীজ, চোখ রাঙিও না ! আমার ভারি হাসি পায়। যে নিজের ঘড়ির বারটা বাজিয়ে রেখেছে, সে পরের ঘড়ির সমালোচনা করতে যায় কোন্ সাহসে ?

প্রমীলা উঠলেন। এগোলেন দরজার দিকে।

—শোন···

থামলেন প্রমীলা।

—তোমাকে কিছু কথা আমি আজ স্পষ্টভাবে বলতে চাই। আমার কালো টাকার সন্ধান লালবাজারকে দেবে বলে যে হুমকি দেখিয়েছিলে, তার দাম এখন

এক কানাকড়িও নয়। কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। টাকা সরিয়ে নিচ্ছি।

—আর কিছু বলবে?

ভবানীশঙ্করের মুখে হিংস্রভাব ফুটে উঠল।

—হ্যাঁ। এখনও কিছু বাকি আছে। তোমার কাছে অবশ্য শ্রুতিমধুর হবে না, তবু বলতেই হচ্ছে। আমি উইল করছি। ইরা বাদ পড়ছে। আমি মারা যাবার পর তুমিও কিছু পাবে না। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত দান করছি কোন প্রতিষ্ঠানকে।

প্রমীলা বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

দরজার কাছ থেকে পেছিয়ে এসে, সোফায় বসতে বসতে বললেন তোমার পাঁঠা, কোন্ দিকে কোপ মারবে তা নিয়ে অন্যের তো মাথা ব্যথা হবার কথা নয়। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি, উইল থেকে বাদ পড়লেও আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ভবিষ্যতের রাজকীয় ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—রাজকীয় ব্যবস্থা! তার মানে…

প্রমীলার মুখে হাসি দেখা গেল।

বললেন তরল সুরে তারপর, তোমার কালোটাকার পাহাড় থেকে পাঁচলাখ নুড়ি আমি খসিয়ে নিয়েছি।

—তার মানে?

লাইব্রেরি ঘরের বইয়ের তাকের পিছনের গুপ্ত সিন্দুক থেকে টাকাটা বার করে নিতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। পাঁচলাখে বাকি জীবনটা ভাল ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারব, কি বল?

ভবানীশঙ্কর সোজা হয়ে বসলেন।

বললেন তীক্ষ্ন গলায়, নকল চাবি তৈরি করিয়ে তুমি টাকাটা বার করে নিয়েছ?

—বুঝতে পেরেছ তাহলে। একদিন রাত্রে তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর চাবির গোছা বালিশের তলা থেকে বার করে এনে মোমের ছাপ তুলে নিয়েছিলাম। তারপর…

—থাম! কাজটা তুমি ভাল করনি। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে ভুলে যেও না। শেষবার বলছি, টাকাটা ফিরিয়ে দাও। নইলে…

—আজেবাজে কথা বলে আমার মাথা গরম করে দিও না। টাকা তুমি পাবে না। কোথায় লুকানো আছে তাও বলব না। তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।

অশোক ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরের হাওয়া যে অত্যন্ত উত্তপ্ত, বুঝে নিতে তার অসুবিধা হল না। ভবানী-শঙ্করের দৃঢ় মুখ আরো দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তিনি বিড়বিড় করে কি সমস্ত বলছেন। প্রমীলার মুখের ভাব ঠিক বিপরীত। বিদ্রুপের হাসিতে ঠোঁট বঙ্কিম হয়ে উঠেছে।

—কাকিমা, মামা এসেছেন।

—প্রবীর! ভবানীশঙ্কর বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম প্রমীলা, প্রবীর এ বাড়িতে আসুক আমি পছন্দ করি না।

—বলেছিলে ঠিকই। তবে তোমার বে-আক্কেলে কথাটা আমি দাদাকে বলতে পারিনি। আমি যতদিন এ বাড়িতে আছি, সে আসবে। যতবার ইচ্ছে আসবে।

—প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—অশোক···

—বলুন?

—তোমার কাকিমার মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে। ওর কাণ্ড-কারখানায় আমি তো ফেড-আপ। দ্বিতীয়বার বিয়ে করাটা যে কত বড় পাপ, এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি। শোন অশোক, মাসখানেকের মধ্যেই এ বাড়ি আমি ছেড়ে দেব। ছেড়ে দেব মানে, কোন ভাল কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে দেব বাড়িখানা।

মহা-আশ্চর্য হয়ে অশোক বলল, কি বলছেন কাকা? এত টাকা খরচ করে বাড়িটা তৈরি করালেন। হঠাৎ এইভাবে···

—হ্যাঁ। হঠাৎই আমি স্থির করেছি। তবে এর নড়চড় হবে না। আমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবার সুযোগ আমি আর কাউকে দেব না। 'টাইগার রো' হোটেলে আমি উঠে যাব। একলা মানুষ—কোন অসুবিধা হবে না। তুমি অফিস বিল্ডিং-এ স্বচ্ছন্দে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

—কাকিমা? তাঁর···

—তাঁর কথা আমি বলতে পারি না। তিনি স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশি যেতে পারেন।

—কিন্তু কাকা···

—না, অশোক। কোন অনুরোধ আমি রাখতে পারব না। তোমার কাকিমার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এই সমস্ত ঘটতে চলেছে। তিনি এমন সব কাণ্ড করেছেন যা তোমাকে বলা যায় না। অন্য কোন স্বামী হলে ওঁকে গুলি করে মারত। সে তুলনায় আমি যথেষ্ট দয়াই দেখাচ্ছি।

ট্রে হাতে বেয়ারা প্রবেশ করল এই সময়।

ট্রে-র ওপর থেকে কার্ডখানা তুলে নিয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন ভবানীশঙ্কর। কেমন যেন বেসুরো লাগছে। লালবাজার থেকে তাঁর কাছে লোক এসেছে কেন? ইঙ্গিতে বেয়ারাকে জানালেন, আগন্তুককে এখানে নিয়ে আসতে। অশোকও দেখল কার্ডখানা। অবাক কম হল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হোমিসাইড স্কোয়াড-এর পুরন্দর সামন্ত দেখা দিলেন। সঙ্গে তাঁর একজন সহকারি। অনুরোধ ছাড়াই বসলেন দুজনে। গৃহকর্তা কে হতে পারেন, অনুমান করতে অসুবিধা হল না।

বললেন, এই সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত মিস্টার

সান্যাল। নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই আসতে হল।

—সঙ্কোচের কোন কারণ নেই! বলুন, কি প্রয়োজনে এসেছেন?

—রেকর্ড বলছে, সেভেন ট্রিপল জিরো ফোর, এই নাম্বারে আপনার একটা গাড়ি আছে।

—গাড়িটা এখনও আমার নামে থাকলেও, বছর দুয়েক আগেই মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—আজকের কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন ব্যারিস্টার মিস্টার গুপ্ত খুন হয়েছেন। আমরা সন্দেহ করছি, ওই গাড়িতে তাঁর মৃতদেহ হাওড়া স্টেশনে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘরে যেন বজ্রপাত হল।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভবানীশঙ্কর। অশোকের অবস্থাও তাই।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সান্যাল বললেন শেষে, কি বলছেন অফিসার! আমার মেয়ের গাড়িতে গুপ্তর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

—বললাম তো, এই রকম একটা সন্দেহ আমাদের রয়েছে। অনুগ্রহ করে আপনার মেয়েকে একবার এখানে ডাকুন।

—সে তো এখানে নেই। আমার অমতে একজনকে বিয়ে করে দিন কয়েক হল বাড়ি থেকে চলে গেছে। গাড়িটাও এখন তার কাছে।

ভ্রূ-কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন সামন্ত।

—তাঁর ঠিকানাটা তাহলে দিন।

—দুঃখিত। ঠিকানা আমার জানা নেই। অশোক, তুমি জান নাকি?

অশোক বলল, জানি। কিন্তু অফিসার, এ সমস্ত আপনি কি বলছেন? ইরার মত সাদাসিধে মেয়ে নিজের গাড়িতে একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবে স্টেশনে—এ যে অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া সে মৃতদেহ পাবে কোথা থেকে? আপনি কি বলতে চাইছেন, ইরা গুপ্তসাহেবকে খুন করেছে?

—এই মুহূর্তে আমি জোর দিয়ে কিছুই বলতে চাইছি না। যে সমস্ত সূত্র হাতে এসেছে, তার ওপর নির্ভর করে আমাদের এগোতে হচ্ছে।

—তবু সম্ভব অসম্ভব বলে তো একটা কথা আছে।

—নিশ্চয় আছে। তদন্ত চলেছে। আমরা সমস্ত সম্ভাবনাকেই বাজিয়ে দেখব, তারপর বোঝা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। দয়া করে ঠিকানাটা দিন।

অশোক ঠিকানা দিল।

সামন্ত নিজের সহকারিকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিকে···

প্রমীলা আর প্রবীর ভাদুড়ীর কথাবার্তাও শেষমুখো। নিরেট চেহারার অধিকারী প্রবীর ভাদুড়ীর বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। প্রিয়দর্শন তাঁকে কেউ বলবে না। মুখ-চোখের ভাব দেখলে মনে হয়, বহু ঘাটের জল খেয়েছেন।

প্রমীলাই তাঁর একমাত্র সহোদরা। সপরিবারে থাকেন উত্তর কলকাতার ফড়িয়া-পুকুরে। বাগড়ি মার্কেটে তাঁর ওষুধের কারবার আছে।

ভাদুড়ী বললেন, বেশ ভাল রকম যখন গুছিয়ে নেওয়া গেছে, তখন এই ঝামেলার মধ্যে থেকে কি করবে? যা শুনলাম, তাতে সান্যালের মতিগতি খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। তুমি বরং আজ আমার সঙ্গে চল।

—তুমি বোঝোনা দাদা—প্রমীলা বললেন, ভাল মত গুছিয়ে নেওয়া গেছে ঠিকই। তবে নিজের অধিকারটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

—কি করতে চাও?

—উইলের ব্যাপারটা বানচাল করে দিতে চাই। বিরূপাক্ষ দস্তিদারকে জান তো? ও-ই কাগজপত্র রেডি করবে। লোকটা ক্যাবলা। ওর মাথা ঘুরিয়ে দিতে চাই। তারপর···

—ছেলেমানুষের মত কথা বল না। প্র্যাক্‌টিকাল হও। উকিলের মাথা ঘুরিয়ে মক্কেলের উইল বানচাল করা যায় না।

—যায়।

—কিভাবে?

বিচিত্র এক হাসি দেখা দিল প্রমীলার মুখে।

—আমি আর ইরা ছাড়া যখন আর কোন দাবীদার নেই, তখন মক্কেলের মৃত্যুর পর উকিল যদি উইল বার না করে, তবে সমস্ত গোলমাল মিটে গেল না কি? তখন স্বাভাবিক নিয়মে আমরা দুজন উত্তরাধিকারী হয়ে গেলাম।

—তবুও একটা ফাঁক থেকে যাবে।

—কিসের ফাঁক?

—উইলের কয়েকজন সাক্ষী থাকবে। এটাই নিয়ম। উকিলের নিশ্চেষ্টতা তারা বরদাস্ত করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। সমস্ত কিছু ফাঁস হয়ে যেতে বাধ্য।

প্রমীলা ঠোঁট কামড়ালেন। এই দিকটার কথা একেবারেই তাঁর মনে পড়েনি। রেজিস্ট্রি করা উইলে কয়েকজন সাক্ষী থাকবেই। সময় মত তারা চুপ মেরে যাবে, তা তো হতে পারে না। পরিকল্পনাটা মাটি হয়ে গেল। আবার বিষয়টা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। প্রবীর ভাদুড়ী বোনের মনোভাব সহজেই আঁচ করে নিলেন।

বললেন, হাল ছেড়ে দেবার মত কিছু নয়। পথ ধরে এগনো যেতে পারে। অবশ্য সবই নির্ভর করছে তোমার মতিগতির ওপর।

বোন তাকালেন ভাই-এর দিকে।

—কি বলতে চাইছ?

—ওষুধের কারবার করি বলেই জানি, এমন কিছু ভেষজ আছে যা কয়েক ডোজ খাইয়ে দিলে মানুষ মরে না বটে, তবে পঙ্গু হয়ে যায়। তখন আর তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। সই করতে গেলে হাত নাড়তে হয় বোঝো তো। সেই হাতই যদি না নড়ে, তবে সইটা হবে কিভাবে?

—তুমি বলতে চাইছ···না, না দাদা, চট করে কিছু করা ঠিক হবে না। বলছিলাম, আরো একটু ভাবি। তারপর না হয়··

প্রবীর ভাদুড়ী হাসলেন না।

—বেশ। ওই কথাই রইল। এখন উঠলাম।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধতে বাঁধতে নিশীথ বলল, কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়াল দেখলে তো? মড়াটাকে ট্রেনে চাপিয়ে দিলাম, অথচ ওটা গিয়ে পৌঁছাল ক্যালকাটা পুলিশের হাতে। খবরের কাগজে ছবিটা দেখেই চমকে উঠেছি।

জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল ইরা। ওর পরণে বাইরে বেরবার মত পোশাক। আগে পরেই হয় বেশির ভাগ সময়। আজ প্রথম দিকেই ক্লাশ। কাজেই দুজনে আজ একই সঙ্গে বেরোবে। ইরা যাবে ইউনিভার্সিটি—নিশীথ যাবে অফিস।

ইরা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, কাজটা কে করেছে বলে তোমার মনে হয়?

—কোন্ কাজটা? —খুন—? আমার তো মনে হয়, তোমার বাবার কাণ্ড। অন্য কোন কারণে তিনি ব্যারিস্টারকে খুন করেছেন। তুমি অবাধ্যতা করেছ, তাই তোমাকে বিপাকে ফেলবার জন্য মড়াটা এখানে রেখে গেছেন।

এ তোমার বাড়াবাড়ি। বাবা খুব খারাপ লোক স্বীকার করছি। তবুও তিনি এতটা নিচে নামবেন না। হাজার হলেও আমি তাঁর মেয়ে। কোন বাপ কখনই চায় না তার একমাত্র মেয়েকে নিদারুণ বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে।

নিশীথের কিছু বলা হল না—টেলিফোন কনঝন শব্দে বেজে উঠল।

আয়নার সামনে থেকে সরে গিয়ে ও রিসিভার তুলে নিল, হ্যালো···

ও-প্রান্ত থেকে অশোকের দ্রুত গলা ভেসে এল, কে···নিশীথ · পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে দুজন অফিসার এখানে এসেছিল···তোমাদের ওখানে ওরা যাবে··

—কেন···পুলিশ আসবে কেন···

—ওদের ধারণা ইরার গাড়িতে · হ্যালো ··আজকের কাগজে একজন ব্যারিস্টারের খুন হওয়ার সংবাদ নিশ্চয় পড়েছ...ওই মৃতদেহটা নাকি বয়ে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে···

নিশীথের বুক কেঁপে উঠল।

কাঁপা গলায় বলল কি সমস্ত মাথামুণ্ডু বলছ ..ইরার গাড়িতে ডেডবডি ক্যারি করা হয়েছে ··

—আমিও ভাই কিছু বুঝতে পারছি না···তোমাদের আগাম জানিয়ে রাখলাম···পুলিশের সঙ্গে সতর্কভাবে কথা বল ··

—এক কাজ কর না···তুমিও চলে এস এখানে···আমি ভীষণ নার্ভাস বোধ করছি···আসছ তো···

—এখুনি আসছি…ছাড়লাম…

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিশীথ ফিরে দাঁড়াতেই ব্যগ্র গলায় ইরা বলল, দাদা ফোন করছিল—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে ?

—হতে আর কিছু বাকি থাকেনি ইরা। কিভাবে যেন পুলিশ জানতে পেরেছে, তোমার গাড়িতেই ডেডবডি বয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

—কি বলছ তুমি ?

—অশোক তো সেই কথাই বলল। পুলিশ ওখানে গিয়েছিল। এখানে আসছে এবার।

—ঝামেলাটা এড়িয়ে যাওয়া গেছে ভেবেছিলাম। কিন্তু—কি করা যায় বল তো ?

নিশীথ আর ইরা, দুজনেই ঘামতে লাগল।

—চুপ করে রয়েছ যে, কিছু বল ?

কাঁপা গলায় নিশীথ বলল, এখন আমাদের নার্ভাস হলে চলবে না। বেশ শক্ত মন নিয়েই পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

—আসল ব্যাপারটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না, কি বল ?

—নিশ্চয়!

দরজায় করাঘাত হল। প্রথমে থেমে থেমে, তারপর দ্রুত। দুজনের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। নিশীথ গিয়ে দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই দুজনকে দেখতে পেল। একজনের পরণে পুলিশের পোশাক। অন্যজনের পরণে ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট।

—এখানে নিশীথ মৈত্র থাকেন ?

—আমারই নাম। বলুন ?

—আমরা লালবাজার থেকে আসছি। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মানে…

বারান্দার সামনেই কুমকুম রংয়ের ফিয়েটটা দাঁড় করানো ছিল। সেইদিকে আঙুল তুলে সামন্ত বললেন, এই গাড়িটা বোধহয় আপনার স্ত্রীর ?

—হ্যাঁ।

—আজকের সংবাদপত্র পড়েছেন ?

–পড়েছি।

—শুনুন মিস্টার মৈত্র, আমরা খুনের তদন্তে এসেছি। সময় নষ্ট করাবেন না। আমাদের ভেতরে যেতে দিন। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

ইতস্তত করে দরজার সামনে থেকে নিশীথ সরে দাঁড়াল। সামন্ত নিজের সঙ্গীকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। ইরা তখনও জানলার ধারেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখ রক্তশূন্য। কথাবার্তা সবই তার কানে গেছে।

—ইরা, এঁরা লালবাজার থেকে এসেছেন—নিশীথ বলল, খুনের তদন্ত না

কি সমস্ত বলছেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ইরা আঁৎকে উঠল।

খুন !!! তুমি কি বলছ ? আমি তো···

—আপনি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন মিসেস মৈত্র। সামন্ত বললেন, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। তারপর যা সত্যি তাই বলুন। ব্যারিস্টার গুপ্তর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আজ দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হলেও, কাণ্ডটা ঘটেছে কয়েকদিন আগে। অনুগ্রহ করে বলবেন কি, সাত তারিখ রাত দশটার সময় কেন হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন ?

ইরা নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে।

গলায় কিছুটা দৃঢ়তা এনে বলল, আমি জানতে পারি কি এ প্রশ্ন কেন করছেন ?

—আমরা জানতে পেরেছি, গাঢ় লাল রংয়ের ফিয়েটে চেপে একজোড়া যুবক-যুবতী স্টেশনে যায়। কেরিয়ারে রাখা ট্রাঙ্ক কুলির মাথায় চাপিয়ে যুবক প্ল্যাট-ফর্মে ঢোকে। জনতা এক্সপ্রেসে ট্রাঙ্কটা তুলে দেয় তারপর। ওই ট্রাঙ্কের মধ্যেই ছিল ব্যারিস্টার গুপ্তের মৃতদেহ।

—আপনি বলতে চান, আমার একটা লাল রংয়ের ফিয়েট আছে, আমাদের দুজনের বয়স অল্প, কাজেই খুনটা আমরা করেছি ?

—আমি জানতে চাইছি, আপনারা সেদিন ওই সময় হাওড়া স্টেশনে গিয়ে-ছিলেন কি না ?

—না।

অশোক এসে উপস্থিত হল।

একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সামন্ত বললেন, ঠিক তো ?

—একজন মহিলাকে আপনি অপমানিত করতে চাইছেন ?

—মিস্টার মৈত্র, আপনিও বোধহয় সমস্ত কিছু অস্বীকার করে যাচ্ছেন ?

নিশীথ বলল, আপনার আজগুবি কথাবার্তার কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হয় আপনার যা জানবার আপনি তা জেনেছেন। আমাদের একটু তাড়া আছে। ও ক্লাশ করতে যাবে, আমাকেও অফিস যেতে হবে।

—আর দু—মিনিট সময় নেব। দত্ত—বানোয়ারিকে এখানে নিয়ে এস।

দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সামন্ত অশোকের দিকে ফিরলেন।

—একটু আগে আপনাকে ভবানীবাবুর ওখানে দেখলাম না ?

—হ্যাঁ। আমি তাঁর ভাইপো।

—তার মানে মিসেস মৈত্র আপনার···

—খুড়তুতো বোন।

দত্ত বানোয়ারিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

বানোয়ারি এতক্ষণ জিপে বসেছিল। বেচারা ভয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে হাওড়া স্টেশনে সে মাল বইছে। এমন ঝামেলায় কখনো পড়েনি। সেদিন কার মুখ দেখে সকালে বিছানা থেকে উঠেছিল ভগবান জানেন। তারই ভাগ্যে একটা মড়াসমেত ট্রাঙ্ক জুটলো! তারপর পুলিশের এই টানাহেঁচড়া।

সামন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, বানোয়ারি, দেখ তো, এই ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে কাউকে তুমি চিনতে পার কিনা?

বানোয়ারি তিনজনকে কয়েক মিনিট ভাল করে নিরীক্ষণ করল।

—এই মাইজি গাড়ি চালাচ্ছিলেন হুজুর। আর ওই বাবু বাক্স নিয়ে আমার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলেন।

ইরা আর নিশীথকে ঠিক মতই চিহ্নিত করল সে।

—এবার বলুন—সামন্ত বললেন, আপনাদের কিছু বলার আছে?

দুজনের মধ্যে কেউ কোন উত্তর দিতে পারল না।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—আমাদের অনুমান তাহলে মিথ্যা নয়। মিস্টার মৈত্র, আপনার ফ্ল্যাট আমরা এখনই সার্চ করতে চাই। তারপর আমাদের সঙ্গে আপনাদের দুজনকে যেতে হবে।

অশোক বলল, দুটোর কোনটাই এই মুহূর্তে করা সম্ভব হবে না অফিসার।

—কেন?

—সার্চ ওয়ারেণ্ট সঙ্গে আছে? ওদের গ্রেপ্তার করার ওয়ারেণ্ট এনেছেন?

সামন্ত এতটা আশা করেননি। বললেন, ওয়ারেণ্ট অবশ্য সঙ্গে নেই। তবে···

—না, অফিসার। ওয়ারেণ্ট ছাড়া আপনি এই ফ্ল্যাট সার্চ করতে পারেন না। এদের দুজনকে থানায় নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে না।

—এঁরা যদি কোন দোষ না করে থাকেন, তবে সার্চের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার কারণটা বুঝলাম না। ঠিক আছে। এখন আমরা চললাম! তৈরি হয়ে আসব আবার।

সামন্ত সহকারিকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিলেন।

কারুর মুখে কথা নেই।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

শেষে ক্লান্ত গলায় নিশীথ বলল, কি ঝামেলায় পড়লাম বল তো? ব্যাপারটা যদি আরো গড়ায়, আমাদের ভবিষ্যত বলে আর কিছু থাকবে না।

—গড়াবেই। অশোক বলল, পুলিশের হাবভাব দেখে তাই মনে হল। কিন্তু ওই অবাঙালি লোকটা স্টেশনের কুলি বলেই মনে হল, ও তোমাদের পয়েণ্ট আউট করল কেন বল তো? মানে···

—সে অনেক কথা। বললে তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না।

—তুমি দাদাকে বল—ইরা বলল, পুলিশের হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়, তার একটা উপায়ও বার করতে হবে।

—কাউকে কিন্তু বল না ভাই। আমি আর ইরা যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

সমস্ত কিছু শোনার পর হতভম্ব অশোক কোনরকমে বলল, অন্যের মুখে শুনলে আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতাম না। বাস্তবিক ভয়ঙ্কর ভাবে জড়িয়ে পড়েছ। অবশ্য হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে যে কোন উপায়ে।

ইরা বলল হত্যাকারী যদি ধরা পড়ে তবেই আমরা রেহাই পেতে পারি।

—দি আইডিয়া—নিশীথ বলল, কিন্তু হত্যাকারীকে ধরবে কে? পুলিশের মতিগতি ভাল নয়, তারা তো আমাদের পিছনেই পড়ে আছে।

অশোক বলল, পুলিশের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তো উপায় নেই। তারা যদি সিরিয়াস হয়, হত্যাকারী ধরা পড়তে বাধ্য।

—একটা কাজ অবশ্য আমরা করতে পারি। মানে···তাঁর কাছে গেলে··

—কার কথা বলছ?

তিনজনের মধ্যে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি।

কলকাতার ওপর একটা ছায়া-ছায়া ভাব নামতে আরম্ভ করেছে। দুশো একচল্লিশের কে হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে এইমাত্র দ্বিতীয় দফায় চায়ের কাপ দুটো খালি হল। বাসব একটু সময় নিয়ে পাইপে ভালভাবে তামাক ঠাসল। ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে, পুরানো কথার খেই ধরল।

—বুঝলে ডাক্তার, যা বলছিলাম, হত্যাকারী বলে আলাদা কোন সম্প্রদায় নেই। লোভ, প্রচণ্ড রাগ, প্রতিহিংসা বা অনন্যোপায় অবস্থা মানুষকে রক্তে হাত ডোবাতে বাধ্য করে। এর মধ্যে··

—কেন? মানুষ তো অকারণেও হত্যা করে। শৈবাল বলল, অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

—আছে। তবে লাখে লাখে নিশ্চয় নেই। মনের বিশেষ এক একসেপশন বিকারে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে খুন করে বসে। ও সমস্ত হল একসেপসন। তার মধ্যে কোন রহস্য থাকে না, প্ল্যান থাকে না। সমস্তটা কেমন হুড়োহুড়ি ব্যাপার। সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে নিখুঁতভাবে একজনকে হত্যা করা একটা আর্ট, নিশ্চয় স্বীকার করবে। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরনের আর্টিস্টদেরই আমি ভালবাসি।

·এ পর্যন্ত তো তুমি অসংখ্য হত্যাকারীকে ধরেছ। এদের মধ্যে কাকে তোমার সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং চতুর বলে মনে হয়েছে?

—ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছ ডাক্তার। তবে ··

বাসবের কথার মাঝেই বাহাদুর এসে দাঁড়াল।

— সাব, কয়েকজন দেখা করতে এসেছেন।

—কয়েকজন!

—দুজন পুরুষ। একজন মহিলা।

—তাঁদের এখানে নিয়ে এস।

বাহাদুর চলে যাবার পর বাসব নড়ে চড়ে বসল।

— মক্কেল মনে হচ্ছে। এলেই ভাল। মাস-তিনেক ধরে স্রেফ আড্ডা মেরে চলেছি। মাঝে-মধ্যে কাজকর্ম তো পাওয়া দরকার, নইলে···

—বটেই তো।

কিছুটা সঙ্কুচিত ভাব নিয়ে ইরা, নিশীথ আর অশোক ঘরে প্রবেশ করল। চকিতে তাদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাসব তিনজনকে বসতে অনুরোধ করল। ওদেরও এবার বুঝতে অসুবিধা হল না দুজনের মধ্যে গৃহকর্তা কে। নিশীথই কথা আরম্ভ করল।

—আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়ে এখানে এসেছি। মানে···

—বিপদে না পড়লে বড় একটা কেউ আমার কাছে আসে না। বাসব বলল, কি ঘটেছে জানবার আগে, আমি আপনাদের পরিচয় জানতে চাই।

পরিচয়-পর্ব শেষ হল।

—বলুন এবার।

তিনজনে পর্যায়ক্রমে একে একে সমস্ত কিছু বলে গেল। ওদের জানা আছে এমন কোন কিছুই বাদ গেল না। এমন কি কেসটা যে লালবাজার থেকে টেক আপ করা হয়েছে, তাও বলল ওরা। বাসব মন দিয়ে সমস্ত কিছু শুনে গেল। লালবাজার অর্থে হোমিসাইড স্কোয়াডের হাতে তদন্ত গিয়ে পড়েছে বোঝা যায়। অর্থাৎ পুরানো বন্ধু পুরন্দর সামন্তর বিপক্ষে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

বাসব বলল, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। পুলিশের হাত থেকে আপনারা রেহাই পেতে চান, এই তো?

নিশীথ বলল, হ্যাঁ। দেখতেই পাচ্ছেন কি দারুণ বিপদে পড়েছি। অনুগ্রহ করে যদি আমাদের —মানে···যা ফি টি লাগবে···

—ফি তো লাগবেই। তার কথা উঠবে যথাসময়ে। বেশ, কেসটা নিলাম। এবার যা প্রশ্ন করি তার সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করুন।

—বলুন!

—বিয়ের ব্যাপারে যাবার সময় নিশ্চয় দরজায় তালা লাগিয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। আবার ফিরে এসে নিজের হাতে খুলেছি।

—কি ধরনের তালা?

—প্যাডলক। অন্য কোন চাবি দিয়ে খোলা সম্ভব নয়।

—ওই তালার ক'টা চাবি আছে ?

—দুটো। একটা আমার কাছে, আর একটা ইরার কাছে থাকে।

—দুটো চাবিই বোধহয় এখনও আপনাদের কাছে ?

এবার কথা বলল ইরা, আমারটা পাচ্ছি না।

- কি রকম ?

—সেদিন—বাড়ি থেকে চলে এসেছি, ওই ভাবে বিয়ে হচ্ছে—আমার তখনকার মনের অবস্থা আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন ? ভ্যানিটি ব্যাগটা ফেলে গেলেও, চাবি আর কয়েকটা নোট রুমালে জড়ানো ছিল। কালিঘাটে বিয়েতে বসার সময় মনে হয় রুমালটা ওখানেই ফেলে এসেছি।

- গাড়ির চাবি ?

—ওটা ড্যাসবোর্ডে ঝুলছিল বলে হারায়নি।

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, এখন আর কোন প্রশ্ন আপনাদের করছি না। ঠিক আছে। আপনারা এবার আসুন, আমি চারধার একটু বাজিয়ে দেখি। ভাল কথা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব। বেসরকারি ভাবে তদন্ত করাবার কথা সকলকে জানিয়ে রাখবেন।

—কিন্তু পুলিশ —নিশীথ কথাটা শেষ করতে পারল না।

—পুলিশকে যা বলবার আমিই বলব। চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি যখন কাজটা হাতে নিয়েছি তখন পুলিশের দিক থেকে আপাতত নিশ্চিন্ত থাকুন।

আর কিছু না বলে ওরা বিদায় নিল।

বাসব সোফা ছেড়ে উঠে টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

রিসিভার তুলে নিয়ে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর পুরন্দর সামন্তকে সে চাইল।

—হ্যালো···মিঃ সামন্ত··· বাসব কথা বলছি···

·········

—না না···আপনি মশাই ব্যস্ত লোক···সব সময় বিরক্ত করা ঠিক নয়··· এখন যে বিরক্ত করছি তাও উপায়হীন অবস্থায়···গুপ্ত মার্ডার কেস-এ জড়িয়ে পড়েছি···মানে···

·········

—আপনারা যাঁদের সন্দেহ করছেন···নিশীথ মৈত্র এবং তাঁর স্ত্রী···ওঁরাই আমার ক্লায়েন্ট···ভরসা করি সহযোগিতা পাব···

·········

—নিশ্চয়···কাল সকালে আপনার সময় হবে কি···ধরুন সাড়ে নটা···

·········

—বেশ···আমি ওই সময় আসছি···কথাবার্তা তখন হবে···একটা অনুরোধ ···আমার মক্কেলদের যেন এখনই বিরক্ত করবেন না···দিনকয়েক সময় দিন···

....

— ধন্যবাদ··· ছাড়ছি এখন ··

বাসব রিসিভার নামিয়ে রেখে আগেকার জায়গায় এসে বসল। একটু সময় নিয়ে পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসল শৈবালের দিকে তাকিয়ে। নড়ে চড়ে বসে শৈবাল সেই অতি পুরানো প্রশ্ন আবার করল।

— কিরকম বুঝলে ?

— খুব সুবিধার বুঝছি না। এছাড়া কেসটার মধ্যে যে বেশ নতুনত্ব আছে, একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে ?

— স্বীকার না করে উপায় কি ? আচ্ছা, তোমার কি মন হয়, ওরা সমস্ত কথা ঠিক ঠিক বলে গেছে ?

— জোর দিয়ে এখনই কিছু বলা যায় না। তবে মানুষ তো চরাচ্ছি বহুদিন ধরে, সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বলতে পারি, ওদের কথার ওপর মোটামুটি ভাবে নির্ভর করা যায়।

— কিভাবে এগোবে স্থির করলে ?

— মোটিভের আঁচ যদি আগে-ভাগে পাওয়া যায়, তবে কাজের যে সুবিধা হয় তা তো তুমি বোঝ ডাক্তার। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের। হত্যাকারী নাটকীয়ভাবে গুপ্তসাহেবকে কেন হত্যা করল, তার কোন হদিশ মিলছে না। কাজেই স্থির করেছি, গুপ্তসাহেব সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ খবর নেওয়া আগে দরকার।

— তবে তো আমাদের একবার ··

— ফরটি থ্রি ক্লাবে যাওয়া দরকার। মূল প্রশ্ন দুটোই, গুপ্তসাহেব কেন খুন হলেন এবং তাঁর মৃতদেহ অপরিচিত পরিবেশে কেন রেখে আসা হল ?

— কিম্বা ওই অপরিচিত পরিবেশেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

— অসম্ভব নয়। তবে এই সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন উঠবে, গুপ্তসাহেব হত্যাকারীর সঙ্গে ওই অপরিচিত পরিবেশে গিয়েছিলেন কেন ?

— গুপ্তসাহেবের কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় এমন কথা হয়ত হত্যাকারী বলেছিল যার জন্য তিনি নিশীথ মৈত্রের বাসায় না গিয়ে থাকতে পারেননি।

— হতে পারে। সমস্ত কিছু পরে ভালভাবে চিন্তা করা যাবে। উঠে পড় এখন। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। ফরটি থ্রি ক্লাবে ঘুরে আসা যাক।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল।

ফরটি থ্রি ক্লাবে পৌঁছাল পৌনে আটটার সময়।

একজন বেয়ারার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল মিঃ সেন এসেছেন। বিলিয়ার্ড ঘরে রয়েছেন। ওরা বিলিয়ার্ড ঘরে পৌঁছাল। বেয়ারা মিঃ সেনকে চিনিয়ে দিল। তিনি তখন বার কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রাম-এর গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলেন। বাসব ও শৈবালকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে বিস্মিতভাবে তাকালেন।

বাসব নিজেদের পরিচয় দিল।

গুপ্ত মার্ডার-কেস হাতে নিয়েছে সে কথাও জানাল।

মিঃ সেন ওদের বসালেন। দু'গেলাস সফেন বিয়ার এসে পড়ল।

– এবার বলুন –সেন বললেন, কিছুটা সাহায্যের আশা নিয়েই আমার কাছে এসেছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি কিভাবে কাজে লাগব সেটাই হল কথা।

গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বাসব বলল, আপনি নিশ্চয় জানেন নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে যত বেশি কথা জানা যাবে, কাজের সুবিধা তত বেশি। গুপ্ত-সাহেব আপনার দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন। কাজেই আপনি আমাকে এমন অনেক কথা বলতে পারেন যা অন্যের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। গুপ্ত সত্যি আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিল। পাঠ্যাবস্থায় – লন্ডনে আমরা একই ঘরে থাকতাম। ওর মৃত্যুটা যে আমার কাছে কত বেদনাদায়ক তা কাউকে বোঝাতে পারব না।

—আমি আপনার মনের অবস্থা উপলব্ধি করছি মিস্টার সেন। তবু বাস্তবকে না মেনে নিয়ে উপায় নেই। যাই হোক, আমি গুটিকয়েক প্রশ্ন করব কি ?

—নিশ্চয়। গুপ্ত চলে গেছে – তার হত্যাকারী বুক ফুলিয়ে বেড়াতে থাকুক, তা আমি কখনই চাই না। ভাবতেও খারাপ লাগে তার মত একজন লোক এইভাবে চলে গেল। দেখুন, গুপ্তর মেয়েদের প্রতি একটু দুর্বলতা ছিল, সময় সময় একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলত, তবু বলব লোক হিসাবে সে খারাপ ছিল না। কারুর সাতে-পাঁচে থাকত না। মন ছিল অত্যন্ত দরাজ। যাক ওকথা। আমার কাছ থেকে কি জানতে চান বলুন ?

– গুপ্তসাহেবের আত্মীয়-স্বজনেরা কোথায় ?

– কলকাতায় তার কেউ নেই বলে জানি। নিজের লোকেরা থাকেন দিনাজপুরে। গুপ্ত ইংল্যান্ড থেকে মেম বিয়ে করে এনেছিল। তাতেই গোলমাল বাধে। তারপর থেকে সে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

– তাঁর বৌ এখন কোথায় ?

—সে এক কেচ্ছা। ডাইভোর্স হয়ে যায়। এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে, বৃটিশ হাইকমিশন অফিসের একজনের উপর ভর করে মহিলা ইংল্যান্ড ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর আর গুপ্ত বিয়ে করেনি। পয়সার জোর থাকায় যতত্র চরে বেড়াচ্ছিল। অবশ্য ইদানিং কিছুদিন···

সেন কথা শেষ না করেই থামলেন।

বিয়ার শেষ হয়েছিল।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, কি হল ? থেমে গেলেন যে ?

ইতস্তত করে সেন বললেন, কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

—এটা খুনের তদন্ত মিস্টার সেন। ভিকটিম সম্পর্কিত কোন কিছু বলতে

হোজিটেসন আসাটা ঠিক নয়। কার মধ্যে থেকে কি সূত্র বেরিয়ে পড়বে বলা ভো যায় না। আপনি বলুন ?

—ইদানিং সে প্রমীলা সান্যালের ওপর ঝুঁকেছিল। মহিলার বয়স হয়েছে। তবে দেখতে শুনতে ভাল। হেঁজিপেঁজি কেউ নয়। বড়ঘরের বৌ। বিখ্যাত স্টিবেডর ভবানী সান্যালের নাম নিশ্চয় শুনেছেন তাঁরই স্ত্রী। প্রকাশ্য কারুর সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি করতে তাকে আগে কখনও দেখিনি।

—তাহলে মিসেস সান্যাল ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ইদানিং ওঁর কোন সম্পর্ক ছিল না ?

—জোর দিয়ে বলা যায় না। গুপ্ত ছিল ক্লাস ওয়ান বোহেমিয়ান।

—আচ্ছা মিস্টার সেন, এই যে চরে বেড়ানোর কথাটা বললেন—ওঁর মত লোক নিশ্চয় রাতের সঙ্গিনী সংগ্রহ করার ব্যাপারে নিজে থেকে তৎপর হতেন না। কোন দালাল টালাল···

সেন শূন্য গেলাসের দিকে তাকিয়ে বার কাউন্টারের দিকে মুখ ফেরালেন। ড্রাই মার্টিনি, ডাবল। আপনাদের জন্য আরেক বোতল বিয়ার আনাই ?

বাসব বলল, না। ধন্যবাদ। আমার প্রশ্নের উত্তরটা···

—কি বলছিলেন, দালাল ?

—সেরকম লোক আর কেউ আছে কিনা জানি না। তবে···

—তবে ?

গোমেজ ড্রাই মার্টিনির গেলাস আর সোডার বোতল রেখে গেল টেবিলে।

—এই লোকটাকে দেখছেন—সেন চাপা গলায় বললেন, পিটার গোমেজ। এর অনেক গুণ। তার মধ্যে একটা হল, বাবুদের মেয়ে সংগ্রহ করে দিয়ে কমিশন খাওয়া। এই ক্লাবের কিছু সদস্য ওর মক্কেল। আমি ভাল করেই জানি, গুপ্ত মাঝে মাঝে ওর সাহায্য নিত। অর্থাৎ···

—বুঝলাম।

বাসব একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল।

তারপর···

—মিস্টার গুপ্তকে আপনি শেষ কবে দেখেছিলেন ?

—গত আট তারিখে।

সেদিনের সমস্ত কথা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই ?

—নিশ্চয় না।

—খুঁটিনাটি নিশ্চয় বাদ দেবেন না অনুগ্রহ করে।

—বেশ। সন্ধ্যার মুখেই গুপ্ত সেদিন আমার বাড়ি গিয়ে পৌঁছাল। চা-টা খেয়ে আমরা দুজন ওরই গাড়িতে চড়ে ক্লাবে এলাম। আমাদের মধ্যে মিসেস সান্যাল সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছিল। আমার বক্তব্যের মূল কথা ছিল, ওই বয়স্কা মহিলার পিছনে আর সে কতদিন ছুটোছুটি করবে। গুপ্ত বলেছিল···

সেদিন যে সমস্ত কথা হয়েছিল, সেন বললেন।

—তারপর ?

আমরা দুজন, ওধারের ওই টেবিলটা দেখেছেন তো, ওখানে বসেছিলাম। কথাবার্তার মধ্যেই মিসেস সান্যাল এসে পড়লেন। অত্যন্ত বেহায়া ধরনের মহিলা। সিগারেট খান। গুপ্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যে গোলমেলে তা চাপা দেবার চেষ্টাও করেন না। উনি আসার পরই আমি উঠে পড়েছিলাম। দোতলায় গিয়ে কয়েক সার্কিট ব্রীজ খেলে নামলাম ন'টার কিছু আগে। তখনই একটা গোলমাল বাধল।

—কিরকম ?

বিরূপাক্ষ দস্তিদারের গুপ্তসাহেবের যে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল তার বর্ণনা দিলেন সেন।

বাসব বলল, তার মানে আপনারা উপরে চলে যাবার পর ভবানী সান্যাল এখানে এসেছিলেন। স্ত্রী আর স্ত্রীর প্রেমিককে একসঙ্গে পেয়ে দু চার কথা শুনিয়েছিলেন। এবং তারপরই দস্তিদারের সঙ্গে আলোচনা হয়। ব্যভিচারের কেসটা তিনি নিজের আইনজ্ঞকে টেকআপ করতে বলেন।

—আপনি ঠিকই বলছেন।

—ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, সান্যাল আগে থেকেই জানতেন তাঁর স্ত্রী অন্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত।

—এতে অবাক হবার কিছু নেই মিস্টার ব্যানার্জি। অন্য যে কেউ হলে ধনী স্বামীকে প্রকাশ্যে তোলিয়ে চলত। যা কিছু করার করত লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি মিসেস সান্যালের স্বভাবের কথা। সোসাইটির চৌহদ্দির মধ্যে আমি অনেক কিছু দেখেছি, তবে এমন মহিলা চোখে পড়েনি।

দস্তিদার কেস-এর ভয় দেখানোয় গুপ্ত নিশ্চয় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন ?

—নিশ্চয় না। গুপ্তর সেই বিখ্যাত বেপরোয়া ভঙ্গিটি যথা নিয়মে বজায় ছিল।

—তারপর কি হল বলুন

—আমরা দস্তিদারের কাছ থেকে সরে এলাম। কথা ছিল, গুপ্ত আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে। গাড়ির কাছাকাছি আসতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি অশোক সান্যাল। ভবানীশঙ্করের ভাইপো। কাকিমাকে খুঁজতে এখানে এসেছিলেন। আগে নাকি ফোনে দুজনের মধ্যে কথা হয়েছিল। আমরা তিনজন গাড়িতে চেপে বসলাম। অশোকবাবু চৌরঙ্গিতে নেমে গেলেন। তারপর গুপ্ত আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিল। সেই তাকে শেষ দেখেছি। ব্যাপারটা সত্যি আক্ষেপের। তার মত প্রাণরসে ভরপুর একটা লোক এইভাবে মারা পড়বে ভাবা যায় না।

—আপনাকে যখন উনি বাড়িতে নামিয়ে দেন, তখন কিছু বলেছিলেন কি ?

—মামুলি দু-চার কথা হয়েছিল।

—তিনি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবেন বা আর কোথাও যাবেন, এমন কিছু বলেছিলেন ?

—মনে পড়েছে। বলেছিল, ফ্ল্যাটে ফেরার আগে ধর্মতলা ঘুরে যাবে। ওখানে কি একটা কাজ আছে।

—আচ্ছা, দস্তিদারকে ক্লাবে এখন পাওয়া যাবে ?

—না, দিনদুয়েক ধরে ওঁকে ক্লাবে আসতে দেখছি না।

—ধন্যবাদ মিস্টার সেন। এখন আর কোন প্রশ্ন নেই। আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। ভবিষ্যতে আবার হয়ত আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নিতে পারি।

সহাস্যে সেন বললেন, যতবার ইচ্ছে।

—ভাল কথা, আমি আপনাদের গোমেজের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ও যাতে সহযোগিতার মনোভাব দেখায়, তার ব্যবস্থা করে দিন।

সেন বিস্মিত হলেন।

এই তদন্তে গোমেজ কিভাবে সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারলেন না।

মুখে অবশ্য কিছু বললেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বার কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছন দিকের তাকে নানা ধরনের ভরা বোতল গোমেজ সাজিয়ে রাখছিল। ফাঁকি দেওয়া তার স্বভাব নয়। কাজকর্ম করার মধ্যে একটা নিখুঁত পদ্ধতি আছে।

—গোমেজ···

—স্যার···

গোমেজ ঘুরে দাঁড়াল।

—আরো দু'পেগ···

—না। আর দরকার নেই। একটা কথা আছে। তুমি নিশ্চয় জান গুপ্তসাহেব খুন হয়েছেন। ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। তোমার সহযোগিতার দরকার।

কাঁপা গলায় গোমেজ বলল, আমি কি সাহায্য করতে পারি স্যার! আমি তো—

বাসব কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তাকে দেখিয়ে সেন বললেন, ইনি হত্যার তদন্ত করছেন। ভয় পাবার কিছু নেই। যা জিজ্ঞেস করেন তার সঠিক উত্তর দাও। মিথ্যা কথা বলছ যদি বুঝতে পারা যায় তবে পুলিশি ঝামেলা এড়াতে পারবে না।

—আমি কিছুই জানি না স্যার।

—সেটা উনি বুঝবেন। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন মিস্টার ব্যানার্জী। আমি বরং ওধারে যাই।

—বেশ।

হলের অপর প্রান্তে—যেখানে বিলিয়ার্ড খেলা চলছিল, সেন সেদিকে চলে গেলেন।

বাসব বলল, গুপ্তসাহেব সম্পর্কে আমি দু-চার কথা জেনে নিতে চাই। আর কিছু নয়। উনি মেয়েদের সম্পর্কে একটু দুর্বল ছিলেন, তাই না?

—স্যার···মানে···

—তুমি এই ক্লাবের কোন্ কোন্ সদস্যকে মেয়ে সাপ্লাই করে থাক? না, না আপত্তি করার চেষ্টা কর না। সেনসাহেব আমাকে বলেছেন।

গোমেজ চুপ করে রইল।

—গুপ্তসাহেবের চাহিদা তুমি নিশ্চয় মেটাতে?

গোমেজ এবার নিজের নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে বলল, গোটা তিনেক মেয়ের সন্ধান আমি জানি স্যার। উনি মাঝে মধ্যে বললে, তাদের মধ্যে থেকে কাউকে জোগাড় করে দিতাম। পেটের দায়েই এসমস্ত আমায় করতে হয় স্যার। মানে ···বাড়তি দু-চার পয়সা হাতে না এলে—

—বটেই তো। এবার সেদিন সন্ধ্যার কথা কিছু বল।

—কোন্ দিনের কথা বলছেন?

—শেষবার যেদিন তুমি গুপ্তসাহেবকে দেখেছ। শুনলাম, ওই টেবিলে বসে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছিলেন। অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল। তুমি যা দেখেছ বা শুনেছ আমাকে গুছিয়ে বলতো!

গোমেজ মোটামুটি বলল সব কথা। তার মধ্যে ভবানী সান্যাল আর গুপ্তসাহেবের ঝগড়ার কথাটাও বাদ গেল না। সমস্ত শোনার পর বাসব কি যেন চিন্তা করল মিনিট দুয়েক। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে বারকয়েক টান দিল। হাল্কা স্লেট রং-এর ধোঁয়া ওর মুখ ক্ষণে ক্ষণে আড়াল করে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

তারপর—

—এখান থেকে যাবার আগে গুপ্তসাহেব তোমাকে কিছু বলেছিলেন?

—বলেছিলেন স্যার। মানে···

—সঙ্কোচ না করে পরিষ্কার করে বল, কি বলেছিলেন?

—একটি মেয়েকে দশটার সময় ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিছু টাকাও দিয়েছিলেন আমাকে।

—তুমি ব্যবস্থা করেছিলে?

—হ্যাঁ, স্যার। উনি চলে যাবার পর, শোভাবাজারের দিকে একটি মেয়ে থাকে—তাকে ফোন করেছিলাম। ঠিক দশটার সময় গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাটে যাতে পৌঁছায় সে কথা তাকে জানিয়েছিলাম।

—মেয়েটি কে?

—নার্সের কাজ করে। নাম অলকা।

—অলকা নিশ্চয় সময় মত ওখানে পৌঁছেছিল ?

—পৌঁছেছিল স্যার। কিন্তু গুপ্তসাহেব ওকে ফিরে যেতে বলেছিলেন।

—হুঁ। অলকার ঠিকানাটা দাও তো আমায়।

গোমেজ পকেট থেকে ডায়েরি বার করে তার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ল। সেই পাতায় ডট-পেন দিয়ে অলকার ঠিকানা লিখে এগিয়ে ধরল। কাগজটা এক নজর দেখে নিয়ে বাসব কোটের পকেটে গুঁজে রাখল। এগিয়ে গেল কয়েক পা।

—আর এখানে কিছু করার নেই। আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই মিস্টার সেন। কাজ মোটামুটি এগোচ্ছে বলেই মনে হয়। এবার কিন্তু আমরা যাব।

সেন হাসলেন।

—দস্তিদারের ঠিকানাটা আপনার দরকার হবে বোধহয় ?

—নিশ্চয়। দেখছেন, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

সেন ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

আরো দু-চার কথার পর বাসব ও শৈবাল ওখান থেকে বিদায় নিল।

ভবানীশঙ্কর সুইভিল চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন।

দাঁত দিয়ে চেপে রাখা সিগার থেকে সুতোর আকারের ধোঁয়া ওপরে উঠে চলেছে। ধূমপানের ব্যাপারে তিনি একটু খেয়ালী। মনের অবস্থার তারতম্যের ওপর কখনো সিগার আবার কখনো সিগারেট ব্যবহার করে থাকেন। ঘরে তিনি একা নেই। সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে বসে রয়েছেন তাঁর আইনজ্ঞ বিরূপাক্ষ দস্তিদার। কথাবার্তা অফিসরুমে বসেই হচ্ছে।

দস্তিদার বললেন, আপনার জামাই তো বেসরকারি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছেন শুনলাম।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ভবানীশঙ্করের।

—জামাই! এ সমস্ত আপনি বলছেন কি ? ওই ছোকরাকে জামাই বলে আমি স্বীকার করতে রাজি নই। আপনি কি চান এই বয়সে ওই সমস্ত নোংরামিকে আমি প্রশ্রয় দিতে থাকব।

দস্তিদার থতমত খেলেন।

—না। আমি বুঝতে পারিনি আপনি···

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। লালবাজার থেকেও আমাকে বেসরকারি তদন্তর কথা জানান হয়েছে। যা হচ্ছে, হোক। আমার কি ? তবে ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে।

—তা তো বটেই। তবে এরকম ঘটনার কথা বড় একটা শোনা যায় না। ও কথা যাক। আপনি আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, সে কথা এখনও বলেননি কিন্তু।

নিভে যাওয়া সিগার সুদৃশ্য চওড়া অ্যাশট্রের ওপর রেখে, ড্রেসিং-গাউনের কোমর বন্ধনীটা ঠিক করে নিলেন ভবানীশংকর। ডান হাতটা মাথার ওপর তুলে চুলের বিলি কাটলেন। বললেন তারপর ঃ

—উইল সংক্রান্ত ব্যাপারেই আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আর ঝুলিয়ে রাখতে চাই না।

—কিভাবে ব্যবস্থা করতে চান বলুন? কালই আমি খসড়া করে নিয়ে আসব।

—কাল নয়। খসড়া আমরা এখনই করব। আপনি তো থাকছেনই, তাছাড়া আরো কয়েকজন সাক্ষীর ব্যবস্থা করবেন। উইল রেজিস্ট্রি এই মাসেই হয়ে যাওয়া চাই।

দস্তিদার বললেন, এ আর এমন কথা কি। এখনই যদি খসড়া করে ফেলা যায়—মাঝে দুদিন ছুটি আছে, তারপরই উইল রেজিস্ট্রি হতে পারে।

—সেই ভাল। আসুন, তাহলে কাজে লেগে পড়া যাক।

দস্তিদার নিজের ফোলিও ব্যাগ থেকে কয়েক সিট সাদা কাগজ বার করলেন। কলম বাগিয়ে বসার পরই দুজনের মধ্যে উইলের বয়ান নিয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হল। মিনিট পনেরর মধ্যেই ভবানীশংকরের বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। উইলটি নিম্নরূপ ঃ

আমি ভবানীশংকর সান্যাল, কলিকাতার······নং সি. আই. টি রোড নিবাসী সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং সুস্থ শরীরে নিজের শেষ উইল করছি। আমাদের আদি বাসস্থান কৃষ্ণনগর। ওই কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিক্ষায়তন ইয়াং অ্যাকাডেমিকে আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দান করলাম। একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। ওই ট্রাস্টের মাধ্যমেই উক্ত শিক্ষায়তনের উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে। আমার বসত বাড়ি গৌড় সেবাশ্রম সংঘকে দান করলাম। টালিগঞ্জে আমার যে ছোট একটি বাংলো আছে, সেটি আমার স্ত্রী প্রমীলা সান্যালের ভাগে যাবে। আমার ব্যবসা, 'সান্যাল মেরিন কনসার্ন' আমার একমাত্র ভাইপো অশোক সান্যালের ওপর বর্তাবে। আইনঘটিত সমস্ত দিক দেখাশুনা করবেন আমার আইন উপদেষ্টা শ্রীবিরূপাক্ষ দস্তিদার। এই কাজের সম্মানমূল্য বাবদ তাঁকে···ইত্যাদি।

—অল্প কথায় উইলটা ভালই দাঁড় করানো গেল, কি বলেন? আপনি মূল বিষয়গুলি এই রেখে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে আনবেন।

—ভাল করে কালই আমি লিখে এনে দেখাব। তবে···

দস্তিদার কথা শেষ করলেন না।

—আবার কি হল?

—আপনার বিষয় সম্পত্তি, আপনি যাকে ইচ্ছে দান করতে পারেন। কারো কিছু তাতে বলার থাকতে পারে না। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি

রাখেন…

মৃদু হেসে ভবানীশঙ্কর বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আর অনুরোধ নয় মিস্টার দস্তিদার। মেয়েকে আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না। স্ত্রীকেও কিছু না দেবার ইচ্ছে ছিল। ছোট বাড়িখানা যে দিয়েছি, এই তার বহু জন্মের পুণ্যের ফল।

—ও প্রসঙ্গে এরপর আর কথা চলে না। তবে অন্য একটা বিষয় এখনও অপরিষ্কারই রয়ে যাচ্ছে।

—কোন্ বিষয়?

—কালো টাকার কথা বলছিলাম। ওগুলি তো উইলের আওতায় পড়ছে না।

ভবানীশঙ্কর এবার চিন্তিত হলেন।

মিনিট খানেক পরে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একেবারেই খেয়াল ছিল না। কি করা যায় বলুন তো?

—ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, ডিফেন্স বণ্ড—এই সমস্ত ওই টাকা দিয়ে কিনে ফেলুন। সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট ছুট দিয়েছেন। কোথা থেকে এত টাকা এল ইত্যাদি একেবারেই প্রশ্ন করা হবে না তারপর ওই বণ্ড আর সার্টিফিকেট যাকে ইচ্ছে দান করে যাবেন।

—মন্দ বলেননি। শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। টাকা তো মশাই ছিল অনেক। আমার বোকামিতে বেশ মোটা অঙ্ক কমে গেছে। এরকম হতে পারে বিন্দুমাত্র আঁচ পেলে আগেই বাড়ি থেকে সমস্ত সরিয়ে দিতাম।

—আমি আপনাকে ঠিক ফলো করতে পারলাম না।

—দেখুন বিরূপাক্ষবাবু, আমার ব্যবসার আইনঘটিত কচাকচি আপনি অনেকদিন থেকে সামলাচ্ছেন। আপনাকে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি। আপনি ভালই জানেন, স্মাগ্‌ল করা ফরেন গুডস্ বেচে আমার বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হয়েছিল। তার থেকে প্রমীলা বেশ কিছু সরিয়েছে।

—বলেন কি!!!

—তার ওপর রাগের কারণ একটা নয় দেখতেই পাচ্ছেন। এর মধ্যে অবাক হবার ব্যাপারও রয়েছে। সে আমার গোপন চেস্টের চাবি সংগ্রহ করল কিভাবে?

—হয়ত একটা ডুপ্লিকেট করিয়ে নিয়েছেন।

—তা তো নিয়েইছে। কথাটা হচ্ছে, তার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে মোমের ছাঁচ তুলে বা আর কোন উপায়ে ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করানো নিশ্চয় শক্ত কাজ। মনে হয় তার কোন সাহায্যকারী আছে। যাক ও সমস্ত। তাহলে ওই কথাই রইল। উইলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে আপনি কালই আসছেন।

দস্তিদার উঠে দাঁড়ালেন।

—সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজ সময় আসবেন।

—বেশ।

দাস্তিদার বিদায় নেবার পরই ভবানীশংকর ক্রেড্‌ল থেকে রিসিভার তুলে নিলেন। একটা নম্বর ডায়াল করার পরই ওধারে রিং হতে লাগল। ওধার থেকে সাড়া পাবার পরই বললেন, সোমেন মিত্তির আছেন?

—আপনি কে?

—এটা কি ন্যাশনাল ডিটেক্‌টিভ এজেন্সি? আমি ভবানী সান্যাল।

—নমস্কার স্যার। আমি মিত্র কথা বলছি। আপনার কাজ এগুচ্ছে।

—গতকালও আপনি একথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমি যে খবর চাই, আপনারা তা এখনও দিতে পারলেন না।

—আপনি বিরক্ত হচ্ছেন? আমরা কিন্তু মক্কেলের জন্য প্রাণপাত করার জন্য প্রস্তুত থাকি। এ সমস্ত কাজে একটু সময় লাগেই। মিসেস সান্যালের পিছনে লোক লেগে রয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই খবরটা আমি দিতে পারব আশা করছি।

ভবানীশংকর আর কিছু না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ন্যাশনাল ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির কাজ হল, ডাইভোর্স যাতে কার্যকরি হয় তার তথ্যাদি সংগ্রহ করা। আরো নানা বিষয়-এ অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে মক্কেলকে লাভবান করা ইত্যাদি। ভবানীশংকর এই এজেন্সির সাহায্য নিচ্ছেন। তিনি জানতে চান, প্রমীলা ডুপ্লিকেট চাবি কিভাবে সংগ্রহ করল এবং টাকাটা এখন কোথায় রেখেছে।

বাগড়ি মার্কেট অঞ্চল দুপুরের দিকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকে। সারা পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ীরা এখানে মাল কিনতে আসেন। চারিধার লোকে লোকারণ্য। বেলা তখন তিনটে। ভিড় থেকে কোনরকমে গা বাঁচিয়ে, ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন প্রমীলা সান্যাল। তাঁর মুখে বিরক্তির ছায়া। না এলে নয়, তাই এ অঞ্চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আরো কিছু দূর এগিয়ে মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

ভেতরে অজস্র প্যাসেজ। প্যাসেজের দুধারে দোকান। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ডান ধারে মোড় নিলেন প্রমীলা। বাঁ পাশের তৃতীয় দোকানটার সামনে এসে থামলেন কয়েক পা এগিয়ে। দোকানের মাথায় ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড—ভাদুড়ী মেডিক্যাল স্টোর। ব্র্যাকেটে লেখা আছে 'স্টকিস্ট'। কাউন্টারের ওধারে দুজন ছোকরা তখন কর্মব্যস্ত রয়েছে। প্রমীলা একবার সভয়ে পিছনে তাকিয়ে নিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকলেন।

—বাবু কোথায়?

একজন ছোকরা উত্তর দিল, ভেতরে আছেন। আপনি যান।

পিছন দিকের দেওয়ালে প্লাইউডের দরজা। ওধারে ছোট একখানা ঘর।

প্রোপ্রাইটার বিশেষ বিশেষ ধরনের মক্কেলের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলেন। এছাড়া আরো কাজকর্ম করার অবকাশ থাকে। প্রমীলা দরজা ঠেলে ভেতরে গেলেন। ভাদুড়ী মোটা একটা খাতায় কি সমস্ত লিখছিলেন, সহোদরার নাটকীয় আগমনে সচকিত হলেন। প্রমীলা ফোল্ডিং চেয়ারের ওপর বসে পড়ে, ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে থেকে রুমাল বার করে আলতো ভাবে মুখে বুলিয়ে নিলেন।

—দাদা, একটা লোক আমার পিছু লেগেছে।

ভাদুড়ী অবাক হলেন।

—তার মানে?

প্রমীলা বললেন, দিন দুয়েক থেকে দেখছি একটা লোক আমার পিছনে লেগে রয়েছে। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেও সেখানে যাচ্ছে। আমার একটু ভয় ভয় করছে।

—এখানেও এসেছে নাকি ধাওয়া করে?

—হ্যাঁ। গয়নার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাদুড়ী তার চেহারার বর্ণনা জেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এসে যেন লক্ষ্যই করছেন না এমন একটা ভাব নিয়ে, কর্মচারিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি দেখলেন ইমিটেসন গয়নার দোকানের একধারে দাঁড়িয়ে প্রমীলার বর্ণনা মত সাদা ট্রাউজার আর বুটিদার ফ্লাইং সার্ট পরা এক ছোকরা বেপরোয়া ভঙ্গিতে সিগারেট টেনে চলেছে। ভাদুড়ী আবার ফিরলেন।

—ব্যাপারটা তো বোঝা যাচ্ছে না।

—আমিও তো কুল-কিনারা পাচ্ছি না। দাদা তুমি একটু মাথাটাথা ঘামাও। এরকম অস্বস্তির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দিন কাটানো যায় না।

—তুমি ঘাবড়িও না, আমি ব্যবস্থা করছি। কল্যাণ!

একজন কর্মচারি ঢুকল।

—আমায় ডাকছেন?

—হ্যাঁ। দয়াচাঁদের দোকানের সামনে সাদা ট্রাউজার আর বুটিদার ফ্লাইং-সার্ট পরা একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় এখান থেকে বেরোলেই ও প্রমীলাকে অনুসরণ করবে। তুমি ছোকরার পিছু পিছু থাকবে। এমনভাবে থাকবে, সে যেন বুঝতে না পারে। তোমার আসল কাজ হচ্ছে, ওই ছোকরার ঠিকানা সংগ্রহ করা। বুঝেছ তো, আমি কি বলতে চাইছি?

কল্যাণ অবাক হলেও সে-ভাব প্রকাশ করল না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

—এখন যাও।

ও চলে যাবার পর ভাদুড়ী বললেন, কল্যাণ চালাক ছেলে। ওই ছোড়াটার পরিচয় ঠিক সংগ্রহ করতে পারবে। যাকগে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। কি স্থির করলে?

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে বললেন, উইলের খসড়া হয়ে গেছে শুনেছি। আমাকে এক নয়া-পয়সা দেবে কিনা সন্দেহ।

—না দিলেও খুব ক্ষতি নেই। তুমি যা সরাতে পেরেছ, তাতে তোমার বাকি জীবনটা রাণীর হালে কেটে যাবে, আমারও ব্যবসার উন্নতি হবে।

—তা হয়ত হবে। কিন্তু ওতে আমি সন্তুষ্ট নই। তুমি কেন বুঝতে পারছ না দাদা, এটা একটা চ্যালেঞ্জের কথা। টাকা বা সম্পত্তি সান্যালের হতে পারে, তাই বলে সে যা ইচ্ছে তাই করবে? আফটার অল আমি তার স্ত্রী—আমাকে বঞ্চিত করার অর্থই হচ্ছে, দশজনের চোখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

—এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। তাই তো আগেই প্রশ্ন করলাম, কি স্থির করেছ?

—উইল করতে দেওয়া হবে না। দস্তিদারের সঙ্গে আজই দেখা করছি। লোকটাকে ম্যানেজ করতে পারব বলেই মনে হয়।

—তা হয়ত পারবে। কিন্তু—, ভাদুড়ী বললেন, এর মধ্যে বড় আকারের একটা কিন্তু আছে। উইলের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে দস্তিদার দেরি করছে বুঝতে পারলেই সান্যাল অন্য উকিলের দ্বারস্থ হবে। কলকাতার সমস্ত উকিলকে ম্যানেজ করা নিশ্চয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রমীলা চিন্তিত হলেন।

—তুমি ঠিকই বলেছ। ওভাবে এগোলে চলবে না।

—তবে?

তুমি যে পথের সন্ধান দিয়েছিলে, সেই পথ ধরেই এগোবো।

ভাদুড়ী বোনের মুখের দিকে তাকালেন।

—ভাল করে ভেবে দেখ। অত্যন্ত রিস্কি ব্যাপার। একটু এদিক ওদিক হলে, দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস। কিম্বা…

—ফাঁসি। আমি সব জেনেই এগোতে চাইছি দাদা। অবশ্য তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, জেল বা ফাঁসি কিছুই আমার হবে না। এমন প্ল্যানে কাজটা হবে, আমি থাকব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। দোষটা চাপবে অন্যের ঘাড়ে।

—প্ল্যানটি কি?

—বলব পরে।

—তা না হয় হল। দোষ চাপাবার মত একটা লোক চাই তো?

প্রমীলা হেসে ফেললেন।

—লোকের অভাব কি? বিরূপাক্ষ দস্তিদারই তো রয়েছেন। একভাবে না হয়, অন্যভাবে আমাদের কাজে লাগুন। তোমাকে গুছিয়ে সমস্ত এক সময় বলব। কি দেবে বলছিলে, দাও।

—এই মুহূর্তে কাছে নেই। কাল সকালে দিতে পারি। তবে একটা ভয় আমার রয়েই যাচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলে কিন্তু…

—তুমি পরিকল্পনাটা আমায় দিয়েছিলে। আর এখন তুমিই ঘাবড়ে যাচ্ছ! কোন ভয় নেই দাদা। আমি সমস্ত কিছু ভাল মতই সামলাতে পারব।

আরো দু-চার কথার পর প্রমীলা ওখান থেকে উঠলেন।

দোকান থেকে বেরুবার পর, কিছুদূর এগিয়ে ঘাড় একটু হেলিয়ে আড়চোখে দেখলেন, বুটিদার ফ্লাইং-সার্ট তাঁর পিছু পিছুই আছে। দেখতে না পেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না কল্যাণও আছে ওর পেছনে। প্রমীলা স্থির করলেন অনুসরণকারীকে ধাঁধায় ফেলবেন। বাজার থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইনের দিকে এগোতে লাগলেন। ক্রমে লাইন পেরিয়ে জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে গিয়ে পড়লেন। এখন একটা ট্যাক্সি পাওয়া দরকার। ইচ্ছে করেই বাড়ির গাড়ি আনেননি। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এ পা দিয়েই এদিক ওদিক তাকাতেই দেখলেন, হাত দশেক দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভাগ্য ভাল দুখানা নেই। লোকটা আর তাঁকে অনুসরণ করতে পারবে না। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে চেপেই তিনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন চৌরঙ্গীর দিকে যেতে। গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার মুখেই তিনি দেখলেন, অসহায় ভাবে বুটিদার ফ্লাইং-সার্ট দাঁড়িয়ে পড়েছে। আরেকটা ট্যাক্সির প্রত্যাশা করছে বোধহয়। ওর মাত্র হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে কল্যাণ সিগারেট ধরাচ্ছে।

চৌরঙ্গীর কাছ বরাবর যাবার পর গাড়ির মুখ ঘোরাতে বললেন ডালহৌসির দিকে। প্রমীলা ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে পৌঁছালেন মিনিট কয়েকের মধ্যেই। দস্তিদারের চেম্বারের ঠিকানা জানা ছিল তাঁর। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর খুব বেশি অসুবিধা হল না নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে। একই বাড়িতে অনেক আইনজ্ঞর চেম্বার। কর্মব্যস্ত পরিবেশ। ভাগ্যক্রমে দস্তিদারকে চেম্বারেই পাওয়া গেল। তিনি প্রমীলাকে দেখে বিলক্ষণ অবাক হলেন।

—আপনি বোধহয় ভাবতে পারেননি আমি এখানে আসব?

ব্যস্তভাবে দস্তিদার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন! বসুন-বসুন। আপনি এখানে আসবেন ভাবতে না পারাটাই স্বাভাবিক। বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে।

মৃদু হেসে প্রমীলা বললেন, করতে আপনি অনেক কিছুই পারেন। তবে আপাতত আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখতে পারলেই আমি খুশি হব।

—বলুন?

—আমার স্বামী উইল করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যতদূর ধারণা খসড়াও হয়ে গেছে। অনুগ্রহ ক'রে বললেন কি, বিষয়-সম্পত্তির কি রকম ব্যবস্থা তিনি করেছেন?

একটু ইতস্তত করে দস্তিদার বললেন, ও সম্পর্কে আমি তো কিছু বলতে পারি না মিসেস সান্যাল। পেশাগত দিক থেকে বাধা আছে।

—তাই নাকি! সততার চূড়ান্ত বলুন? যাক, আগ্রহটা না হয় চেপেই গেলাম। আমি তো জানি সান্যাল আমাকে এক কানাকড়িও দেবে না। অন্য

একটা কাজ করতে পারেন ?

—কি কাজ ?

—উইলটা যাতে কিছুদিন রেজিস্ট্রি না হয় তার ব্যবস্থা।

—মানে…আমি ঠিক…

—এতেও বোধহয় পেশাগত বাধা আছে ?—হাসিতে ভেঙে পড়লেন মিসেস সান্যাল।—নাঃ, আপনি এখনও একেলে হতে পারলেন না। শুকনো অনুরোধ যে রাখা যায় না তা আমি জানি। মোটামুটি ব্যবস্থা ভালই হবে।

—কিন্তু—মানে...

কি বলবেন দস্তিদার ভেবে পেলেন না।

আরেক দফা হাসলেন প্রমীলা।

তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, এখন আড়াই হাজার রাখুন। পরে আরো দেব।

—এ সমস্ত কি করছেন মিসেস সান্যাল। মানে…

—আজকের দিনে যে কোন পথ ধরেই লক্ষ্মী আসুক না কেন, তাঁকে বরণ করে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। আমার কথামত কাজ করলে আপনি ঠকছেন না দেখতেই পাচ্ছেন। বলুন, রাজি ?

নোটের তাড়ার দিকে তাকালেন দস্তিদার।

থেমে থেমে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এ সমস্ত কেন করতে যাচ্ছেন। কাজের কাজ কিছুই হবে না, মাঝ থেকে টাকাটা জলে যাবে।

প্রমীলা বুঝলেন ওষুধ ধরেছে।

বললেন, কাজ হল কি হল না, তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। ও সমস্ত আমার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। টাকা জলে দেওয়া না কি বলছিলেন ? ও নিয়ে একেবারেই ভাববেন না। জলে ফেলার মত প্রচুর টাকা আমার আছে। আপনার আগ্রহ থাকা উচিত পরে কত টাকা আমি দেব সে সম্পর্কে…

—আমার সমস্ত কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। যাহোক, বলুন, কত দেবেন শেষ পর্যন্ত ?

—দশ হাজার।

এই সময় বেয়ারা একটা শ্লিপ নিয়ে ঢুকল।

ভ্রূ কুঁচকে শ্লিপের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন দস্তিদার।

—একজন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ দেখা করতে এসেছেন। আপনি এখন আসুন মিসেস সান্যাল। পরে বরং আরো বিষদভাবে কথাবার্তা হবে।

এবার প্রমীলা সান্যালের ভ্রূ কোঁচকে ওঠার পালা।

—প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ! নিশীথ যে ভদ্রলোককে অ্যাপয়েন্ট করেছে, নিশ্চয় তিনি। শুনুন মিস্টার দস্তিদার, আমার উপস্থিতি ডিটেক্‌টিভ জানতে পারুক আমি চাই না। আপনি বলে পাঠান, মক্কেলকে নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত

আছেন। সন্ধ্যার মুখে বাড়িতে দেখা হবে।

বেয়ারাকে সেই মতই বললেন দস্তিদার।

বাসব বেয়ারার মুখ থেকে দস্তিদারের অনুরোধ শুনে অবাক হল না। মক্কেলকে নিয়ে এই সময় একজন উকিলের পক্ষে ব্যস্ত থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ও বেরিয়ে এল দস্তিদারের অফিস থেকে। রাস্তা পার হয়ে অপর ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল। এখন কোথায় যাবে, এটাই হল চিন্তা।

—ডাক্তার, নার্সকে এখন পাওয়া যাবে কি?

শৈবাল অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, কোন্ নার্স?

—গোমেজ যার কথা বলছিল। অলকা বোধহয় নাম মেয়েটির। সেদিন গুপ্তর কাছে পাঠানো হয়েছিল। তার সঙ্গে একবার কথা বলা তো দরকার।

—আমার মনে হয় না, তাকে তুমি এই সময় বাসায় পাবে। তার চেয়ে এখন লালবাজারে যাও। মিস্টার সামন্তর সঙ্গে কেসটা নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা কর গিয়ে।

—তুমি?

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, তোমার পাল্লায় পড়ে চাকরি বাকরি তো আর শেষ পর্যন্ত থাকবে না। তবু যতদিন টিকিয়ে রাখা যায় আর কি। একবার মেডিক্যাল কলেজ যেতে হবে।

—বেশ, যাও। আমি বরং…

বাসব হঠাৎ থেমে যাওয়ায়, শৈবাল ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, একজন সুবেশা এবং সুশ্রী মহিলা বিরূপাক্ষ দস্তিদারের অফিস থেকে বেরিয়ে চিন্তিত মুখে এদিক ওদিক তাকালেন। মনে হয়, এখন কোন্ দিকে যাবেন একথাই ভাবছেন। এই মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন বলেই উকিলপ্রবর ওদের সঙ্গে দেখা করলেন না, শৈবাল অনুমান করে নিল। মহিলা সবে রাস্তা অতিক্রম করবার জন্য পা বাড়িয়েছেন—দস্তিদার হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

—তাঁর হাতে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ।

—মিসেস সান্যাল, আপনার ব্যাগটা…

—মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন। হাসলেন একটু।

—হাউ ফানি! ফেলে এসেছিলাম! ধন্যবাদ মিস্টার দস্তিদার। চলি…

ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বার দুয়েক দোলালেন মহিলা, তারপর এগোলেন। অর্থাৎ রাস্তা পার হবেন। দস্তিদার আবার ফিরে গেলেন অফিসে। বাসব ও শৈবাল দুজনের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল। প্রমীলা রাস্তা পার হয়ে ওদের পাশ দিয়ে হাইকোর্টের দিকে এগিয়ে চললেন।

—ইনিই বোধহয় প্রমীলা সান্যাল।

পাইপে দীর্ঘ টান দেবার পর বাসব বলল, তাই তো মনে হয়। তুমি নিজের কাজে যাও ডাক্তার। আমি মহিলার পিছু নিলাম।

—হঠাৎ ?

—দেখি না, উনি কোথায় যান।

প্রমীলা ক্রমে হাইকোর্টের চত্বরে এসে পড়লেন। নানা ধরনের মানুষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ একটা এমন জায়গা যেখানে হাসি-কান্নার ঝড় বিরামহীন ভাবে বয়ে চলেছে। গথিক কায়দায় তৈরি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রমীলা ওপরে উঠলেন। আসলেন ব্যারিস্টারদের বিশাল বিশ্রাম-কক্ষের সামনে। এদিক ওদিক তাকালেন—কাউকে খুঁজছেন নিশ্চয়। বেয়ারাশ্রেণীর একজন লোককে কি যেন প্রশ্ন করলেন। সে মাথা নেড়ে কিছু একটা বলল। কিছুটা দূরে থাকার দরুণ বাসব শুনতে পেল না দুজনের কথা।

প্রমীলা ফিরে চললেন।

হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে, বিধানসভা ভবনকে পাশ কাটিয়ে, রাস্তা পার হয়ে গভর্নর হাউসের লাগোয়া ফুটপাথে গিয়ে উঠলেন। বাসব অনুমান করল, ওঁর গন্তব্যস্থল চৌরঙ্গী। রোদ্দুরের তেজ এখন একটু বেশি। প্রমীলার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছছেন। ক্রমে ঘাসে-ছাওয়া সার্কেলটা পার হয়ে সোজা সুরেন ব্যানার্জী রোডের দিকে চললেন।

বাসব তখন একেবারে তাঁর পিছনে এসে পড়েছে।

—মিস্টার সেন বোধহয় আজ হাইকোর্টে আসেননি ?

প্রমীলা চমকে মুখ ফেরালেন।

বললেন তীক্ষ্ম গলায়, কে আপনি ?

—বাসব ব্যানার্জী। বেসরকারি গোয়েন্দা। তবে কি জানেন, ক্যালকাটা পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ দহরম মহরম আছে। গুপ্ত মার্ডার কেসে নিশীথবাবু আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন।

—বেশ তো। তদন্ত করুন।

—সেই সূত্রেই তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আমার সঙ্গে ! আমি কি জানি ?

—অনেক কিছু জানেন, তা অবশ্য আমি জোর দিয়ে বলছি না। তবে মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে দু-চার কথা জানা যাবে—এই আর কি !

প্রমীলা হাসলেন।

—আপনি গোয়েন্দা না হয়ে অভিনেতা হলে পারতেন। এখনও সময় আছে, নেমে পড়ুন। চেহারায় জেল্লা রয়েছে, নাম করতে পারবেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনার কম্পিলমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ। তবে কি জানেন, গোয়েন্দাগিরি করে এতগুলো বছর যখন কাটিয়ে ফেলেছি, তখন আর অন্য পেশায় যাওয়া ঠিক হবে না। যা বলছিলাম, সহযোগিতা করবেন নাকি ? তাহলে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে বসতে পারতাম।

রিস্টওয়াচের দিকে প্রমীলা তাকিয়ে নিলেন।

—আপনি আমায় সহজে ছাড়বেন না জানি। পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে, একথা তাই আগেই জানিয়ে রাখলেন। সময় কিন্তু বেশি দিতে পারব না। কোথায় বসবেন?

খুব বেশি সময় নেব না। প্রিন্সেসে যাওয়া যেতে পারে।

—চলুন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা প্রিন্সেসে এসে উপস্থিত হলেন। অভিজাত রেস্তোরাঁয় তখন ভাঙ্গা হাট। এ-টেবিল ও-টেবিল মিলিয়ে জনাকুড়ির বেশি লোক হবে না। আর কিছুক্ষণ পরেই গমগম করতে থাকবে। দামি সুট আর ঝলমলে শাড়িতে ভরে উঠবে চারধার। ওরা কোণের দিকের একটা টেবিল অধিকার করল।

—আমি একটা সিগারেট ধরালে নিশ্চয় আপনার আপত্তি হবে না?

বাসব নিজের বিস্ময়ভাব দমন করে বলল, বিন্দুমাত্র না। আমিও পাইপ ধরিয়ে নিতে পারি।

নিশ্চয়।

প্রমীলা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ফিল্টার টিপট গোল্ডফ্লেকের বাক্স আর লাইটার বার করলেন। বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে লিপস্টিক চর্চিত পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে ধরালেন। মুখটুখ না কুঁচকেই ধোঁয়া ছাড়লেন বেশ কায়দা করে।

—কি বলবেন বলছিলেন, বলুন এবার?

বাসব ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়ে নিয়েছে।

মুখ খোলার আগেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

প্রমীলা এক প্লেট চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিলেন।

বাসব বলল, প্রথমেই আপনাকে জানিয়ে রাখি, ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে মিঃ সেন, নিশীথবাবু, অশোকবাবু, ইরাদেবী এবং ফরটি থ্রি ক্লাবের বারম্যান পিটার গোমেজের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কাজেই আপনি বুঝতে পারছেন, আপনার সঙ্গে গুপ্তসাহেবের সম্পর্কটা কি ছিল আমি তা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছি। সেদিন ক্লাবের বার কাউন্টারের সামনে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, সে সম্পর্কেও আমার কিছু অজানা নেই। এবার মূল কথায় আসছি। আমাকে সাহায্য করুন। এই হত্যা-রহস্যের ওপর যবনিকা পড়ুক, আপনি তা নিশ্চয় চাইবেন। আমি পুলিশের লোক নই, আমাকে মন খুলে সমস্ত কিছু বলুন।

—দরকারে লাগে এমন কোন কথা আপনাকে বলতে পারব বলে মনে হয় না। আসল কথা হল, এ সম্পর্কে আমি জানিই বা কি। তবে···

—বলুন?

—আমি মনে-প্রাণে চাই গুপ্তর হত্যাকারী ধরা পড়ে যাক। লোকটা খারাপ

ছিল না। আপনি যখন সবই শুনেছেন তখন বলতে বাধা নেই, আমি যে শুধু তাকে পছন্দ করেছিলাম তাই নয়, বাকি জীবন যাতে তার ওপর নির্ভর করতে পারি সে রকম ব্যবস্থাও করে আনছিলাম।

নির্ভর করবার মত লোক তো আপনার রয়েছে। মিস্টার সান্যাল…

বাসব ইচ্ছে করেই কথা শেষ করল না।

প্রমীলার মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল।

—আমি তাঁর কাছে খেলনার সামগ্রী ছিলাম। বিয়ের পর কিছুদিন তিনি আমার সঙ্গে খেলেছিলেন। তারপর পিতার ভূমিকা নিয়ে বসলেন। কথায় কথায় শাসন। আমি অনাদৃত পুরানো পুতুলের মত একধারে পড়ে রইলাম। মিস্টার ব্যানার্জী, আমিও মানুষ। একদিন আমি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। ভেবে দেখলাম ওই বুড়ো লোকটার সঙ্গে মানিয়ে চলা অসম্ভব। আমার চাই মনোমত সাথী আর প্রচুর টাকা। আমি আমার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে এগোলাম। তারপর থেকে সান্যালের সঙ্গে অবিরাম ঠোকাঠুকি চলেছে।

—গুপ্তসাহেবের অবশ্য টাকার অভাব ছিল না।

—আপনি ভুল করছেন। গুপ্তর টাকা ছিল বলেই যে আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম তা নয়, আসলে আমি মানুষটাকে পছন্দ করেছিলাম। টাকা সংগ্রহ করেছিলাম আমি অন্য উপায়ে।

—কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন বলতে বাধা আছে কি?

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রের মধ্যে ফেললেন প্রমীলা।

বললেন, বেশ স্বাভাবিক গলায়, একেবারেই না। যার টাকা নিয়েছি তাকেই যখন বলতে বাধল না, তখন অন্য কাউকে বলতে আপত্তি হবে কেন? সান্যাল যে তার সম্পত্তির এক কানাকড়িও আমাকে দেবে না তা জানি। তাই আমি তার কালো টাকার পাহাড় থেকে কিছু খসিয়ে নিয়েছি।

বেয়ারা কফি আর স্যাণ্ডউইচ রেখে গেল।

কয়েক মিনিট কোন কথা হল না।

দুজনেই কফি আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে ব্যস্ত।

তারপর··

—কত টাকা খসিয়ে আনতে পেরেছেন?

—লাখ পাঁচেক।

সবিস্ময়ে বাসব বলল, বলেন কি? এ তো অনেক টাকা। ব্যাঙ্কে নিশ্চয় টাকাটা জমা করতে পারেননি। নানারকম প্রশ্ন উঠবে। কোথায় রেখেছেন?

এবার বিচিত্র সুরে হেসে উঠলেন প্রমীলা।

—ক্ষমা করবেন। এতক্ষণ আমি তদন্তের খাতিরে অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। একান্ত গোপনীয়।

—তবে থাক। এবার খুনের কথায় আসা যেতে পারে। আপনার কাউকে

সন্দেহ হয় ?

—সন্দেহ ! মানে…কাকে হবে বলুন ?

—কেন, আপনার স্বামীকে ?

—গুপ্তর ওপর সান্যাল অসম্ভব চটেছিল। অত্যন্ত একরোখা লোক। নিজে না করলেও, টাকা খাইয়ে কাউকে দিয়ে এক্কাজ তার পক্ষে করানো যে অসম্ভব তা বলছি না। তবে…

—তবে… ?

—এখানে একটা বড় রকমের 'কিন্তু' আছে মিস্টার ব্যানার্জী।

—কি ধরনের, 'কিন্তু' ?

—ডেডবডি নিশীথের ফ্ল্যাটে ফেলে আসার অর্থ কি ? মেয়ের কান্ডকারখানায় যদিও সান্যাল রাগে অন্ধ হয়ে উঠেছিল, তবু মেনে নেওয়া যায় না ইচ্ছাকৃত ভাবে মেয়ে জামাইকে বিপদে ফেলা হয়েছে। অবশ্য আমি জোর দিয়ে কিছু বলছি না। আমার যা ধারণা তাই বললাম।

—আপনি তাহলে বলতে চাইছেন, নিশীথবাবু আর ইরাদেবী হত্যাকান্ডর সঙ্গে একেবারেই সংশ্লিষ্ট নন। তাঁদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়েছে ?

—আমার তো তাই ধারণা। চেনা দূরের কথা, ওরা গুপ্তকে কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত। অদেখা অচেনা লোককে খুন করতে যাবে কেন বলুন ?

—তা বটে। আমি তো শুনলাম ওঁদের বিয়েতে আপনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কথাটা সত্যি নাকি ?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। কেন উৎসাহী হব না বলুন ? ইরা যদিও আমার মেয়ে নয়, তবু তাকে আমি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করি। সে যদি নিজের পছন্দ মত লাইফ পার্টনার খুঁজে নিয়ে থাকে—আমার তো উৎসাহ দেওয়াই উচিত। আমিই বলেছিলাম নিশীথকে সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে।

—জানি। কিন্তু উনি…

—আকাশ-ছোঁয়া অহমিকা নিয়েই লোকটা গেল। আমি একটা কাজ করতে চলেছি মিস্টার ব্যানার্জী। অবশ্য ইরার ভালর জন্য এটা করতে হচ্ছে। কিংবা বলতে পারেন সান্যালকে একদফা অপদস্থ করার জন্যেও।

—কাজটা কি ?

প্রমীলা সিগারেট ধরালেন।

বাসবও পাইপ ধরাবার জন্য তৎপর হল।

কয়েক টান দেবার পর প্রমীলা বললেন, পাইপ খেয়ে কি আনন্দ পান বুঝি না।

—আমি নেশা আরম্ভই করেছি পাইপ দিয়ে। এখন পাকা নেশা। ভাল লাগালাগির উর্ধ্বে চলে গেছে। কি একটা কাজ করতে যাচ্ছেন বলছিলেন ?

—আপনাকে আমি আগেই বলেছি, সান্যাল আমাকে কিছু দেবে না।

ইরাকেও সে বাদ দিতে চায়। তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু কোথাও দাতব্য করে দেবে—এরকম ইঙ্গিতও দিয়েছে। ইরার জন্যে আমি একটা ফাইট দিতে চাই। কাল সন্ধ্যায় ওকে আর নিশীথকে বাড়িতে আনছি। তারপর···

—ওঁরা এলেই কি মিস্টার সান্যালের মত পাল্টে যাবে ?

—কখনোই না। মত পাল্টাবার জন্য চাপ দিতে হবে। সান্যাল মুখে যাই বলুক, নিজের পারিবারিক কেচ্ছা কখনোই কোর্টে নিয়ে যেতে চাইবে না। নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্যে সে সবসময় ব্যস্ত। তাই তো আমার ওপর এত খাপ্পা। আমি তার ওই দুর্বলতায় ঘা দেব।

—কি করবেন ?

—আমার আইনজ্ঞ ডাইভোর্স সম্পর্কে আলোচনা করতে সান্যালের কাছে যাবে। ব্যাপারটা পেপারে যাতে ফ্ল্যাশ হয়, সে ইঙ্গিতও দিয়ে রাখা হবে। তারপর দেখা যাক কি হয়।

—তাই হাইকোর্টে মিস্টার সেনকে খুঁজতে গিয়েছিলেন ?

—একজ্যাক্টলি।

—বিরূপাক্ষ দস্তিদারের কাছে কেন গিয়েছিলেন ?

—সান্যাল উইলের তোড়জোড় করছে শুনলাম। দস্তিদারের কাছে গিয়েছিলাম কিরকম ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে। ভদ্রলোক বললেন না।

—আচ্ছা, মিস্টার সান্যাল যদি হঠাৎ মারা যান ?

—মারা যাবেন !!!

—ধরুন, উইল রেজিস্ট্রি করার আগেই উনি মারা গেলেন। এমন যে হতে পারে না তা তো নয়। তাহলে সব দিক দিয়েই সুবিধা হয় কি বলেন ?

—সান্যালের স্বাস্থ্য কিন্তু বেশ ভাল। আপনি যা বলছেন সেরকম কিছু হবার নয়। স্বচ্ছন্দে সে আরো দশ বছর বেঁচে থাকবে।

বাসব পাইপটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, ধরুন একটা দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায় ?

প্রায় এক মিনিট বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রমীলা।

তারপর বললেন বেশ সহজ গলায়, সে রকম দুর্ঘটনা যদি ঘটে, আমাকেই দায়ী করা হবে জানি। তবে মনে হয় কিছু ঘটবে না। লোকটা আমাদের জ্বালাতেই থাকবে। বয়···

বয় কাছেই ছিল। বিল নিয়ে উপস্থিত হল।

—না—না—। আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস্টার ব্যানার্জী, পেমেন্ট আমিই করব।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টিপস সমেত টাকা বার করে বয়ের হাতে দিয়ে প্রমীলা উঠে দাঁড়ালেন।

—এবার চলি···

বাসবও উঠে দাঁড়াল।

—আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভবিষ্যতে বোধহয় আবার…

—নিশ্চয়। এনি টাইম আমাদের মধ্যে কথা হতে পারে।

কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর প্রমীলা থামলেন।

—ভাল কথা। কাল সাতটার সময় আমাদের ওখানে আসুন। নাটক জমে উঠবে, অথচ আপনার মত দর্শক উপস্থিত থাকবে না, এটা ভাল দেখায় না।

—আসব।

টাইটা ঠিক করে নিচ্ছিলেন ভবানীশঙ্কর। ঘণ্টা তিনেক আগে অফিসে এসেছিলেন। এবার বাড়ি ফিরবেন। ভাল একটা কাজ পাওয়া গেছে আজ। মোটা টাকা আয় হবার সম্ভাবনা। তবু তিনি প্রফুল্ল নন। মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আসল কথা হল, যতক্ষণ না জানতে পারছেন. প্রমীলা তাঁর গোপন সেন্টের চাবি সংগ্রহ করল কিভাবে ততক্ষণ মনের এই ভার দূরে হবে না।

ফোন বেজে উঠল।

ভবানীশঙ্কর বিরক্ত হলেন।

যাবার সময় যত ঝামেলা রিসিভারটা তুলে নিলেন।

—হ্যালো—সান্যাল স্পিকিং…

—ন্যাশনাল ডিটেক্‌টিভ এজেন্সি থেকে মিত্র বলছি স্যার।

—বলুন!

—কাজ যদিও এখনও শেষ হয়নি, তবু কিছু ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। আপনার শ্যালক—বাগড়ি মার্কেটে যাঁর ওষুধের হোলসেল আছে—তাঁর সঙ্গে মিসেস সান্যাল আজ অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছেন। পরে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ওই মার্কেটের কয়েকজনকে আপনার শ্যালক বলেছেন, শিগগিরি জাঁকিয়ে ব্যবসায় নামছেন।

—এতে কি প্রমাণ হচ্ছে?

—আমাদের দৃঢ় ধারণা, চাবিটা উনিই মিসেস সান্যালকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

—বিনিময়ে প্রমীলা ওকে মোটা টাকা দিয়েছে?

—ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে স্যার। আমরা আরো খোঁজখবর নিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুরো রিপোর্ট দেব। এখন ছাড়ছি।

ভবানীশঙ্কর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

তাঁর মনে হল, মিত্রর অনুমান ঠিক পথ ধরেই চলেছে। এটাই সম্ভব। ভাদুড়ী হল প্রমীলার নিজের লোক—বড় ভাই। তাছাড়া লোকটা অসম্ভব ঘোড়েল। টাকার লোভে ছাঁচ থেকে একটা চাবি তৈরি করিয়ে বোনকে দেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। ছাঁচ সংগ্রহ করতেও প্রমীলার তেমন অসুবিধা

হয়নি। মাঝে মধ্যে তিনি চাবি বালিশের তলায় রেখে বাথরুমে গেছেন। সেই ফাঁকে কাজ সেরেছে।

এই তাহলে ব্যাপার।

মন কিছুটা হাল্কা হল।

ভাদুড়ীকে এবার বেকায়দায় না ফেললেই নয়। ভবানী সান্যালকে টেক্কা মারতে যাওয়ার পরিণাম যে কত মর্মান্তিক, তা তার বোঝা দরকার। আরামসূচক নিশ্বাস ফেলে সুইভিল চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর কি ভেবে কলিং বেল-এ আঙুল ছোঁয়ালেন।

—ছোটসাহেব আছেন না বেরিয়ে গেছেন?

—আছেন।

—এখানে আসতে বল!

কয়েক মিনিট পরেই অশোক এসে উপস্থিত হল।

ওকে বসতে ইঙ্গিত করার পর ভবানীশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'প্যাসিফিক লাইন'-এর অফিসে গিয়েছিলে নাকি? যতদূর মনে পড়ছে আজই তোমার ওখানে···

—গিয়েছিলাম। কথাবার্তা ভাল ভাবেই হল। সামনের মাসে ওদের দুখানা জাহাজ আসছে। মনে হয় কাজটা আমরা পেয়ে যাব। তবে···

—কি হল?

—'প্যাসিফিক লাইন'-এর ম্যানেজারকে একটু তোয়াজ করা দরকার। মানে···

—বেশ তো। কিছু প্রেজেন্টেশন দাও। হোটেলে-টোটেলে নিয়ে যেতে পার। ক্যাশের প্রতি যদি লোভ থাকে তাও দেওয়া যেতে পারে। মোট কথা লোকটাকে ম্যানেজ করে রাখবে। ওকথা যাক। যেজন্য তোমাকে ডেকে পাঠালাম তাই বলি এবার।

অশোক খুল্লতাতের দিকে তাকাল।

ভবানীশঙ্কর সাইন পেনটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, তোমার কাকিমার কাণ্ডখানায় আমি ফেডআপ। উনি আবার কি করে বসেছেন জান তো?

—কই...মানে···আমি তো কিছু···

—আজ সকালে উনি আমায় জানিয়েছেন, আগামীকাল সন্ধ্যাবেলায় ইরা আর কি যেন নাম ছেলেটার—আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এসমস্ত কি? ইরার স্বেচ্ছাচারিতাকে আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়, এটা জেনেও উনি এই ধরনের নাটক করতে চলেছেন কেন?

—আমি বলছিলাম কাকা—অশোক বলল, যা হবার হয়ে গেছে। এটা তো কালের হাওয়া। এখন আপনি যদি ওদের ক্ষমা না করেন, তবে···

তুমিও ওকালতি আরম্ভ করলে! এ হবার নয়—এ হতে পারে না।

—কিন্তু কাকা···

—তুমি তো জান অশোক, একবার আমি যা স্থির করি, তার নড়চড় হয় না। এমন কি একমাত্র মেয়ের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যেজন্যে তোমাকে ডেকে পাঠালাম। তোমার কাকিমার ছেলেমানুষিটা যাতে আর বাড়তে না পারে সে চেষ্টা তোমাকে করতে হবে।

অশোক কিছুই বুঝতে পারল না।

—বলুন ?

—আজই তুমি ইরাদের বাসায় যাবে। বলবে, নেমন্তন্ন পেয়ে থাকলেও ওরা যেন 'সুজাতা'য় না আসে। এলে অপমানের আমি চূড়ান্ত করব। আমি কি বলতে চাইলাম, বুঝেছ ?

—বুঝেছি। কিন্তু···

—এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই। যা বললাম তাই কর !

অশোক কিছু বলতে গিয়ে থামল।

—ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবে—ভবানীশংকর আবার বললেন, নিজের সম্মান নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে হয়। মুঠো আলগা করলে হেনস্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

—আপনি যা বললেন, আমি নিশ্চয় গিয়ে বলব। তবে—আমি বলছিলাম কাকা, বিষয়টা আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন।

দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার কিছু নেই। আমি যা বলি ভেবেচিন্তেই বলি।

অশোক আর দাঁড়াল না।

প্রিন্সেস থেকে বেরিয়ে আসার পর বাসবের মনে হল, এই ফাঁকে একটা পাইপ কিনে নিলে মন্দ হয় না। যারা পাইপের সাহায্যে ধূমপান করতে অভ্যস্ত, তাদের খানকয়েক পাইপ রাখতেই হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করলে মুখে তেতকুটে ভাবটা বাসা বাঁধতে পারে না। দিন দুয়েক আগে আচমকা হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটা ভেঙ্গে গেছে। সেটা আবার বিদেশী। 'সেরিঙ্গ লিপম্যান'-এর তৈরি। কাজেই একটা কেনা দরকার।

বাসব ওই সম্পর্কিত একটা দোকানে ঢুকল।

প্রমীলা সান্যাল কিছুক্ষণ আগে ট্যাক্সি ধরে নর্থের দিকে গেছেন। বাসবকে মনে মনে স্বীকার করতেই হয়েছে, তাঁর মত মহিলা লাখের মধ্যে একটা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অনেক বাছাবাছির পর ছত্রিশ টাকা দামের একটা পাইপ কিনে ফেলল। তারপর বেরিয়ে এল দোকান থেকে। স্থির করাই ছিল, এখন শোভাবাজার যাবে। নার্স অলকার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। অবশ্য এই সময় মহিলাকে আস্তানায় পাওয়া গেলে হয়। দেখা যাক।

মেট্রোর সামনে আধঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। নিজের ওপর বাসব বিরক্ত হয়ে উঠল। গাড়িটা নিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরতে পারত। যাহোক, ছটা বাজতে পনের মিনিট আগে শোভাবাজারের মোড়ে পৌঁছাল। ঠিকানা খুঁজে পেতে সময় লাগল আরো দশ মিনিট। সাদামাটা চেহারার সেকেলে বাড়ি। ছোট একটা কাপড়ের দোকানের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ির ওপর দিকের শেষ ধাপের পর একটা দরজা। আধ-ভেজানো অবস্থায় রয়েছে। বাসব কড়া নাড়ল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বার কয়েক কড়া আবার নাড়াল। একটু জোরে। এবার পাল্লা সরিয়ে দরজার মুখে একজন এসে দাঁড়াল। বছর ত্রিশেকের যুবতী। মোটামুটি দেখতে। মুখে শুকিয়ে যাওয়া ব্রণর দাগ।

—কাকে খুঁজছেন?

—অলকাদেবী আছেন?

—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

—ওঁকে বলুন, গোমেজ আমাকে পাঠিয়েছে।

যুবতী একটু দ্বিধা করে বলল, দাঁড়ান দেখছি।

মুখে বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে কয়েক মিনিট পরেই অলকা দেখা দিল। সাজ-পোশাক দেখে মনে হয় বেরবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বাসব ওকে ভালভাবে দেখে নিল। ব্যক্তি বিশেষের রাতের সঙ্গিনী হওয়ার উপযুক্ত চেহারাই বটে।

—আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

বাসব এই ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল।

বলল, পিটার গোমেজের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েই আসছি। আপনি নিশ্চয় জানেন গুপ্তসাহেব খুন হয়েছেন? ওই সম্পর্কেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

—খুন !!!

অলকা আঁৎকে উঠল।

—মানে···আমি তো কিছু জানি না। আপনি কি পুলিশের লোক?

—বেসরকারি গোয়েন্দা। তবে পুলিশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। শুনুন মিস্, পরিষ্কার কথা বলতেই আমি ভালবাসি। আমাকে যদি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, পুলিশ আসবে। তখন কিন্তু আপনাকে অনেক ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে।

—বিশ্বাস করুন, আমি ও সম্পর্কে কিছুই জানি না।

—মেনে নিলাম। কিন্তু গোমেজের কাছ থেকে খবর পেয়ে আপনি গুপ্ত-সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন, এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন? ওই যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই আমি কিছু আলোচনা চালাতে চায়। এভাবে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হতে পারে না। চলুন, কোথাও বসা যাক।

পিছন দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অলকা বলল, এখানে সম্ভব নয়। অনেকে আছে। আমাদের কথাবার্তা তাদের কানে যাবেই। আপনি চলে যাবার পর অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আমাকে।

—বেশ তো। অন্য কোথাও চলুন।

—অন্য কোথাও···

—কাছাকাছি কোন পার্ক আছে ?

—কাছেই চিলড্রেন পার্ক। ওখানে যাওয়া যেতে পারে।

—আমি এগোচ্ছি। আসুন পরে। পার্কটা বোধহয় যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ এর ওপর।

অলকা ঘাড় নাড়ল।

বাসব আর দাঁড়াল না। দ্রুত নেমে এল রাস্তায়।

ও পার্কের গেটের সামনে পৌঁছাবার মিনিট দশেক পরে অলকা এসে উপস্থিত হল। তার মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায় অজানা আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বিকেলের দিকে প্রচুর বাচ্চা এখানে এসে হৈ চৈ লাগায়। এখন ফাঁকা। ছাড়া ছাড়া ভাবে দু-চারজন সন্ধ্যা-বায়ুসেবী অবশ্য আছেন। দুজনে একটা বেঞ্চির ওপর পাশাপাশি বসল।

যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন—অলকা বলল, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

বাসব বলল, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়িই আমি আজ শেষ করব। আপনি প্রকাশ্যে এবং আড়ালে কিভাবে আয় করেন তা আমি জানি। আপনার অনেক বড় বড় মক্কেল থাকতে পারে, তাদের সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শুধু সেই সন্ধ্যার কথা জানতে চাই।

—কোন্ সন্ধ্যার কথা আপনি বলছেন ?

—যেদিন গুপ্তসাহেবের কাছে গিয়েছিলেন।

—তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল। গোমেজের কাছ থেকে খবর পেয়ে দশটার সময় আমি ও'র ওখানে পৌঁছেছিলাম।

—তারপর···

—আগে কখনো যাইনি। একটু খোঁজাখুজি করে তবে ও'র ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। দরজা ধাক্কা দিতেই উনি বেরিয়ে এলেন। গোমেজ পাঠিয়েছে বলতেও উনি আমাকে ফিরে যেতে বললেন।

—কেন ? ডেকে পাঠিয়ে ফিরে যেতে বললেন কেন ?

আমার যতদূর মনে পড়ছে উনি বলেছিলেন, বিশেষ কাজ আছে। আজ নয়, পরে গোমেজকে দিয়ে খবর পাঠাবেন। আমি চলে এলাম।

—আপনি গুপ্তসাহেবকে চিনতেন ?

—না। আগে কখনো দেখিনি। বিশ্বাস করুন, আমি আর কিছু জানি

না। এবার ছেড়ে দিন। এই খোলা জায়গায় আপনার পাশে বেশিক্ষণ বসে থাকা ঠিক হবে না।

—কেন? আপনাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। কি হয়েছে বলুন তো? আমি হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারব। হেজিটেট করবেন না। বলুন?

—ও ব্যাপারে আপনি কোন সাহায্যই করতে পারবেন না। ব্যাপারটা আমার এক বন্ধুকে নিয়ে।

—বুঝলাম না।

—আমাদের পাড়াতেই থাকে। মস্তান মার্কা ছেলে। ওকে এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন জানি না ও আমার পিছু পিছুই গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তারপর···

কথাটা শেষ না করেই অলকা উঠে দাঁড়াল।

বাসব চোখ তুলে দেখল মাত্র হাত কয়েক দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টের আলো তার মুখের ওপর পড়ায় বুঝতে পারা যায়, বয়স বছর ত্রিশেক হবে। বেশ স্বাস্থ্যবান। এখন মুখের উপর গাম্ভীর্যের ঘনঘটা।

চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, আমি তোমায় চোখে চোখেই রেখেছি দেখতে পাচ্ছ। ইনি কে? নিশ্চয় নতুন কোন মক্কেল?

অলকা কিছু বলতে পারল না। তার কিছুটা মুষড়ে পড়া ভাব।

বাসবের বুঝতে অসুবিধা হল না, এই হচ্ছে সেই বন্ধু।

বলল, আপনি ভুল করছেন। আমি একজন গোয়েন্দা। অলকাদেবীর পিছু পিছু সেদিন আপনি যাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন—তিনি খুন হয়েছেন, নিশ্চয় শুনেছেন? তারই তদন্তে আমি এসেছি। বসুন, আপনার সঙ্গেও কথা আছে।

দীপেন থতিয়ে গেল।

একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, খুন-টুনের আমি কি জানি? অলকার সতীপনা কতদূর সত্যি, তাই দেখবার জন্যেই সেদিন ওর পিছু পিছু গিয়েছিলাম। ব্যস, এই পর্যন্ত।

—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

—দীপেন।

—দীপেনবাবু, আবার বলছি, আপনি বসুন। কথা আছে।

—কোন কথা নেই। অলকা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না এখানে থাকবে?

অলকা কাঁপা গলায় বলল, আমার অন্য একটা কাজ ছিল। থাক, কোথায় যাবে চল।

ভারি গলায় বাসব বলল, দাঁড়ান আপনারা। দীপেনবাবু, বেশি স্মার্ট হবার চেষ্টা করবেন না। শ্যামপুকুর থানা এখান থেকে বেশি দূর নয়। আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার হবে না। এরপর কি হবে

বুঝতেই পারছেন। পুলিশ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে থানায়। আপনি কি তাই চান ?

—না—দীপেন বলল, আমি তা চাই না। বললাম তো, খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। বরং সেদিন যে আমিই খুন হয়ে যাইনি—এই যথেষ্ট।

—কি রকম ? গুছিয়ে ব্যাপারটা বলুন।

দীপেন বসল।

—তার আগে আমি জানতে চাই গুপ্তসাহেবের সঙ্গে অলকার সম্পর্কটা কি ?

অলকা তাড়াতাড়ি বলল, বাঃ, তোমাকে বললাম না, উনি আমার ছোট কাকার বন্ধু। ডেকে পাঠালে মাঝে মধ্যে যাই। তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস কর না। উনি তো জানেন।

বাসব নির্বিকার মুখে মিথ্যাটা সমর্থন করে গেল।

—উনি ঠিকই বলছেন। এবার আপনার কথা বলুন ?

দীপেন সিগারেট ধরাচ্ছিল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অলকা চলে যাবার পর আমি ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম। ভদ্রলোক দরজা খুললেন। অলকা কেন এখানে এসেছিল ইত্যাদি প্রশ্ন করতেই, উনি আমাকে ভেতরে আসতে বললেন। আমি ভেতরে ঢুকলাম। তারপরই···

—এক সেকেণ্ড—তখন কটা বেজেছে ?

—সাড়ে দশটা হবে।

—বলুন, এবার ?

—কিছু বুঝতে পারার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। ওই ভদ্রলোক পিছন দিক থেকে কিছু দিয়ে মাথায় মেরেছিলেন। বুঝতেই পারছেন, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

—জ্ঞান হবার পর কি দেখলেন ?

—একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে পড়ে আছি। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। কোন রকমে উঠে বসলাম। দাঁড়ালাম তারপর। পকেটে দেশলাই ছিল। কয়েকটা জ্বালার পর সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পেঁছালাম। আলো জ্বালতেই দেখি, যে ঘরে ঢুকেছিলাম সেই ঘরেই রয়েছি। অনেক টানাটানি করেও দরজা খুলতে পারলাম না। বাইরের দিক থেকে তালা লাগানো ছিল বোধহয়।

—কি করলেন এরপর ?

—ওধারের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। আমার তখনকার মনের অবস্থা নিশ্চয় আপনি অনুমান করতে পারছেন। ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে পালাতে পারলে তখন বাঁচি। বেরোবার পথ পাবার জন্যে এঘর ওঘর করে দেখলাম ফ্ল্যাটে কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত বাথরুমের ওধারে মেথর

আসার দরজাটা পেলাম। ঘোরান সিঁড়ি ছিল—ওখান থেকে সরে পড়তে আর কোন অসুবিধা হয়নি।

—রাত তখন কটা?

—দুটো বেজে গিয়েছিল।

—আপনি যখন গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছান, তখন কটা বেজেছিল মনে আছে?

একটু ভেবে দীপেন বলল, যতদূর মনে পড়ছে, সাড়ে দশটা। দু'চার মিনিট বেশিও হতে পারে।

—আশা করি আপনি যা বললেন, সবই সত্যি?

—মিথ্যা কথা কেন বলতে যাব বলুন?

—তা বটে।

—বাসব উঠে পড়ল।

—এখন আমি চলি। প্রয়োজন পড়লে পরে আবার কথা বলা যাবে।

—শুনছেন…

—কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, অলকার ডাকে থামল বাসব।

—আমরা কোন ঝামেলায় পড়ব না তো?

সঙ্গে সঙ্গে দীপেন বলল, পুলিশ যদি টানাটানি করে চাকরিটা থাকবে না। এই বাজারে চাকরি না থাকলে বুঝতেই পারছেন—মানে…

—আপনারা যদি সত্যি কথা বলে থাকেন, ভয়ের কিছু নেই।

বাসব আর দাঁড়াল না।

বাসব যখন চিল্ড্রেন পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছে—ওই সময় অশোক নিশীথের বাসায় পৌঁছাল। বাইরের ঘরে তখন ইরা আর নিশীথ বসেছিল। খাপছাড়া ভাবে কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। অশোককে দেখে দুজনেই মহা কলরবে অভ্যর্থনা জানাল।

নিশীথ বলল, কোথায় থাক আজকাল? ভয়ে ভয়ে আমাদের দিন কাটছে। মিস্টার ব্যানার্জী কতদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন শুনেছ কিছু?

—দিন দুয়েক বেশ ব্যস্ত আছি—অশোক বলল, কয়েকটা বড় জাহাজ এখন আমাদের হাতে। এই সমস্ত ঝামেলার জন্যে মিস্টার ব্যানার্জীর সঙ্গেও ইদানিং দেখা হয়নি।

—পুলিশের কাণ্ড কারখানা তো জান। হঠাৎ যদি গ্রেপ্তার করে বসে তাহলেই তো গেছি।

—আমার মনে হয় না পুলিশ ওরকম করবে। তাছাড়া মিস্টার ব্যানার্জী রয়েছেন। এ লাইনের সুদক্ষ লোক। কেসটা একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন।

এতক্ষণে কথা বলল ইরা, দাদা, তুমি শুনলে অবাক হবে একটু আগে মা

এখানে এসেছিলেন।

মৃদু হেসে অশোক বলল, ও বাড়িতে তোমাদের নেমন্তন্ন করে গেলেন বোধহয়?

—তুমি জান তাহলে?

—জানতাম না, কিছুক্ষণ আগে মাত্র জেনেছি! কাকা আমাকে বললেন। বলতে পার, তাঁর অনুরোধে এখন আমার এখানে আসা।

—ব্যাপার কি? —নিশীথ বলল, গিন্নি ছুটে আসছেন নেমন্তন্ন করতে, কর্তা ভাইপোকে পাঠাচ্ছেন। অবস্থা এখন অনুকূল কি প্রতিকূল বোঝা মুস্কিল।

—অবস্থা অনুকূল এবং প্রতিকূল দুইই। গিন্নি চাইছেন তোমরা ওখানে যাও। এদিকে কর্তা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাদের যাওয়া রোধ করতে। আমি এখন জানতে চাই, তোমরা কাকিমাকে কি বলেছ?

ইরা বলল, আমি বলেছি, বাবা আমাদের ওপর খুশি নন। ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। উনি আপত্তি নস্যাৎ করে দিলেন। উনি যুক্তি দেখালেন, এক-জনের অন্যায় জেদের দরুণ পরিবারের সকলে কষ্টভোগ করুক এটা দিনের পর দিন সহ্য করা যায় না। তোমরা নিশ্চয় আসবে।

—যাচ্ছ তাহলে?

—বোধহয় না।

নিশীথ বলল, বুঝতেই পারছ যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—আমি অবশ্য এখন কাকার পক্ষ থেকে আসছে—অশোক বলল, তবু বলব, তোমাদের কাল আসতেই হবে। কাকিমা ঠিকই বলেছেন, একজন লোকের জেদের জন্য কোন পরিবারের সমস্ত সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যাক—এর কোন মানে হয় না।

—তুমি বলছ বটে, তবে আমার কেমন লাগছে।

ইরার কথা শুনে মৃদু হাসল অশোক।

—এতে লাগালাগির কিছু নেই। বাজে সেন্টিমেন্টকে সরিয়ে দাও মন থেকে। কাল সন্ধ্যায় তোমরা ওখানে যাচ্ছ এটাই হল শেষ কথা।

—বিয়ের ব্যাপারে—নিশীথ বলল, তোমার কাকিমার কথা শুনে ইরার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কি রকম অপমানিত হয়েছিলাম তুমি তা ভালই জান। তাঁর কথা শুনে আবার ওখানে গেলাম, এবার যে অবস্থা আরো খারাপ হবে না তাঁর নিশ্চয়তা কি?

—এবার কিছুটা নিশ্চয়তা আছে বইকি। কাকিমা স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন ঘটনাস্থলে। আসল কথাটা কি জান? উনি কাকাকে মোল্ড করতে চান।

ইরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শুনে চুপ করে গেল।

কে আবার এল?

তিনজনের মনে একই প্রশ্ন।

জুতোর মৃদু শব্দ ভেসে এল। তারপরই ঘরে প্রবেশ করলেন ভবানীশংকর। নিঃসন্দেহে অভাবনীয় ব্যাপার। ঝটিতে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। সময় সময় কত অসম্ভব ব্যাপার যে ঘটে যায়, বর্তমান পরিস্থিতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নীরবতা প্রথম ভঙ্গ করল অবশ্য ইরাই।

মাত্র দুটি শব্দ তার গলা চিরে বেরিয়ে এল, বাবা…

ভবানীশংকর কিছু বললেন না।

তাঁর মুখে বিচিত্র এক হাসি দেখা দিল।

ফরটি নাইন মডেলের মরিশ মাইনার থেকে বিরূপাক্ষ দস্তিদার নামলেন। পার্লারের মুখেই একজন বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল। তার কাছ থেকে জানা গেল গৃহকর্তা এখন বাড়িতেই আছেন। মন্থর পায়ে উনি প্রবেশ করলেন 'সুজাতা'র অতি আধুনিক ড্রইংরুমে। ভবানীশংকর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আনমনে কি ভাবছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন!

বললেন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। বসুন।

দস্তিদার বসলেন।

—কাগজপত্র সমস্ত রেডি হয়েছে নাকি?

ইতস্তত ভঙ্গিতে দস্তিদার বললেন, এখনও হয়নি। তবে…

—হয়নি! ভালই। আর দরকার নেই।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিস্টার স্যান্যাল!

—যে ব্যবস্থা আগে করেছিলাম তা বাতিল করে দিচ্ছি। আমি নতুন উইল করতে চাই। ভেবে দেখলাম এতটা নির্মম হওয়া ঠিক হচ্ছে না। হাজার হলেও ইরা আমার একমাত্র সন্তান। অবশ্য দোষ সে করেছে। বরং বলা চলে গুরুতর অপমান করেছে আমাকে। তবু তার সম্পর্কে আমি নিস্পৃহ থাকতে পারি না। তাই ভাবছিলাম…

উনি কথা শেষ করলেন না।

দস্তিদার এ ধরনের খামখেয়ালীপনা অনেক দেখেছেন। তাঁর বড়লোক মক্কেলের সংখ্যা কম নয়। ওই সমস্ত মক্কেলের চিন্তা ভাবনার ওঠানামা আগে তাঁকে অবাক করত। এখন গা সয়ে গেছে। কাজেই ভবানীশংকরের মত পরিবর্তনে ওঁর মুখে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না।

বললেন, এ তো খুবই ভাল কথা। এবার কি রকম ব্যবস্থাদি হবে?

—আপনাকে বলব। কাল এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা হবে। তবে…

—বলুন?

—স্ত্রীর সম্পর্কে ধারণা পাল্টাবার কোন কারণ দেখছি না। তাঁর বিষয়ে আগে যা বলেছি পরেও সেইমত ব্যবস্থা হবে। স্বেচ্ছাচারি মহিলাটিকে আমি

একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই।

—আপনি যা বলবেন, সেই মতই কাজ হবে।

—তা তো বটেই। সমস্ত কিছু আমার—আমার কথার ওপর কে কথা বলবে?

রেকাবির মত একটা পাত্র হাতে করে বেয়ারা প্রবেশ করল।

পাত্র থেকে কার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লেন ভবানীশংকর।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

—এখানে নিয়ে এস।

দস্তিদারের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, ব্যারিস্টার সেন এসেছেন। কি ব্যাপার বলুন তো?

—যতদূর জানি, আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের মাখামাখি নেই।

—তাই তো অবাক হচ্ছি।

সেন ঘরে প্রবেশ করলেন।

দস্তিদার এখানে থাকবেন এটা অবশ্য আশা করেননি, তবু সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই বললেন, এসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত মিস্টার সান্যাল। মক্কেলের অনুরোধ না থাকলে আমার কোন প্রয়োজন পড়ত না।

ভবানীশংকর বললেন, আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি। বসুন। মক্কেলের অনুরোধ না কি যেন বললেন? কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

—মিসেস সান্যাল আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ···

—প্রমীলা! হুঁ। কেসটা কি? আপনি খোলাখুলি ভাবেই বলুন। দস্তিদার আমার আইনজ্ঞ। ওঁর সামনে যে কোন কথা হতে পারে।

—ব্যাপারটা ডাইভোর্সের। যতদূর মনে পড়ছে, সেদিন ফরটি থ্রি ক্লাবে আপনিও এই রকম কিছু বলেছিলেন। অবশ্য আমার মক্কেল আপনার সম্মানের কথা বিবেচনা করে কোর্টে যেতে চাইছেন না। কোর্টে না গেলে যদিও আইনসঙ্গতভাবে ডাইভোর্স হয় না। তবে একটা দলিলের সাহায্যে স্থায়ী সেপারেশনের ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে।

—আদালতে না যাওয়ার শর্তটা কি?

—শর্ত দুটি।

—বলুন শুনি—?

—এক, আপনার মেয়েকে আপনার সম্পত্তির অর্ধেক দান করতে হবে। দুই, বাকি অর্ধেকের দাবীদার হবেন আমার মক্কেল।

অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন ভবানীশংকর।

অসীম বলে নিজেকে সংযত করে বললেন, দ্বিতীয় শর্ত আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

—আপোষে তবে তো মীমাংসা হল না। বাধ্য হয়েই আমাদের কোর্টে

দরখাস্ত করতে হবে। এছাড়া আমার মক্কেল একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। এই সম্মেলনে তিনি আপনার সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলবেন যা…

—মিস্টার সেন—! আপনি অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

—না, মিঃ সান্যাল! এ আপনার বোঝার ভুল। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কিছু বলছি না। মক্কেলের বক্তব্যই আপনার সামনে পেশ করলাম।

ঠিক এই সময় ইরা আর নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে অশোক ঘরে প্রবেশ করল।

অশোককে দেখেই ভবানীশঙ্কর ফেটে পড়লেন।

—তোমার কাকিমার কাণ্ডটা দেখেছ? এইভাবে আমার সম্মান নিয়ে খেলা করবে ভাবতে পারিনি। ডিসগ্রেস। ওকে গিয়ে বল, দাদার সঙ্গে পরামর্শ করার সময় পরেও পাওয়া যাবে—এখানে যেন একবার আসে।

অশোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

ও কিছুই জানে না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওদিকে ভাদুড়ী তখন বলছিলেন, শেষ সময় পিছিয়ে পড়ছ কেন বুঝতে পারছি না। কেউ ধারণাও করতে পারবে না কাজটা কে করল। খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে অ্যাকশন আরম্ভ হবে। এমন একটা সময় বাছতে হবে যখন সান্যালকে বাইরে যেতে হবে।

কথা হচ্ছিল প্রমীলা সান্যালের শোবার ঘরে।

প্রমীলা বললেন, উত্তেজনার মাথায় আমি অনেক সময় অনেক কথা বলি, তাই বলে—না দাদা, ও সমস্ত গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে আমি যাব না। তাছাড়া ভেবে দেখ না, আমি তো আর পথে বসছি না।

—তা অবশ্য বসছ না। তবে সমস্ত হাতছাড়া হয়ে যাক, এটাও তো কথার কথা নয়।

—সমস্ত হাতছাড়া হচ্ছে কই। আমি ভালমতই সরাতে পেরেছি। তাছাড়া প্ল্যানটা যেভাবে ছকা হয়েছে তা সফল হতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই লক্ষণ ভালর দিকে। সান্যাল মেয়ে-জামাইকে ডেকেছে এবাড়িতে। মিস্টার সেনও এসে পড়বেন। তারপর…

—যা ভাল বোঝো কর। তোমার প্ল্যানের মাথামুণ্ডু আমি তো কিছু বুঝছি না।

মহা বিরক্তভাবে ভাদুড়ী কথাটা শেষ করলেন।

অশোক ঘরে প্রবেশ করল ঠিক এই সময়।

—কাকিমা, কাকা ডাকছেন।

প্রমীলা প্রশ্ন করলেন, মিস্টার সেন এসেছেন?

—এসেছে। ইরা আর নিশীথও এসেছে।

—মিস্টার ব্যানার্জী? প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের কথা বলছি।

—তাঁর আসবার কথা আছে নাকি? তাঁকে তো ড্রইংরুমে দেখলাম না।

—এসে পড়বেন তাহলে। দাদা এস…

ড্রইংরুমের গুমোট ভাবটা তখন কিছুটা স্বচ্ছ হয়েছে।

ভবানীশংকর নিজেকে সামলে নিয়েছেন বলা চলে। ইদানিং তাঁর মনের মধ্যে অবিরাম আলো-ছায়ার খেলা চলেছে। আগে রেগে উঠলে রেগেই থাকতেন। এখন রাগত ভাবটা পর মুহূর্তে সামলে নিচ্ছেন। পারিবারিক ঝামেলাটা মনে হয় উনি অন্য কোন উপায়ে সামলে নেবার পরিকল্পনা করেছেন। মেয়ে জামাই এর প্রতি অসম্ভব বিরূপ থাকলেও তাই বোধহয় ডেকে এনেছেন এখানে।

নিশীথের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ফাঁক দেখে ইরাও দু-চার কথা বলে নিচ্ছিল।

মিঃ সেন আর দস্তিদার নীরব শ্রোতার ভূমিকা নিয়েছেন।

অশোক আর ভাদুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে প্রমীলা ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন। মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিয়ে তাকালেন সেনের দিকে। তারপর নরম গলায় বললেন, কখন এলেন?

সেন ঘাড় নাচালেন।

—কিছুক্ষণ হল। মিস্টার সান্যালকে সব কথা বলেছি।

ভবানীশংকর গলা খাঁকারি দিলেন।

নড়েচড়ে বসে বললেন, আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি দুপক্ষের আইনজ্ঞও রয়েছেন। এই সুযোগে কিছু কথা বলে নিতে চাই। বেশি বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ডিভিডেন্ট আমাকে দিতে হচ্ছে। এ নিয়ে এখন আর আক্ষেপ করে লাভ নেই। আমার একরোখা স্বভাবের জন্য অনেক কিছুই আমি এতদিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। যার দরুণ আমার খেয়ে পরে যারা মানুষ তারাই আজ আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে। অবশ্য এখন আমি বাস্তবকে ভাল ভাবেই চিনেছি।

উনি থামলেন।

একটু দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

—পরিবারস্থ কেউই আমাকে পছন্দ করে না, অথচ আমার সম্পত্তির ওপর লোভ সকলেরই। এই রকমই হয়। যাহোক, আগের খসড়া নাকচ করে দিয়ে সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা কি হবে নতুন করে আমি মনে মনে স্থির করেছি। কি স্থির করেছি তা এখন আমি না বললেও পারি। আমার মৃত্যুর পর সমস্ত কিছু প্রকাশ পাবে এটাই হল আইনানুগ ব্যবস্থা। তবু বলছি, স্থাবর এবং অস্থাবরের অর্ধেক পাবে আমার মেয়ে। বাকি অর্ধেক যাবে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে। ব্যবসাটা আমি অশোককেই দিতে চাই। এবার আসছে প্রমীলার কথা। সে ইতিপূর্বেই অন্যায়ভাবে মোটা টাকা সরিয়েছে, কাজেই টালিগঞ্জের বাংলোটা ছাড়া আর কিছু তাকে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ভবানীশংকর থামলেন।

তাঁর চোখ সকলের মুখের উপর দিয়ে পিছলে গেল। কারুর মুখে কথা নেই। প্রমীলা শুধু নিজের তলাকার ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন।

নীরবতা ভাঙলেন শেষে বিরূপাক্ষ দস্তিদার।

—আপনি যেভাবে ব্যবস্থা দিলেন—আমি গুছিয়ে লিখে আনব কি?

—কাল একবার আমরা আলোচনা করে নেব। কোন্ প্রতিষ্ঠানকে কতটা দেওয়া হবে তার পরিমাণ ঠিক করে দেওয়া দরকার। ভাল কথা, ভাদুড়ী…

ভাদুড়ী একপাশে জড়সড় হয়ে বসেছিলেন।

তাড়াতাড়ি বললেন, বলুন…

—তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না। প্রমীলার এতটা বাড়াবাড়ির মূলে যে তুমি আছ, আমি তা জানি।

—আপনি আমাকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করছেন। প্রমীলার যথেষ্ট বয়স হয়েছে—কি করবে আর কি করবে না, তা স্থির করবার ক্ষমতা তার আছে। ঠিক আছে। আসতে বারণ করছেন, আসব না। এতে আর হয়েছে কি?

ভাদুড়ী উঠে দাড়ালেন।

তীক্ষ্ম গলায় প্রমীলা বললেন, দাদা তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন? যতদিন আমি এ বাড়িতে আছি, তুমি আসবে। বরং দুবেলা এলেই আমি খুশি হব। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায়, আমার দাদাকে কেউ অপমান করুক, আমি তা পছন্দ করব না।

ভবানীশঙ্কর বললেন, কারুর পছন্দ অপছন্দে অবশ্য কিছু যায় আসে না। মিস্টার সেন…

সেন বললেন, কিছু বলবেন?

—আপনার মক্কেলকে বলুন, তিনি স্বচ্ছন্দে ডাইভোর্সের কেস আনতে পারেন। সাংবাদিক সম্মেলন না কি যেন বলছিলেন—তার ব্যবস্থাও জাঁকিয়ে করতে পারেন। নিজের সম্মানকে আমি নিশ্চয় ভালবাসি, তবে শান্তির বিনিময়ে নয়। আপনার মক্কেলের দৌলতে আমার সম্মান চুরমার হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক, ভরসার কথা তার পরই আসবে অনাবিল শান্তি—এতেই আমি খুশি। সপ্তাহ-খানেক পরে আমি ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সুইজারল্যান্ড চলে যাচ্ছি। ফিরব মাস ছয়েক পরে। কাজেই কোর্ট কণ্টেস্ট করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সেন কিছু বলার আগেই বেয়ারা আবার কার্ড হাতে উপস্থিত হল।

কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভবানীশঙ্কর বললেন, এখানে নিয়ে এস।

এবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ডিটেক্‌টিভ ভদ্রলোক আসছেন। তুমি ওঁকে অ্যাপয়েণ্ট করছে না?

প্রশ্নটা নিশীথকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছিল।

সসঙ্কোচে নিশীথ বলল, আমরা কি রকম জড়িয়ে পড়েছি আপনি তো

জানেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, পুলিশ যে কোন মুহূর্তে আমাদের গ্রেপ্তার করত। তাই···

—অন্যায় কিছু করেছ বলছি না। বিপদে পড়ার আগে ডিফেন্সের ব্যবস্থা করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভদ্রলোকের তো নাম-ডাক আছে। দেখা যাক, গুপ্তর হত্যাকারীকে উনি ধরতে পারেন কিনা। কিন্তু হঠাৎ এখানে—আমাকে প্রশ্ন-ট্রশ্ন করতে চান নাকি?

সেন বললেন, মনে হয় তাই। আমাকেও প্রশ্ন করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত ওঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা।

সহাস্যে বাসব ঘরে প্রবেশ করল। সঙ্গে শৈবাল।

ভবানীশংকর গৃহকর্তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বললেন,—বসুন। আপনার নাম শুনেছিলাম। আজ দেখা হল।

গৃহকর্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাসব বলল, কয়েকদিন থেকেই ভাবছি আপনার কাছে আসব। কেসটা জটিল নিশ্চয় স্বীকার করবেন। আপনার সঙ্গে গুপ্তসাহেবের আলাপ বলুন বা মন-কষাকষিই বলুন, কিছু একটা ছিল। কাজেই দু-চার কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

—বেশ তো, কি জানতে চান বলুন?

এই সময় দুজন বেয়ারা ট্রে করে কফি আর কিছু স্ন্যাক্স বয়ে আনল। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পরিবেশন করল তারাই। কেতাদুরস্ত ব্যাপার। সকলে একে একে কাপ তুলে নিলেন। ড্রইংরুমের বিস্তৃতির দরুণ এতগুলি লোকের উপস্থিতি ঘেঁসাঘেঁসির সৃষ্টি করেনি।

ভবানীশংকর কাপ নামিয়ে রেখে বললেন, যদিও এই মার্ডারের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না; তবে আপনি যা বললেন—গুপ্তর সঙ্গে আমার মুখ চেনাচিনি ছিল এবং ইদানিং একটু মন কষাকষি হয়। কেন মন কষাকষি হয়েছিল, মনে হয় আপনি ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন। যাহোক, আপনি স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারেন। বলার মত কিছু থাকলে সঠিক উত্তরই পাবেন।

—ধন্যবাদ। এখনই আপনাকে আমি কিছু জিগ্যেস করছি না। আমাদের কথাবার্তা হবে অন্য কোন ঘরে। অর্থাৎ একান্তে।

—বেশ তো। আসুন, আমরা স্টাডিতে গিয়ে বসি।

ভবানীশংকর উঠে দাঁড়ালেন।

বাসব বলল, ডাক্তার, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।

শৈবাল ঘাড় নাড়ল।

সেন বললেন, আমি আর অপেক্ষা করে কি করব? মক্কেলের হয়ে যা বলবার বলেছি। এখন আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেন, তবে তো কথাই নেই। চলি···

—একি! মা'র কি হল?

ইরার প্রশ্নের মধ্যে যে তীক্ষ্ণতা ছিল, তাতে সকলেই সচকিত হলেন। এক-ধারের কোচে বসেছিলেন প্রমীলা সান্যাল। এখন দেখা গেল, প্যাডযুক্ত সোফায় চওড়া হাতলের ওপর মাথা রেখেছেন। শরীর শিথিল হয়ে পড়েছে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

—অজ্ঞান হয়ে গেলেন বোধহয়।

দস্তিদারের কথা শেষ হবার আগেই ইরা এগিয়ে গেছে ওই দিকে। প্রমীলাকে একবার ঝাঁকুনি দিতেই তিনি গড়িয়ে পড়লেন কার্পেটের ওপর। শৈবালের চিকিৎসক সত্ত্বা সজাগ হয়ে উঠল। দ্রুত এগিয়ে সে হাঁটু মুড়ে বসল। টিপয় ইত্যাদি সরিয়ে প্রমীলাকে শুইয়ে দেওয়া হল চিৎ করে। তাঁর মুখের রংয়ের পরিবর্তন হয়েছে। গৌর বর্ণ হয়েছে ঈষৎ সবুজাভ।

প্রমীলাকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল শৈবাল।

বাসব ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করল, কি দেখলে?

—মারা গেছেন।

ঘরের মধ্যে বিস্ময়ের ঢেউ জাগল।

পর মুহূর্তে গলা কিছুটা উঁচিয়ে ভবানীশঙ্কর বললেন, কি বলছেন আপনি! অসম্ভব উত্তেজনায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল, নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

—আপনার ধারণাটা ঠিক হলে অবশ্য আমি খুশি হতাম,—শৈবাল বলল, তা কিন্তু হবার নয়। উনি সত্যিই মারা গেছেন। একজন চিকিৎসক হিসাবেই কথাটা বলছি। ইচ্ছে করলে, নিজের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান বা অন্য কাউকে ডেকে পরীক্ষা করাতে পারেন।

সেন বললেন, উনি বোধহয় হার্টের পেসেন্ট ছিলেন। হঠাৎ…

—না। হঠাৎ হার্টফেল করেনি। যতদূর মনে হচ্ছে পয়জনিং ডেথ।

বিস্ময়ের আরো একটা ধাক্কা সকলে খেলেন।

ভবানীশঙ্কর বিড়বিড় করে বললেন, পয়জনিং ডেথ! কি আশ্চর্য! তার মানে প্রমীলা বিষ খেয়ে মারা গেছে। এ তো ভাবাও যায় না।

বাসব এতক্ষণ ঝুঁকে পড়ে প্রমীলা সান্যালকে দেখছিল।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিষ উনি নিজে থেকে খাননি। আমি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম, উনি জীবনটা উপভোগ করতেই ভালবাসেন। কাজেই এমন নাটকীয়ভাবে আত্মহত্যা করবেন না। বিষ খাওয়ান হয়েছে। অর্থাৎ খুন হয়েছেন উনি।

—খুন!!!

দস্তিদারের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল।

হ্যাঁ, পরিকল্পনা প্রসূত এক হত্যাকাণ্ড। আপনারা কেউ মৃতদেহের কাছে

যাবেন না। যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আমি পুলিশকে রিং করছি।

বাসব টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

তখন রাত প্রায় দশটা।

হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের লোকেরা মোটামুটি কাজ শেষ করেছে। প্রমীলা সান্যালের কয়েকখানা ছবি তোলা হয়েছে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। যদিও তিনি যে অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন তখন সে অবস্থায় ছিলেন না। কার্পেটের ওপর ঢলে পড়েছিলেন। কফির পেয়ালাতেই যে বিষ মেশানো ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকেনি। প্রমীলার কাপ যত্নে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়েছে—কি ধরনের বিষ ইত্যাদি যাতে জানা যায়।

পোস্টমর্টেমের উদ্দেশে মৃতদেহও চালান করে দেওয়া হয়েছে। মিঃ সেন এবং দস্তিদার পুলিশের অনুমতি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। ইরা আর নিশীথ অবশ্য আছে। আজ রাত্রে দুজনে আর নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরবে না। দুর্ঘটনা-স্থল অর্থাৎ ড্রয়িংরুম ইতিমধ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে শীল করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তর সুবিধার জন্যই এটা করা হয়েছে।

পুরন্দর সামন্ত তখন রান্নাঘরে।

বিদেশী কেতায় তৈরি রান্নাঘর। কিচেন বললেই বোধহয় মানায় ভাল। টাইলস্ বসানো ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ। একজন রান্নার লোক এবং দুজন বেয়ারা ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আগেই জানা গেছে এই তিনজন কম করেও দশ বছর এ বাড়িতে কাজ করছে। এখন তারা কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত। পুলিশের জেরার মুখে অনেক বাঘা লোককেও ঘাবড়াতে হয়।

পাচকের দিকে তাকিয়ে সামন্ত বললেন, কফি তো তুমিই তৈরি করেছিলে? আচ্ছা, তুমি নিজের ইচ্ছেতে কফি তৈরি করেছিলে না, কেউ তোমাকে তৈরি করতে বলেছিল?

—আজ্ঞে, দীননাথ এসে বলল, দশ কাপ কফি তৈরি করতে।

দীননাথ কে?

পাচক বেয়ারাদের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে দিল।

সামন্ত দীননাথের দিকে তাকালেন।

—হঠাৎ তুমি কফি তৈরি করতে বললে কেন? বাবুদের মধ্যে কেউ তোমাকে বলেছিলেন?

বিনীত ভঙ্গিতে দীননাথ বলল, আজ্ঞে, কেউ বলেনি। সাহেব অনেকদিন আগেই বলে রেখেছেন, বাড়িতে কেউ এলেই যেন কফি দেওয়া হয়।

—এক সঙ্গে নিশ্চয় সবাই এসে পড়েননি। যাঁরা আগে এসেছিলেন, তাঁদের তুমি আগে কফির ব্যবস্থা করে দাওনি কেন?

—আজ্ঞে, প্রথমে এলেন উকিলবাবু। তারপর এলেন আরেকজন সাহেব। তখনই আমি এসেছিলাম ঠাকুরকে কফির কথা বলতে। এসে দেখি ঠাকুর এখানে নেই।

—তারপর ?

—তারপর স্যার আমি পাম্প বন্ধ করতে গেলাম।

—কিসের পাম্প ?

—আজ্ঞে নিচে থেকে ছাদের ওপরকার ট্যাঙ্কে জল তোলার পাম্প।

—পাম্প বন্ধ করে ফিরে এসে কি করলে ?

—ওখানে আজ্ঞে, একটু সময় লেগে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখলাম আরো অনেকজন এসে পড়েছেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে সকলকে গুনলাম। তারপর এখানে এসে দেখি ঠাকুর ফিরে এসেছে। বললাম তাকে ক-কাপ কফি দরকার।

প্রশ্ন-উত্তর একজন পুলিশ কর্মচারি দ্রুতহাতে টুকে যাচ্ছিল। সামন্ত বুঝলেন, দীননাথ বর্তমানে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেও চালাক চতুর। কথাবার্তা ভালই বলতে পারে। তিনি পাচকের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

—দীননাথ কি বলল শুনলে তো ? একবার এসে সে ফিরে গেছে। কোথায় তুমি ছিলে তখন ?

পাচক ধরা গলায় বলল, আজ্ঞে কাছাকাছিই ছিলাম। দেশ থেকে একজন লোক এসেছিল। তার সঙ্গে কথা বলছিলাম রান্নাঘরের ওধারে দাঁড়িয়ে।

—কতক্ষণ কথা বলেছিলে ?

—তা আজ্ঞে আধ ঘণ্টাটাক।

—ফিরে আসার পর দীননাথ এসে তোমাকে কফি করতে বলল। কাপগুলো বয়ে নিয়ে গিয়েছিল কে ?

—দীননাথ আর মানিক।

মানিক অর্থাৎ দ্বিতীয় বেয়ারা।

—তুমি যখন কফি তৈরি করেছিলে, তখন বেয়ারারা ছাড়া ঘরে আর কেউ এসেছিল ?

—আজ্ঞে না।

—মেমসাহেব কোন্ পেয়ালায় কফি খাবেন, তুমি আগে জানতে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জানতাম। মেমসাহেব আর সাহেবের দুটো আলাদা ধরনের কাপ আছে। ও দুটো ছাড়া অন্য কোন কাপে ওঁরা কখনো চা বা কফি খাননি।

—মেমসাহেব আর সাহেবের কাপ দুটো কি একই রকমের দেখতে ?

—একটু তফাৎ আছে। সাহেবেরটা নক্সা কাটা। মেমসাহেবেরটা লাল রং-এর।

রান্নাঘরের চিত্র যখন এই রকম, স্টাডির অবস্থাও তখন ভিন্ন রূপ নয়। ভবানীশংকর মন্থর পায়ে পায়চারি করছেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। মনের মধ্যে কোন বিশেষ চিন্তা ওঠানামা করে চলেছে বোধহয়। সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একধার ঘেঁষে বাসব বসে আছে। পাইপের ধোঁয়া মুখের ওপর ছায়া বিস্তার করে উঠে চলেছে ওপর দিকে। ঘরে আর কেউ নেই।

ভবানীশংকর এবার স্তিমিত গলায় বললেন, প্রমীলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ কিছুদিন খারাপ যাচ্ছিল। আমি তাকে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। তবু—বিশ্বাস করুন মিস্টার ব্যানার্জী, তবু আমি চাইনি তার মৃত্যু এইভাবে হোক।

মুখের কাছ থেকে পাইপ নামিয়ে বাসব বলল, আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবে কি জানেন, এখন হাহুতাশ করে আর লাভ নেই। আপনি স্থির হয়ে বসুন। আমরা একটু আলাপ আলোচনা করি বরং। মনে রাখতে হবে আমাদের মূল লক্ষ্য হত্যাকারীকে ধরা।

—আপনি এ কেসটাকেও কি টেক-আপ করছেন?

—গুপ্তসাহেবের হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডর কোন সম্পর্ক নেই—এ বিষয়ে এখনই নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়। দুটো কাজ একই লোকের হতে পারে। ধরুন, তা যদি নাও হয়, তবু আমি নিজের নৈতিক দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে যেতে পারি না। মিসেস সান্যাল আমার চোখের সামনে মারা গেছেন। যাহোক, আপনি বসুন। কয়েকটা কথা আমার জানবার আছে।

ভবানীশংকর বসলেন।

বাসব আবার বলল, আমি আপনাদের ঝগড়ার কারণ। আপনার জমানো কালো টাকা থেকে মিসেসের কয়েক লাখ সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি সবই জানি। কাজেই আপনি সংকোচ না করে উত্তর দিন। আমি কিন্তু দুটো হত্যাকাণ্ড একই সুতোয় বাঁধা, এরকম ধারণা করে নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি।

—কি জানতে চান বলুন?

—টাকাটা কোথায় সরিয়ে রেখেছেন বলে আপনার ধারণা?

—আমার বিশ্বাস ভাদুড়ীর কাছে টাকাটা রেখেছে। আমার শালার কথা বলছি। অসম্ভব ঘোড়েল লোক। বাগড়ি মার্কেটে ওষুধের দোকান আছে।

—তাহলে আপনার স্ত্রীকে খুন করার ব্যাপারে ওই ভদ্রলোকের মোটিভ সবচেয়ে বেশি। টাকাটা পুরোপুরি উনি ভোগ করতে পারবেন।

—কিন্তু ভাদুড়ী প্রমীলাকে কিভাবে খুন করবে। আমাদের চোখের ওপর থাকার কফিতে বিষ মেশাবার সুযোগ তো পায়নি।

—তবে তো ড্রইংরুমে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাউকেই সন্দেহ করা চলে না। কারুর পক্ষেই সকলের চোখের সামনে ওই কাজ করা সম্ভব ছিল না। অথচ দেখুন, উনি মারা গেলেন। এমন হয়নি তো, বেয়ারাদের মধ্যে কেউ এ-

কাজ করেছে ?

—আপনি বলছেন, তাদের মধ্যে কেউ কফি বয়ে আনবার সময় প্রমীলার কাপে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল ? কিন্তু তার স্বার্থটা কি ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, স্বার্থ তার নয়। স্বার্থ সেই লোকের যে মোটা টাকা দিয়ে তাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।

—না, মিস্টার ব্যানার্জী, আমি আপনার সঙ্গে এক মত হতে পারলাম না। বেয়ারা দুজন আমার বাড়িতে অনেকদিন ধরে কাজ করছে। অত্যন্ত বিশ্বাসী।

—ওকথা থাক। এবার বলুন তো, গুপ্তসাহেবকে খুন করার ব্যাপারে আপনার মেয়ে-জামাইয়ের কোন হাত আছে বলে আপনি মনে করেন ?

—না।

—কেন ?

—এই কেন-র উত্তর আমার কাছে নেই। আমি শুধু বিশ্বাস করি তারা একাজ করেনি।

—মেয়ে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করায় আপনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অথচ দেখলাম, ওঁরা দুজনেই এখানে উপস্থিত রয়েছেন! ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

ক্লান্ত গলায় ভবানীশংকর বললেন, আমিই ওদের আসতে বলেছিলাম। হঠাৎই আমার মনে হল, ইরা আমার একমাত্র সন্তান। হাজার দোষ করলেও ওকে আমি ক্ষমা করব। তাছাড়া কথাটা কি জানেন, আমার একরোখা জেদি মন চারপাশের কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তাই ভাবলাম···

—ভালই করেছেন। আচ্ছা, গুপ্তসাহেবের মত আর কোন বন্ধু মিসেসের ছিলেন কি ?

—ছিলেন না বলেই জানি।

—আমি বলতে চাইছি, আগে কারুর সঙ্গে···মানে···

—আমার জানা নেই।

—এখন আর কোন প্রশ্ন নেই। মিসেসের ঘরখানা এবার দেখতে চাই।

—আসুন।

ভবানীশংকর বাসবকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় এলেন।

প্রমীলার ঘরে অবশ্য উনি ঢুকলেন না। নিজের ঘরে গিয়ে বসছেন বলে মন্থর পায়ে এগোলেন। বাসব ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরখানা বেশ বড়সড় বলতে হবে। পেলগ্রীন রং-এর প্লাস্টিক ফিনিশ দেওয়াল। সুদৃশ্য গ্রীল আচ্ছাদিত জানলার সংখ্যা মোট চারটে। অতি আধুনিক ধাঁচের খাটখানা প্রায় ঘরের মাঝামাঝি রাখা। সামান্য আসবাব—মোট কথা, পরিপাটিভাবে সাজানো যাকে বলে, এই ঘরখানা তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি।

ড্রেসিং টেবিলের একটা দেরাজ বাসব প্রথমে খুলল। টুকিটাকি কতকগুলো জিনিস রয়েছে। কাজে লাগে এমন কিছু নেই। ওর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে প্রথমে চাবির গোছাটা হাতে পাওয়া। নইলে আলমারি ইত্যাদি খোলা যাবে না। এ তো জানা কথা, প্রমীলা সান্যালের মত মহিলা চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে বা কোমরে ঝুলিয়ে বেড়াবেন না। এই ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে।

দেরাজগুলোর মধ্যে কিছু পাওয়া গেল না।

ড্রেসিং টেবিলের একধারে ভ্যানিটি ব্যাগ রাখা ছিল। বাসব খুলে দেখল। প্রসাধনের জিনিস, কিছু টাকা আর রুমাল রয়েছে ওর মধ্যে। এরপর অবশ্য খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। গদির তলা থেকে চাবির রিংটা পাওয়া গেল। চারটে চাবি রয়েছে রিং-এ। বাসব প্রথমে স্টিল আলমারিটা খুলল। প্রতিটি তাকে শাড়ি ব্লাউজ ঠাসা। লকারও আছে যথারীতি।

এখন আর লকার খুলতে কোন অসুবিধা নেই। লকারের মধ্যে পাওয়া গেল গোছাখানেক একশ আর দশটাকার নোট, ব্যাঙ্ক-বুক, চেক বুক, ফরটি থ্রি ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড, ফটো অ্যালবাম, খানপাঁচেক খামে ভরা চিঠি, ডায়রি এবং বড় আকারের স্টিলের একটা চাবি। বাসব অ্যালবামটা প্রথমে দেখে নিল —পাতার পর পাতা প্রমীলা সান্যালের নানা ভঙ্গিতে তোলা ছবি। চিঠিগুলোও একে একে পড়ল। দরকারি কিছু নয়। পারিবারিক চিঠি। এলাহাবাদ থেকে কোন মাসি বিভিন্ন সময়ে প্রমীলাকে লিখেছেন। যত্ন করে রেখে দেওয়ার সার্থকতা অবশ্য বোঝা গেল না।

ডায়রির পাতা ওল্টাতে লাগল বাসব। নিয়মিত ভাবে লেখার অভ্যাস ছিল না মহিলার। খাপছাড়াভাবে লিখেছেন। গুপ্তসাহেবের সঙ্গে কবে কোথায় গেলেন তার উল্লেখ রয়েছে। ভবানীশঙ্কর সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য আছে। প্রয়োজনীয় কোন কথা পাওয়া গেল না। বাসব এবার চাবিটা উল্টে পাল্টে দেখল। ওপর দিকে ইংরাজীতে "পি" অক্ষর খোদাই করা রয়েছে। চাবিটা পকেটে ফেলে, বাকি সমস্ত কিছু যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করল।

খানদুয়েক আলমারি আরো রয়েছে। বাসব ওগুলো খুলল না। চাবির গোছা গদির তলায় চালান করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভবানীশঙ্কর কোন্ ঘরে ঢুকেছেন আগেই লক্ষ্য করেছিল। ওখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখল, গৃহকর্তা গড়ানে চেয়ারে শ্রান্তভাবে বসে রয়েছেন। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন। তাকালেন উৎসুকভাবে।

বাসব বলল, এই চাবিটা দেখুন তো।

ভবানীশঙ্কর চাবিটা ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন।

—প্রমীলার ঘরে পেলেন এটা?

—হ্যাঁ।

—মনে হচ্ছে, এই চাবি দিয়ে বোধহয় আমার চেস্ট খোলা যাবে।

—পরীক্ষা করে দেখুন তো ?

ভবানীশঙ্কর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

ছোট একটা রাইটিং টেবিল একধারের দেওয়াল ঘেঁসে ছিল। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডান হাতটা টেবিলের তলায় চালিয়ে দিয়ে কিছু একটা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর দিকের দেওয়ালের ফুট দুয়েক অংশ দু'ভাগ হয়ে সরে গেল। আয়রন চেস্টের সামনেকার সিক্রেট অংশ দৃষ্টিগোচর হল এবার। প্রমীলার ঘর থেকে আনা চাবিটা ফোকরে ঢুকিয়ে ভবানীশঙ্কর মোচড় দিলেন। পাল্লা খুলে গেল। ভেতরটা সম্পূর্ণ খালি।

চেস্ট বন্ধ করে চাবিটা বাসবকে ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

বললেন, এই চাবিটাই তাহলে প্রমীলা তৈরি করিয়েছিল।

—তাই তো দেখা যাচ্ছে।

—চাবিটা উনি কিভাবে তৈরি করিয়েছিলেন, মানে কার সহযোগিতায় তৈরি করিয়েছিলেন—আপনি অনুমান করতে পারেন, কে হতে পারে সেই লোক ?

—এ সম্পর্কে আমারও আগ্রহ আছে। একটা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ এজেন্সিকে লাগিয়েছিলাম প্রমীলার পিছনে। তারাও অবশ্য সঠিক সংবাদ দিতে পারেনি। তবে মনে হয়, ভাদুড়ী চাবিটা সরবরাহ করেছিল।

—হতে পারে। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি এখন চলি।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ির কাছ বরাবর এসেছে, পিছন থেকে কে একজন ডাকল। ফিরে দাঁড়াতেই দেখল ডান পাশের একটা দরজার সামনে অশোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাসব আর নিচে না নেমে ওদিকেই এগিয়ে গেল। বাইরে থেকেই দেখল ঘরের মধ্যে ইরা নিশীথ আর ভাদুড়ী রয়েছেন।

আসুন মিস্টার ব্যানার্জী।

অশোকের পিছু পিছু বাসব ভেতরে গেল।

—কিছু হদিশ পেলেন ?

নিশীথের প্রশ্নের উত্তরে সোফায় বসতে বসতে বাসব বলল, জটিল আবর্তের মধ্যে আমরা পড়েছি। এত তাড়াতাড়ি হদিশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এ লাইনে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় হিমালয় ছোঁয়া। আশা তো করছি সমাধানে পেঁছাতে পারব। ভাল কথা, আপনিই বোধহয় মিস্টার ভাদুড়ী ?

গম্ভীর গলায় ভাদুড়ী বললেন, হ্যাঁ।

—আপনার বোনের এইভাবে মৃত্যু হওয়াটা সত্যিই মর্মান্তিক। গতকাল বিকেলে প্রিন্সেসে আমরা একই সঙ্গে ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়েছিল। তখন তিনি আপনার কথাও বলে ছিলেন।

—আমার কথা !

—তবে আর বলছি কি ?

ভাদুড়ীকে কিছুটা বিচলিত দেখা গেল।

—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। কি বলেছিল বলুন তো ?

বাসব বুঝল, চেহারা যতই ভারিক্কি হোক, গম্ভীর হাবভাব যতই থাকুক না কেন, আসলে মানুষটা ভীতু প্রকৃতির। তার আলগা কথায় কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন। অর্থাৎ প্রমীলা সান্যালের সঙ্গে এমন কোন কথা নিশ্চয় হয়েছিল যা গঙ্গাজলে ধোয়া নয়। কায়দা করে এখন জেনে নেওয়া দরকার, কথাটা কি।

উনি আবার বললেন, কি মশাই, চুপ করে রইলেন যে ? প্রমীলা হঠাৎ আমার নামে আপনাকে কি বলল, মানে······বলাটা তো ঠিক ··

অশোক বলে উঠল, আপনি যেন একটু ঘাবড়ে গেছেন মামা ! ব্যাপারটা কি ?

—ঘাবড়াব কেন ? কি বলেছে প্রমীলা তাই জানতে চাইছি।

বাসব বলল, বলতে আমার আপত্তি নেই। তবে এত জন লোকের সামনে বললে তা আপনার পক্ষে বোধহয় সুখকর হবে না।

নিশীথ বলে উঠল, আমরা তবে বাইরে যাই। অশোক, ইরা এস···

ভাদুড়ী বা বাসব কিছু বলার আগেই ওরা তিনজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—বলুন এবার ?

মৃদু হেসে বাসব বলল, অবশ্য আমি আপনাকেও সমস্ত কথা বলতে বাধ্য নই। পুলিশকে জানানোই কর্তব্য। তখন যদি ফ্যাসাদে পড়ে যান, তার জন্য দায়ী নিশ্চয় অন্য কাউকে করা যাবে না।

—বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু···

—দেখুন, আমি নিজে থেকে কিছু বলব না। আপনিই বলুন কি আলোচনা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে। মিসেস সান্যাল যা বলেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই।

—আমি তো কিছুই...

—যদি না বলতে চান জোর করব না। আমি শুধু চাইছিলাম হ্যারাসমেণ্টের হাত থেকে আপনি রক্ষা পান। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আপনি তা চাইছেন না। ভাল কথা। হোমিসাইড বিভাগের বড়কর্তা নিচেই আছেন। বাধ্য হয়েই এবার তাঁকে সব কথা বলতে হবে আমাকে।

নড়েচড়ে বসলেন ভাদুড়ী।

কাঁপা গলায় বললেন, প্রমীলার একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা অভ্যাস ছিল। সব দোষটা নিশ্চয় সে আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে। ব্যবসা বাড়াবার জন্য আমি ওর কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়েছিলাম ঠিকই, তবে কাউকে খুন করতে চাইনি। সেরকম মনের জোরও আমার নেই।

—আপনি বলতে চাইছেন…

—বিশ্বাস করুন, প্রমীলাই। ওই আমাকে বলেছিল, কোন একটা বিষ সংগ্রহ করে দিতে। সান্যালকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য।

—তারপর আপনি কি করেছিলেন?

—কিছুই না। আমি বরং ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম এই অন্যায় কাজ করার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

—আপনার কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করা যায় না। মিসেস সান্যাল অবশ্য অন্য কিছু বলেছিলেন। যাহোক, এখন আমি চলি। পরে আবার দেখা হবে।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় ইরা, নিশীথ আর অশোক দাঁড়িয়েছিল।

অশোক বলল, আমাদের কিছু বলবেন?

অনেকক্ষণ পরে পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, এখন আর কিছু নয়। আপনার আর নিশীথবাবুর সঙ্গে পরে আমার কথা হবে।

সামন্ত ওপরে এলেন।

—আপনি এখানে! আমি তো ভাবলাম চলে গেছেন।

—আপনাকে না বলে আর যাই কিভাবে? দেখা হয়ে গেল, এবার যাব। কাল এগারটার পর আসছি আপনার অফিসে। তখন কথা হবে।

সাড়ে এগারটা আন্দাজ বাসব লালবাজারে পৌঁছাল।

সামন্ত নিজের অফিস ঘরেই ছিলেন।

বাসব বসতে বসতে বলল, সকলের এজাহার নিয়েছেন?

—হ্যাঁ। আপনার কি ধারণা, গুপ্তসাহেব আর মিসেস সান্যালকে একই লোক খুন করেছে?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আপনি যদি প্রশ্ন করেন কেন মনে হচ্ছে, তার উত্তর এই মুহূর্তে আমার পক্ষে দেওয়া কিন্তু সম্ভব হবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, মিসেসকে খুন করার মোটিভ আমি বুঝতে পেরেছি।

—মোটিভটা কি?

—কয়েক লাখ টাকা। ওই টাকাটা মিসেস সরিয়েছিলেন নিজের স্বামীর চেস্ট থেকে। এই ব্যাপারে একজনের সহযোগিতা নিশ্চিতভাবে তাঁকে নিতে হয়েছে। নইলে নকল চাবি তৈরি করানো সম্ভব ছিল না। সেই লোক নিশ্চয় জানে, টাকাটা বাড়ির বাইরে কোথায় রাখা হয়েছে। কাজেই…

—আপনি তো অবাক করে দিচ্ছেন মশাই। কয়েক লাখ টাকার কথা যা বললেন—এ সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানি না।

বাসব চুরি সম্পর্কিত সমস্ত কিছু বলল।

সামন্ত বললেন, আপনি বলতে চাইছেন সেই সাহায্যকারী পুরো টাকাটা মেরে

দেবার জন্য শ্রীমতীকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, এই তো ?

—অবশ্য সত্যি যদি কোন সাহায্যকারী থেকে থাকে। ওকথা এখন থাক। ওবাড়ির চাকর বাকরদের বক্তব্য আমার জানা দরকার। এজাহারের খাতাটা এখানে আছে নাকি ?

—আছে।

সামন্ত একটা মোটা খাতা টেবিলের ওপর থেকে তুলে এগিয়ে ধরলেন। বাসব পাতা উল্টে উল্টে জায়গা মত পৌঁছাল। সামন্ত কি একটা লিখতে আরম্ভ করলেন। মাঝে কোথায় একটা ফোন করলেন। এইভাবে মিনিট দশেক কেটে গেল। বাসব পড়া শেষ করে খাতাটা আবার টেবিলের ওপর রাখল।

—কি বুঝলেন ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, একটা পার্টিকুলার পেয়ালাতে মৃত্যু-রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে।

—আমারও তাই ধারণা। তবে এখানে বড় রকম একটা প্রশ্ন আছে। হত্যাকারী মিসেস সান্যালের পেয়ালায় বিষ মেশাল কখন ?

—নিশ্চয় আমাদের সামনে নয় ?

—কখনোই নয়। উজ্জ্বল আলোর মধ্যে এতজোড়া চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। রান্নাঘরেই কারচুপি হয়েছে। হত্যাকারী জানত সেই বিশেষ পেয়ালার কথা, যাতে নিয়মিত মিসেস সান্যাল চা বা কফি খেতেন। কাজটা অবশ্য বেয়ারা বা রাঁধুনিকে দিয়েও করানো হয়ে থাকতে পারে।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না। গুপ্তসাহেবকেও যদি এই লোক খুন করে থাকে, তবে তার চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। কাজেই এমন একজন নিজের বিরুদ্ধে বেয়ারা বামুনের মত স্থূল সাক্ষীকে খাড়া রাখবে না। ব্যাপারটা ঘটেছে অন্য কোন উপায়ে। আমাদের আরো তলিয়ে ভাবতে হবে।

বাসব পাইব ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলল, আজ সন্ধ্যার মধ্যে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া যাবে ?

—যেতে পারে। তবে কিছু ইনফরমেশন আপনাকে এখনই দিতে পারি।

—যথা…?

আজ সকালেই কাটা-ছেঁড়ার কাজটা শেষ হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ? অফিসিয়াল রিপোর্ট যথাসময়ে আসবে। আন-অফিসিয়ালি জানতে পেরেছি, মিসেস সান্যালের পাকস্থলীতে যে বিষ পাওয়া গেছে তা বৃটিশ ফার্মোকোপিয়ার তালিকায় নেই। অর্থাৎ এমন কিছু দিয়ে ওঁকে মারা হয়েছে যা একেবারেই পরিচিত নয়।

—দেশী পদ্ধতিতে তৈরি কোন বিষ ?

—হয়ত তাই।

—হত্যাকারীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আরেকবার আমরা পাচ্ছি। সায়নাইড বা কুইক অ্যাকশন করে এমন বিষ সংগ্রহ করার ঝামেলা অনেক। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে প্রেসক্রিপশন জোগাড় করতে হয়, দোকানে গিয়ে কিনতে হয়—অর্থাৎ কিছু ঝামেলা এবং সাক্ষীকে নিজের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। কাজেই সে এমন এক দেশজ বিষের সহযোগিতা নিয়েছে যাতে কোন ঝামেলা না হয়।

—এতে আমাদের ঝামেলা তো বাড়ল?

—তা একটু বাড়ল? ভাল কথা। সংশ্লিষ্ট সকলের একখানা করে ফটোগ্রাফ আমার দরকার হবে।

—হঠাৎ…

—পরে আপনাকে বলব সব কথা। পাওয়া যাবে কিনা বলুন?

—কেন পাওয়া যাবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংগ্রহ করছি।

বাসব পকেট থেকে চেস্টের নকল চাবিটা বার করল।

—এই চাবিটা মিসেস সান্যাল তৈরি করিয়েছিলেন। ভবানীশংকরের চেস্ট দামী ও নামী কম্পানির। কোন সাধারণ চাবিওয়ালা ওই চেস্টের নকল চাবি তৈরি করে দিতে পারবে না। বৃত্তটা একটু ছোট হয়ে এল। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, এই বিশেষ চাবিটা সেফ কম্পানির কোন কর্মচারি তৈরি করে দিয়েছে।

চাবিটা হাতে নিতে নিতে সামন্ত বললেন, আপনি তো ক্রমেই আমায় অবাক করে দিচ্ছেন মশাই। তলায় তলায় অনেকটা এগিয়ে গেছেন দেখছি। অফিসিয়ালি অবশ্য সেফ কম্পানির কোন কর্মচারি অন্য কাউকে চাবি তৈরি করে দেবে না। তবে আন-অফিসিয়ালি করে দিয়ে থাকতে পারে।

—কোন উপায়ে সেটা আমাদের জানতে হবে। চাবির ওপর 'পি' অক্ষর খোদাই করা রয়েছে দেখেছেন। এর মানেটা কি? অকারণে অক্ষরটা নিশ্চয় খোদাই করা হয়নি।

—সেফ কম্পানিতে গেলে হয়ত আমরা কিছুটা আলোর আভাষ পাব। কম্পানির নামটা জানেন?

জানি। সেফের ওপর লেখা ছিল ঃ 'ওয়েস্টার্ন লকার্স'।

—শুভস্য শীঘ্রম। চলুন, এখনই ওয়েস্টার্ন লকার্স-এ যাওয়া যাক। ওহোঃ, ঠিকানাটা জানা দরকার। টেলিফোন গাইডে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

টেবিলের ওপরই গাইড ছিল। সামন্ত পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলেন। ঠিকানা পেতে অসুবিধা হল না। কম্পানির অবস্থান ব্রাবোর্ন রোডে। দোতলা থেকে নেমে বাসবকে নিয়ে জিপে চাপলেন সামন্ত। গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে এরপর কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। একটা ছ'তলা বাড়ির দোতলায় অফিস। কার্ড পেয়েই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ম্যানেজার ছুটে এলেন। নানা কারণে

পুলিশকে সমীহ করে চলতেই হয়।

সামন্ত বললেন, সামান্য কথা ছিল। কোন নিরিবিলি জায়গায় কয়েক মিনিটের জন্য বসতে পারি কি?

—নিশ্চয়। আসুন আমার ঘরে।

ম্যানেজার দুজনকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

—বলুন এবার কি সেবা করতে পারি?

—সেবা তো আমরাই জনসাধারণের করে থাকি। আপনার কাছ থেকে চাই সহযোগিতা। কিছু ইনফরমেশন চাই আর কি। দেখুন তো এই চাবিটা।

চাবিটা হাতে নিয়ে ম্যানেজার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

আপনাদের এক ধরনের সেফ এই চাবি দিয়ে খোলা যায়। বাসব বলল, এই চাবিটা কবে সাপ্লাই করা হয়েছে রেকর্ড দেখে যদি বলেন।

—সেফ-এর ওনারের নাম না জানলে বলা শক্ত। তবে একটা কথা, এ চাবিটা আমরা সাপ্লাই করিনি। আমাদের কাজ আরো পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া 'পি' অক্ষর খোদাই করা রয়েছে। মনে হয় এই চাবিটা তৈরি করেছে পরিমল তালুকদার। ব্যাপারটা কি বলুন তো?

সামন্ত বললেন, গুরুতর কিছু নয়। পরিমল তালুকদার কে?

—আমাদের একজন প্রাক্তন কর্মী। চাবি বিভাগের প্রধান ছিল, পক্ষাঘাতে পা দুটো অসাড় হয়ে যাওয়ায় অবসর নিয়েছে। এখন বাড়িতে বসে খদ্দেরের তালা মেরামত করে চাবি বানায়।

—'পি' অক্ষর খোদাই করা রয়েছে কেন?

—ওটা পরিমলের ট্রেডমার্ক।

—পরিমলের ঠিকানাটা কাইন্ডলি দেবেন?

—বদ্যিবাটীতে থাকে। কি হয়েছে এখনও কিন্তু পরিষ্কার করে বললেন না। পরিমলের তৈরি করা চাবি দিয়ে কোথাও বড় রকমের চুরিটুরি হয়েছে নাকি?

—ওই রকমই কিছু। পরে খবর পাবেন। ঠিকানাটা…

ম্যানেজার ঠিকানা লিখে দিলেন। ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিল।

এর পরের দুটো দিন বাসবের অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটল।

তৃতীয় দিন একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় গা ঢেলে দিল। ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে এটা প্রয়োজন। কেসটার সম্পর্কে খুঁটিনাটি চিন্তা করতে করতে ঘুম এসে পড়ল। ওর নিশ্চিত ধারণা, এই রহস্যজনক ঘটনা-প্রবাহের জট খুলে আসতে আর খুব বেশি সময় লাগবে না।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভাঙল বাসবের।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে কয়েক মিনিট কি সমস্ত চিন্তা করল। বাহাদুর কর্তার মেজাজটা ঠিক জানে। চা দিয়ে গেল।

তারিয়ে তারিয়ে চাটা শেষ করার পর বাসব উঠে পড়ল। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। জামা কাপড় বদলে সবেমাত্র ড্রইংরুমে এসে দাঁড়িয়েছে—ফোন সরব হয়ে উঠল।

বিরক্তির ছায়া পড়ল বাসবের মুখে।

ফোন-স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো…

……

—নমস্কার মিঃ সান্যাল—খুব একটা কিছু ব্যস্ত নেই—কি ব্যাপার…

……

—আসতে পারি…

……

—কোথায় বললেন—অফিসে—বেশ—বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেছে কি…

……

—ঠিক আছে—আসছি—এমনিতেই আপনার অফিসে একবার যাবার ইচ্ছে আমার ছিল—আধ ঘণ্টার মধ্যে পেঁছোব—ছাড়লাম…

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে গ্যারেজ থেকে বার করে আনল 'ওল্ডস মোবাইল'কে। কয়েক বছর ধরে চমৎকার সার্ভিস দিচ্ছে। বাসবের মনে পড়ে গেল, গাড়িটা পেয়েছিল সে একটা জটিল কেসের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটানোর পুরস্কার স্বরূপ। এমন দরাজদিল মক্কেল সচরাচর চোখে পড়ে না। হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীট পেরিয়ে চৌরঙ্গীতে পড়ার পরই ও ময়দানের পথ ধরল।

কয়েকটা ফুটবল টেণ্ট একপাশে ফেলে বাসব গঙ্গার ধারে এসে পেঁছাল। একদল বেদে আড্ডা গেড়েছে পোর্টকমিশনার্স-এর লাইনের ধারে। প্রতিবছরই এই সময় এদের কোন না কোন দলকে এখানে দেখা যায়। বেদেদের পাশ কাটিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডের কিছুটা মাড়িয়ে বাসব হেয়ার স্ট্রীটের মোড়ে পেঁছে গাড়ি থামাল। সিমেণ্ট রং-এর পাকা-পোক্ত বাড়িটাতেই রয়েছে ভবানীশঙ্করের অফিস।

ওদিকে…

সুইভিল চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে রয়েছেন ভবানীশঙ্কর। টাইনট কিছুটা ঝুলে পড়েছে। চুল উস্কোখুস্কো, যেন মনে হয় মনের মধ্যে বিরামহীন ঝড় চলেছে। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারের চেয়ারগুলো অধিকার করে রয়েছে অশোক, নিশীথ, ইরা এবং বিরূপাক্ষ দস্তিদার। কারুর মুখেই কথা নেই। সকলেই কেমন অন্যমনস্ক।

সিগার ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সান্যাল।

সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করে বললেন, অশোক, সামনের উইকের প্রথম দিকে কোন ফ্লাইটে জেনিভার একটা টিকিট বুক কর।

বিস্মিত গলায় অশোক বলল, কাকা, আপনি···

—হ্যাঁ। আমি ইউরোপ চলে যেতে চাই। কয়েক মাস ওখানেই ঘোরাঘুরি করব। কলকাতা আর ভাল লাগছে না। এই প্ল্যানটা অবশ্য তোমার কাকিমা মারা যাবার আগেকার। সোম কি মঙ্গলবার হলেই ভাল হয়। মনে হয়, এয়ার ইন্ডিয়ায় জায়গা পাওয়া যাবে।

নিশীথ কম অবাক হয়নি।

বলল, পুলিশ কি এখন আপনাকে যাওয়ার অনুমতি দেবে? কেস দুটোর এখনও কোন নিষ্পত্তি হয়নি। মানে···

—পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে আশা দিয়েছেন। মনে হয় শনিবারের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অশোক···

—আজ্ঞে···

—হুন্ডিওয়ালা চৌরাসিয়াকে খবর দাও। কিছু টাকা পয়সা তো ওখানে আমার দরকার হবে। কি রকম ব্যবস্থা করতে পারে দেখি।

—চৌরাসিয়া ভাল ব্যবস্থাই করতে পারবে। রোম, জেনিভা আর লন্ডনে ওদের এজেন্ট আছে। কাল সকালেই ওকে আসতে বলব।

বেয়ারা কার্ড হাতে প্রবেশ করল। সান্যাল কার্ডের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করল বাসব। সান্যাল সাদর আহ্বান জানিয়ে ওকে বসতে অনুরোধ করলেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, ফোনে তো বললেন, বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। তবু জরুরি তলব? কারণ একটা নিশ্চয় আছে?

—আমি কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছি। আমার ধারণা ছিল, আপনি যখন কেসটা টেকআপ করেছেন, তখন সমাধান তাড়াতাড়ি হবে। এখন দেখছি সমাধান হওয়া দূরের কথা, সমস্ত কিছু আগেকার মতই জট পাকিয়ে রয়েছে।

বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে বাসব বলল, সময় একটু লাগছে অস্বীকার করি না। তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমি গুপ্ত মার্ডার কেসটা টেকআপ করেছিলাম, মাঝ থেকে মিসেস সান্যাল মারা পড়ে জটিলতা বাড়িয়েছেন। অবশ্য চিন্তার কোন কারণ নেই। সমাধানের কূলে পৌঁছবই। অনুগ্রহ করে এখন বলবেন কি, অধৈর্য হয়ে পড়ার এটাই কি একমাত্র কারণ, না আর কিছু আছে?

—আমি কন্টিনেন্ট ট্যুরে যেতে চাই। কলকাতা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। আপনি জানেন মিস্টার ব্যানার্জী প্রমীলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। তার মৃত্যুতে আমার খুশি হবারই কথা। কিন্তু কেন জানি না, সেরকম কিছু মনের মধ্যে এখনো খুঁজে পাচ্ছি না। পুলিশ অবশ্য বিদেশ যাবার অনুমতি দেবে। তবে তার আগে যদি প্রমীলার হত্যাকারীকে জানতে পারতাম, তবে

কিছুটা শান্তি পাওয়া যেত।

—কবে আপনি বাইরে যেতে চান?

—সামনের সপ্তাহে।

—পুলিশ কতদূর এগুলো জানতে পেরেছেন?

—ভরসা দিয়ে যাচ্ছে এই অবধিই।

ইরা বহুক্ষণ থেকেই চুপ করে আছে।

এবার বলল, একটা ব্যাপার একেবারেই মাথায় ঢুকছে না। পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যেকের ফোটোগ্রাফ চাওয়া হয়েছে এর মানে কি?

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আমিই পুলিশকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আপনাদের প্রত্যেকের এক কপি করে ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করতে।

এই কথা শুনে সকলেই অবাক হলেন।

নিশীথ বলল, নিশ্চয় কোন কারণ আছে? আপনার অসুবিধা না থাকলে কারণটা অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

—কারণ একটা আছে বইকি। বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই—স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে গেলে অবশ্য অনেক কথাই বলতে হয়। সেদিন রাত দশটার সময় অলকা নামে একটি মেয়ের গুপ্তসাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অলকা ঠিক সময় তাঁর ফ্ল্যাটে পেঁছিয়। তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অলকাকে বিদায় করেন। এদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে। অলকাকে অনুসরণ করে ওখানে গিয়েছিল দীপেন বলে একটি ছেলে। অলকা চলে যাবার পরই সে গুপ্তসাহেবের সঙ্গে দেখা করে। তখন দশটা কুড়ি।

ইরা দ্রুত গলায় বলল, তা কি করে সম্ভব? দশটা কুড়ির অনেক আগেই আমরা গুপ্তসাহেবকে মৃত অবস্থায় নিজেদের বিছানায় দেখেছি।

—এতে কি প্রমাণ হচ্ছে? প্রমাণ হচ্ছে—অলকা আর দীপেন যাকে দেখেছে, সে গুপ্তসাহেব নয়, সেই হল আসল লোক। অর্থাৎ হত্যাকারী।

অশোক বলল, ফটোগ্রাফের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

—গভীর। অলকা হত্যাকারীকে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু দীপেন সময় পেয়েছিল বেশি। সে ভালভাবেই চিনে রেখেছে লোকটাকে। এই কেসের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, প্রত্যেকের ফটোগ্রাফ তাই চেয়েছি। দীপেন চিনে বলতে পারবে হত্যাকারী কে।

ভবানীশঙ্কর বললেন, যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। আচ্ছা, দুটো খুন কি একই লোক করেছে বলে আপনার মনে হয়?

—নিশ্চয়। উদ্দেশ্য রয়েছে যে।

—উদ্দেশ্য!

—আপনার চুরি যাওয়া কয়েক লাখ টাকা। কথাটা হচ্ছে, টাকাটা হজম

করতে গেলে মিসেস সান্যালকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হয়। দুঃখ রয়ে যায় গুপ্তসাহেবের জন্য—ঘটনার আবর্তে পড়ে বেচারা মারা পড়লেন।

—কি রকম?

—সে কথা পরে বলব। ফোনটা একটু ইউজ করছি।

টেবিলের ওপরে রাখা ফোনের রিসিভার বাসব তুলে নিল।

নাম্বার ডায়েল করার পর কানেকশান হতেই বলল, লালবাজার—পুরন্দর সামন্ত আছেন—বিশেষ জরুরি—ঠিক আছে—ধরছি···

······

—হ্যালো—মিঃ সামন্ত—বাসব কথা বলছি···

—ঘণ্টা কয়েক আগে আপনাকে ফোন করার সময় একটা কথা জেনে নেওয়া হয়নি—আমি মিস্টার সান্যালের অফিসে রয়েছি এখন—ওঁরা নিজেদের ফটোগ্রাফ নিশ্চয় কালকের মধ্যেই পাঠাবেন···

······

—ভাদুড়ী আর মিস্টার সেনেরটা সংগ্রহ করেছেন—সবগুলো পাওয়া গেলে আমায় পাঠিয়ে দেবেন—শুনুন, যে জন্যে আপনাকে ফোন করছি—দীপেন পালিতের ঠিকানাটা দিন তো ··

······

—কি বললেন—সাঁইত্রিশের বি রুদ্রনারায়ণ সেন লেন—কলকাতা পাঁচ—ঠিক আছে—এখন ছেড়ে দিচ্ছি—পরে দেখা হবে···

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা চিন্তিত হবেন না। কালকের মধ্যেই বিহিত করে ফেলতে পারব আশা করছি। এবার উঠি···

সান্যাল বললেন, বিশেষ তাড়া না থাকলে···

—একটু তাড়া আছে। দীপেন পালিতকে একবার খুঁজে বার করা দরকার! ভাবছি, ওকে আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আসতে বলব।

—আপনার বাড়িতে কেন?

—ওর সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলা দরকার। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ওই লোকটাই এখন ট্রাম্পকার্ড। কাল এই সময় আপনার ওখানে আসছি চলি

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—দীপেন সবেমাত্র বাড়ি ফিরল।

এখন রাত প্রায় আটটা।

অফিস থেকে ফিরেছে যথা সময়েই। আড্ডা দিতে বেরিয়েছিল তারপর। অলকাদের মেসের সামনে ঘোরাঘুরি করেছে কয়েকবার। দেখা হয়নি। আজ দুদিন

তার দেখা নেই। অলকার ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে ও কি চায় তা জানা দরকার। জামা-কাপড় বদলাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। কে এল আবার ?

দীপেন গিয়ে দরজা খুলল।

একজন স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাদামাটা সাজপোশাক।

—এখানে দীপেন পালিত থাকেন ?

—আমার নাম। বলুন ?

—আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা ছিল। দয়া করে একবার বাইরে আসবেন।

বিস্মিত দীপেন কিছু না বলে বাইরে এল। তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলল লোকটাকে। এখন তার মনে পড়ছে, গত সাক্ষাতের সময় বাসববাবু বলেছিলেন, এই রকম একটা কিছু ঘটতে পারে। এরপর কি করতে হবে তাও তার জানা। কিছুক্ষণ চলার পর ওরা এসে থামল একটা পাব্লিক ফোনের সামনে।

—মোটা টাকা রোজগার করতে চান ?

দীপেন তাকাল লোকটার দিকে।

—চান কিনা বলুন ?

—পরিশ্রম ছাড়াই যদি পাওয়া যায় ক্ষতি কি ?

—ঠিক কথা।

লোকটা পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করল।

—এতে নাম আর ফোন নম্বর আছে। রিং করুন। টাকার ব্যবস্থা হবে।

দীপেন কিছু না বলে চিরকুটটা হাতে নিল।

কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই এনায়েৎ এসে উপস্থিত হল। আলাদিনের জীন-এর মতই তার এই আবির্ভাব। শৈবালও নেমে পড়েছিল। বাসব দ্রুত হাতে গাড়ির দরজায় চাবি লাগাল। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। তবে ট্রাক বা প্রাইভেট কার শব্দ তুলে যাওয়া আসা করছে। ওরা তিনজন নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

বাসবের সি মাস্টারে এখন নটা পাঁচ।

—এখনোও কেউ আসেনি তো ?

এনায়েৎ বলল, না।

—পুলিশ ?

—ওরা এসেছে। ছড়িয়ে আছে চারিধারে।

তিনজনে একটা বাড়ির পিছন দিকে এসে দাঁড়াল। দেখা গেল সামন্ত

সেখানে রয়েছেন। বাসব কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থেমে গেল। একজন ফুটপাথ ধরে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে। স্ট্রীট লাইটের আলোয় চেনা গেল তাকে—দীপেন। তিনজনে অবশ্য আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ক্রমে দীপেন অতিক্রম করে গেল।

সে থামল বাড়িটার সামনে গিয়ে। প্রায় তখনই একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছিল কিছু দূরে। ট্যাক্সি থেকে নেমে একজন এগিয়ে গেল। দীপেনের সঙ্গে কি সমস্ত কথা হল তার। এতদূরে থেকে শুনতে পাওয়া গেল না। দুজনে ঢুকে গেল ভেতরে। এবার চনমনে হতে দেখা গেল বাড়ির পিছন দিকে যারা সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল তাদের মধ্যে।

—আর দেরি করা ঠিক হবে না। আসুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে সামন্ত বললেন, যাবেন কিভাবে? ওরা তো ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেবে।

—ক্ষতি নেই। পিছন দিকের দরজার চাবি আমার কাছে আছে।

—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। চাবিটাও জোগাড় করেছেন!

বাসব আর কিছু না বলে প্যাসেজের মধ্যে এগিয়ে গেল খানিকটা। এনায়েতের হাতের টর্চ জ্বলে উঠেছে। দরজা পেতে দেরি হল না। দ্রুত হাতে বাসব তালা খুলল। নিঃশব্দে চারজনে যে-ঘরে পা দিল, মাঝারি সাইজের ক্যান্টিন ছাড়া সেটা আর কিছু নয়। লম্বা টেবিলের উপর মামুলি ধরনের একটা বিছানা দেখতে পাওয়া গেল। মনে হয় যে-দরোয়ান রাত্রে এখানে পাহারা থাকে, সে এখানেই শোয়। এখন নেই—কোথাও গিয়ে থাকবে।

ওই ঘর পার হতেই প্যাসেজ পাওয়া গেল।

প্যাসেজ শেষ হয়েছে হলে। হলের চারপাশে ঘর। বলতে গেলে সকলের দৃষ্টি একই সঙ্গে আটকালো গিয়ে দক্ষিণ দিকের একটা ঘরের দরজার ওপর। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে এসে পড়েছে। সকলে পায়ে পায়ে এগলো। কাছাকাছি পৌঁছতেই কানে এল কথাবার্তার আওয়াজ। ঘরে দুজন লোকের মধ্যে কথা হচ্ছে।

বাইরের সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

প্রথমজন: আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কি ভাবে?

দ্বিতীয়জন: ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি। কাল দুপুরে এধারে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আপনি ট্যাক্সি থেকে নেমে এ বাড়িতে ঢুকছেন। আপনাকে চিনতে অসুবিধা হল না। তারপর খোঁজটোজ নিতেই···

প্রথমজন: হুঁ। চুপ করে থাকার দাম কত চাইছেন?

দ্বিতীয়জন: পঞ্চাশ হাজার।

প্রথমজন: তার আগে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি অনেক কিছু জানেন। বুঝতেই পারছেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা খোলামকুচি নয়।

দ্বিতীয়জন : আমি এত ঘোরাল ব্যাপারের মধ্যে যাব না। গুপ্তসাহেবের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আপনি সেদিন আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে প্রায় খুন করে ফেলেছিলেন। আরো অনেক কিছু জানি।

প্রথমজন : আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। বেশ, টাকা দেব। পঞ্চাশ হাজার অবশ্য এখন কাছে নেই। হাজার বিশেক এখন নিন।

চেয়ার সরানোর শব্দ হল। কেউ বোধহয় উঠে দাঁড়াল।

আবার প্রথমজন : বসুন। টাকাটা বার করি।

কয়েক সেকেন্ড বিরতি।

তারপরই ক্ষীণ আর্তনাদ—গুরুভার কিছু পড়ার শব্দ। বিদ্যুৎ বেগে বাসব ঘরে প্রবেশ করল। তার পিছু পিছু সামন্ত, শৈবাল এবং এনায়েৎ। হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে দীপেন, আর দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে একজন ওর গলায় বুটিদার একটা টাই জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

—আরেকটা খুন আর করবেন না অশোকবাবু।

বাসবের কথায় চমকে উঠে দাঁড়াল অশোক। ভয় আর বিস্ময় একই সঙ্গে তার মুখে ওঠানামা করছে। শৈবাল দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দীপেনের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্যস্ত হল।

—এ সমস্তর মানে কি? অশোক রাগে প্রায় ফেটে পড়তে চাইল।

—আমি জানতে চাই এখানে আপনারা কেন এসেছেন?

—বললাম তো—বাসব বলল, আরেকটা খুন যাতে আপনি না করতে পারেন। যা কিছু ডিফেন্স তা অবশ্যই আপনি কোর্টে নেবেন। তবে এখন জানিয়ে রাখি, গুপ্তসাহেব ও মিসেস সান্যালকে খুন এবং দীপেন পালিতকে খুন করতে যাওয়ার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য দীপেন একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। এছাড়া চাবিওয়ালা পরিমল আপনাকে সনাক্ত করবে। গুপ্তসাহেবের ফ্ল্যাটের চতুর্দিকে—আপনার অজস্র হাতের ছাপ কেন পাওয়া গেছে তার সদুত্তর নিশ্চয় নেই—আপনি দিতে পারবেন না।

অশোক কিছু বলতে গিয়েও থামল।

—যার জন্য এত কান্ড, সেই কয়েক লাখ টাকা এই অফিস বাড়িরই কোথাও পাওয়া যাবে। লুকিয়ে রাখার পক্ষে এটাই হল আদর্শ জায়গা। পোর্ট কমিশনার্সের লাইনের ধারে একদল বেদে আড্ডা গেড়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নাম না জানা যে বিষ দিয়ে আপনি মিসেস সান্যালকে সরিয়েছেন, তা সংগ্রহ করেছেন ওদের কাছ থেকেই। পুলিশ অবশ্যই ওদের নেড়েচেড়ে দেখবে। যাহোক, এবার আমার কাজ শেষ। মিস্টার সামন্ত আসামী হাজির।

বাসব পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করল।

টেবিলের ওপর দু-হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

ক্লান্তভাবে মাথা ঝুলে পড়েছে। পুরন্দর সামন্ত ওর দিকে এগোলেন।

সন্ধ্যার মুখেই সুজাতার ড্রইংরুম জমজমাট।

গৃহকর্তা সোফায় হেলে বসে সিগার টানছেন। তাঁকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে। পাশের দুটি আসন অধিকার করে রয়েছেন সেন আর দস্তিদার। ভাদুড়ীও এসেছেন। তাঁর মুখে কিন্তু কিন্তু ভাব। ইরা আর নিশীথ ওঁদের সামনা সামনি বসে। ঘটনার গতিতে ওরা কিছুটা বিভ্রান্ত। বলা বাহুল্য, আসরের মধ্যমণি হয়ে আছে বাসব। শৈবালও রয়েছে।

অশোক ধরা পড়ার পরের সন্ধ্যা এটি।

সান্যাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। অশোককে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছিলাম। ব্যবসা যে তাকেই দিয়ে যাব তা সে জানত। এরপরও এই সমস্ত কাণ্ড সে কেন করতে গেল।

—এর দুটো কারণ থাকতে পারে—বাসব বলল, এক, উইল না হওয়া পর্যন্ত আপনার কথায় সে আস্থা রাখতে পারেনি। দুই, মুঠোর মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা এসে যাবার পর টাকাটা হাতছাড়া করতে আর মন চায়নি। ভেবেছিল, ব্যবসা যখন হাতে আসবে আসুক। এখন এই বিশাল অঙ্কের টাকাটা হাতিয়ে না নেওয়াটা বোকামি।

সেন বললেন, সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্ভাগ্যজনক। মিস্টার ব্যানার্জী, এবার আপনি আমাদের ভেতরের সমস্ত কিছু অনুগ্রহ করে খুলে বলুন।

—ঘটনার প্রকৃত রূপরেখা কি ছিল তা একমাত্র বর্ণনা করতে পারে অশোক। কিন্তু তার মুখ থেকে সে সমস্ত কথা আমরা কোন দিনই হয়ত জানতে পারব না। আমি তদন্তের গভীরে প্রবেশ করার পর ঘটনার নেপথ্যে যে গতি-প্রকৃতি আছে, তা আঁচ করে নিলাম। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে এইটুকু বলতে পারি, আমার অনুমান বাস্তবধর্মীই হবে। সে কথাটা বলি এবার।

বাসব পাইপ ধরাল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, মিসেস সান্যাল টাকাটা সরাবার পরিকল্পনা যখন করলেন, তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি যে একজন সহকারী ছাড়া একাজ করা যাবে না। সহজেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল অশোকের ওপর। বাইরের কারুর ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। তাছাড়া অশোক কাকার ওপর খুব তুষ্ট নয়। কাজেই ওকে হাত করতে অসুবিধা হবে না। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। অশোককে শ্রীমতী ম্যানেজ করে ফেললেন। বিশ পঞ্চাশ হাজার দেওয়া হবে এই রকম একটা কিছু রফা হল বোধহয়। অশোক কাজে নেমে পড়ল। সে জাত-অপরাধী নয়, লোভে পড়ে অপরাধের পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। কাজেই যতটা সাবধান হওয়া প্রয়োজন ততটা সাবধানতা অবলম্বন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যাহোক, সে সহজেই চাবি তৈরি করে আনল। টাকা সরিয়ে ফেলতে মিসেস সান্যালের কোন অসুবিধা হল না। এরপরের সমস্যা হল টাকাটা কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়। বাড়িতে রাখাটা রিস্ক।

খোঁজাখুঁজি করে মিস্টার সান্যাল সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন। স্বাভাবিক কারণেই টাকা লুকিয়ে রাখার ভার পড়ল অশোকের ওপর। আমার বিশ্বাস, অফিস বাড়িতে অশোকের ঘর ভাল ভাবে খুঁজে দেখলে টাকাটা পাওয়া যাবে।

বাসব থামল।

সকলের দৃষ্টি ওর ওপর।

—এবার অশোকের মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। টাকাটা সে হজম করে যাবে এটাই হল মূল কথা। কিন্তু এই কাজের প্রধান বাধা হলেন মিসেস সান্যাল। বাধা দূর করার সঠিক পন্থা একটাই—ওঁকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া। নিশীথবাবুর বিয়েটা এই কাজের বেশ সহায়ক হল। কালীঘাটে বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় ইরাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণেই অশোকের কাছে ছিল। ব্যাগ থেকে ফ্ল্যাটের চাবিটা বার করে নিতে অসুবিধা হয়নি। বিয়ের পর ওঁরা হোটেল ইত্যাদিতে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন জানা কথা। এই সময়টুকু কাজে লাগাতে হবে। অশোক 'ফরটি থ্রি' ক্লাবে ফোন করে মিসেস সান্যালকে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা জানাল। এবং এখনই ওখানে আসছে একথা বলতেও ভুলল না। আপনারা নিশ্চয় এবার বুঝতে পারছেন প্ল্যানটা কি ছিল? কিন্তু তখনও কয়েক দিন আয়ু ছিল মিসেসের। অশোক ক্লাবে পৌঁছে দেখল তিনি কাকার সঙ্গে বাড়ি চলে গেছেন। অগত্যা নিরাশ হয়ে ওখান থেকে ফিরতে হল। গুপ্তসাহেবের গাড়ি থেকে নেমে সে গেল চৌরঙ্গীতে। গুপ্তসাহেব মিস্টার সেনকে বাড়িতে ড্রপ করে আবার কোন প্রয়োজনে চৌরঙ্গীতে এলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, ওই জনসমুদ্রের মধ্যেও অশোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। মনে হয় গুপ্তসাহেব এই সময় টাকার কথাটা তুলেছিলেন। তিনি হয়ত বলেছিলেন, ভবানীশংকরবাবুর চেস্ট থেকে টাকা সরাবার কথা তিনি জানেন। প্রমীলার সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। শেষে স্থির হয়েছে টাকাটা অশোকের কাছে থাকাটাও ঠিক হবে না। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুপ্তসাহেব সমস্ত টাকা অন্য কোন গুপ্তস্থানে স্থানান্তরিত করবেন।

অশোক প্রমাদ গুণল। এই উটকো ঝামেলা দেখা দেবে, কল্পনার বাইরে ছিল। মিসেসকে মেরে ফেললে সহজেই গুপ্তসাহেব বুঝতে পারবেন কাজটা কার। তখন হাঙ্গামার অন্ত থাকবে না। কাজেই গুপ্তসাহেবের ব্যবস্থা করা দরকার। অশোকের লোভাতুর মরীয়া মন তখন সব বাধা অপসারিত করতে প্রস্তুত। প্রকাশ্যে সে কিন্তু গুপ্তসাহেবের কথায় সায় দিয়ে গেল। এখন প্রশ্ন উঠবে, গুপ্তসাহেব নিশীথবাবুর ফ্ল্যাটে গেলেন কেন? অশোক নিশ্চয় এমন কিছু বলেছিল যাতে তিনি ওখানে না গিয়ে থাকতে পারেননি। হয়ত বলেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই কাকিমা বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে যাবেন ওখানে। আপনিও চলুন, টাকা হস্তান্তরের কথাটা এখনই হয়ে যেতে পারবে ইত্যাদি।

এরপর অশোকের কাজ করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। এই খুনের জন্য সে

বাড়তি কিছু সুবিধাও পেয়ে গিয়েছিল। সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। এই সঙ্গে সান্যাল পরিবারের পরিবেশ তালগোল পাকিয়ে গেল। দ্বিতীয় খুনটা সম্পন্ন হল অতি সহজেই। এই পরিকল্পনায় কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। সকলের সামনে মারা পড়লেন মিসেস সান্যাল! ড্রইংরুম থেকে অশোক ডাকতে গিয়েছিল মিসেসকে। ওই ফাঁকেই সে কাজ সেরেছে। ভাগ্যক্রমে পাচক তখন রান্নাঘরে ছিল না। যে বিশেষ পেয়ালায় মিসেস চা খেতেন, তার মধ্যে একচুটকি বিষ ফেলে দেওয়া হল। পরে পেয়ালায় চা ঢালবার সময় পাচকের কোন বৈলক্ষণ্য চোখে পড়েনি। বিশেষ গুঁড়ো নিশ্চয় সাদা রং-এর ছিল। পেয়ালার ভেতরকার রংয়ের সঙ্গে মিশে থাকায় চোখে কিছু না পড়াই স্বাভাবিক।

একটানা এতক্ষণ বলার পর বাসব থামল।

নিশীথ প্রশ্ন করল, আপনি অশোককে সন্দেহ করলেন কি ভাবে?

—সে কথাতেই এবার আসছি। আপনার ফ্ল্যাটের দুটো চাবি ছিল। একটা আপনার কাছে, আর একটা আপনার স্ত্রীর কাছে। আপনারটা আপনার কাছে ছিল, অথচ আপনার স্ত্রীরটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে মৃতদেহ আপনাদের বিছানায় শোয়ানো। এর অর্থ হচ্ছে, আপনার স্ত্রীর চাবি দিয়ে হত্যাকারী ফ্ল্যাটের দরজা খুলেছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, কার পক্ষে চাবিটা সরানো সব থেকে সহজ। বলা বাহুল্য—অশোক। সে ছাড়া বিয়ের সময় কাছের মানুষ আর কেউ ছিল না। ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি তার কাছে রেখেই ইরাদেবী বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সে সহজেই চাবিটা বার করে নিয়েছে। সন্দেহ দানা বাঁধল। আরো দৃঢ় হল টাকা চুরির ব্যাপারটা শুনে। চাবি তৈরি করানো এবং টাকা লুকোনোর ব্যাপারে মিসেস সান্যাল এমন একজনের ওপর স্বাভাবিক কারণেই নির্ভর করবেন, যে বশংবদ হবে, সামান্য প্রাপ্তিযোগের বিনিময়ে কাজ করবে এবং মিস্টার সান্যালের প্রতি বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন হবে। বুঝলাম, এমন লোক অশোক ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। অলকা আর দীপেনকে ইতিমধ্যে আমি খুঁজে বার করেছিলাম। প্রথম দিন দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা হল নিয়ম-মাফিক। তারপরই আমার মাথায় এল সময়ের হেরফেরের কথাটা। বুঝলাম. অলকা বা দীপেনের সঙ্গে গুপ্তসাহেবের দেখা হয়নি, হয়েছে হত্যাকারীর। কারণ, সময়ের হিসাব বলে দিচ্ছে, গুপ্তসাহেব তার আগেই মারা গেছেন।

এর অর্থ হল, দীপেন বা অলকা অশোককে দেখলে বলে দিতে পারবে সেদিন গুপ্তসাহেব বলে যাকে দেখেছিল, সে এই ব্যক্তি কিনা। দুজনের মধ্যে থেকে আমি দীপেনকেই বেছে নিলাম। গেলাম আবার তার কাছে। ভালভাবে তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে সহযোগিতার হাত বাড়াল। পরশুদিন অশোক যখন অফিসে ঢুকছে—আমি আর দীপেন তখন দূরে দাঁড়িয়ে। দীপেন তাকে চিনতে পারল। কিন্তু এই চিনতে পারাতেই আমার কাজ হচ্ছিল না। কারণ অশোক যে অপরাধী তা প্রমাণ করা যেত না। বাধ্য হয়েই আমাকে টোপ ফেলতে হল।

কাল বিকেলে একথা সেকথার পর আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের সামনে দীপেনের কথা তুললাম। অশোক নিশ্চয় মনে মনে ঘাবড়াল। তারপর আমার একজন সহকারী এনারেৎকে পাঠালাম দীপেনের বাড়ি। সে ওকে একটা টেলিফোন-বুথের সামনে নিয়ে গেল। পূর্ব ব্যবস্থা মত দীপেন ফোন করে অশোককে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। মোটা টাকার ব্যবস্থা না হলে সব কথা পুলিশকে বলে দিতে বাধ্য হবে।

অশোক মহা ভয় পেয়ে গেল। তার সামনে তখন একটা রাস্তাই খোলা—এত বড় সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। নইলে সে জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে। অশোক প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। লেনদেনের ব্যাপারটা সেরে ফেলবার জন্য তাকে ডাকল অফিস বাড়িতে। অর্থাৎ দীপেনকে ওখানে সহজেই শেষ করা যাবে। অবশ্য দরোয়ানকে ওখান থেকে কোন্ অজুহাতে সরিয়ে ছিল বলতে পারি না। যাহোক, আমি দীপেনের কাছ থেকে সব কথা জানতে পেরে ফাঁদ পাতলাম। তারপর কি ঘটেছিল, তা আগেই জানতে পেরেছেন।

ভবানীশংকর বললেন, এই কেসটা সলভের ব্যাপারে আপনি যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার উল্লেখ করে আপনাকে ছোট করতে চাই না। আমাদের রক্তের মধ্যে এমন খুনের নেশা যে ছিল তা আগে কে জানত। একটা প্রশ্ন আছে কিন্তু···

—বলুন ?

—টাকাটা কোথায় ?

—আগেই বলেছি তো আপনার অফিস বাড়ির কোথাও লুকনো আছে। ভালভাবে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

সেন বললেন, আমারও একটা প্রশ্ন আছে। অশোক, গুপ্তর ফ্ল্যাটে গিয়ে অমন লণ্ডভণ্ড অবস্থার সৃষ্টি করেছিল কেন ?

—পুলিশকে বিপথগামী করার জন্য। এই ধারণার সৃষ্টি যাতে হয়, হত্যাকারী শুধু গুপ্তসাহেবকে খুন করেনি, তাঁর টাকা-পয়সা এবং দামী কিছু জিনিসও হাতিয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত মোটিভকে ধাঁধার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা। আপনারা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বোধহয় পেয়ে গেছেন। এবার আমরা উঠব। ডাক্তার এস···

—উঠবেন কি রকম ?—ভবানীশংকর বললেন, রাতের খাওয়াটা আজ আপনাদের এখানেই সারতে হবে। তাছাড়া পেমেন্টের ব্যাপার রয়েছে। প্রতিভার মূল্যায়ণ হয় না জানি। তবু যদি দয়া করে এটা নেন···

তিনি একটা চেক বাড়িয়ে ধরলেন।

বাসব মৃদু হেসে চেকটা হাতে নিয়ে বলল, সংখ্যাগুলো ভালই সাজিয়েছেন। পেমেন্ট করার কথা অবশ্য ছিল নিশীথবাবুর। সমস্যা যখন মিটে গেছে, তখন উনি হয়ে আপনি দিয়েছেন, কথা একই। ধন্যবাদ।

মৃত্যুদূত

শীতটা বেশ চেপে পড়েছে।

বহুদিন এরকম শীত পড়েনি কলকাতায়। যাঁরা স্রেফ চাদর কাঁধে ঠেকিয়ে নির্বিকারভাবে শীত কাটিয়ে দিতেন, তাঁরাও পুরনো ওভারকোট বার করে এবার গায়ে চাপিয়েছেন। সন্ধ্যার মুখে কুয়াশা তো আছেই, ওই সঙ্গে গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়ার মত টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন।

দুশো একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে যথানিয়মে সন্ধ্যার পর আড্ডা বসেছে বাসব ও শৈবালের। শীতের দাপটকে কেন্দ্র করেই আলোচনা চলছে বলা বাহুল্য।

বাসব বলল, কলকাতার লোকেদের বিচিত্র মনোভাব। ডিসেম্বরের শেষের ক-দিন এখানে মাঝামাঝি গোছের শীত থাকে শুধু, বলে আক্ষেপের সীমা নেই। আবার দেখ, এবার যখন শীত চেপে পড়েছে, চতুর্দিকে গেল গেল রব। কাগজে এন্তার প্রবন্ধ বেরুচ্ছে। এমনকি সম্পাদকীয় পর্যন্ত গোটাকয়েক লেখা হয়ে গেল এই নিয়ে।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে তো? শীত চাই বৈকি! তাই বলে কি গ্রীনল্যাণ্ডেব মত শীত পড়বে?

বাসব উঠে গিয়ে হোয়াট নটের ওপর থেকে সিগারেটের টিন নিয়ে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, কালই পড়ছিলাম, এর চেয়ে চতুর্গুণ শীত কলকাতায় পড়েছিল ১৮৭৩ সালে। সেই সঙ্গীন রেকর্ড এখনো ব্রেক হয়নি। সেবার বরফ পড়েছিল নাকি।

—না না, এতটা বাড়াবাড়ি হয়নি। তবে—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই বাহাদুর তার বেঁটে-খাটো চেহারা নিয়ে দেখা দিল। জানাল, একজন মহিলা সাক্ষাত করতে এসেছেন। এই শোচনীয় সন্ধ্যায় কেউ যে আসতে পারে, কল্পনার অতীত ছিল দুজনের। বাসব ঘাড় হেলিয়ে ভদ্রমহিলাকে এখানে আনবার সম্মতি দিল।

মিনিট দুয়েক পরে ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। বয়স বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। অপূর্ব সুন্দরী না হলেও তাঁর মুখশ্রী নিন্দনীয় নয়। তবে মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও চোখ দুটো যেন উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির চিহ্ন শাড়ির সর্বত্র।

তরুণী কিঞ্চিৎ ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি বাসববাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বসুন! বলুন, কি বলতে চান?

—আপনার কনসাল্টেশন ফি আমি দেব। বোধহয় আমি বিপদে পড়তে পারি। মানে……

বাসব ও শৈবালের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হল।

বাসব মৃদু গলায় বলল, ঘটনাটা কি আমায় খুলে বলুন। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।

তরুণী মিনিট দুয়েক চুপ করে থাকার পর বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হল, আরতি বড়লোকের মেয়ে ছিল। শুধু বড়লোক নয়, তাদের পরিবার অত্যন্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ও কেতা-দুরস্ত। মিশনারী স্কুল-কলেজে পড়েছে আরতি। দাদার বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস খেলেছে। এমনকি ককটেল পার্টিতে গিয়েও নার্ভাস বোধ করেনি কোনদিন। তার মা মিসেস চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল, অনিমেষের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। অনিমেষ ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসেই ব্যারিস্টারিতে জয়েন করেছিল। অল্প দিনেই পসার জমে উঠেছিল তার। এক কথায় সে হীরের টুকরো ছেলে।

মিঃ চৌধুরী কিন্তু রাজি হননি। তিনি নিজে ব্যারিস্টার হওয়ার দরুণ ও পেশায় নিযুক্ত আর কারুর হাতে মেয়েকে দেবেন না একরকম স্থির করে রেখেছিলেন। আরতির সঙ্গে বিয়ে হল রবীন গাঙ্গুলীর। কলেজ-জীবনে রবীন বরাবর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। কর্ম-জীবনেও সে প্রতিষ্ঠিত। ডক্টরেট পাবার পর রসায়ন শাস্ত্রের এক দুরূহ বিষয় নিয়ে সরকারি তত্ত্বাবধানে গবেষণা করছে। তবে একটা বিষয়ে পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। রবীন উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। উৎকট পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে তার বা তার পরিবারের অন্য কারুর পরিচয় নেই। নেই ককটেল পার্টিতে যাওয়ার অভ্যাস।

তবু স্বামীর মতের বা মনের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে ফেলেছিল আরতি। মাস ছয়েক ভালই কেটেছিল। গোলমাল দেখা দিল তার পর। বাড়িতে তার নিজের দুই দেওর, সৎ শাশুড়ী ও সৎ ননদ আছেন। তাঁরা আরতির স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। তার বাপেরবাড়ি যাওয়া বন্ধ হল। এমনকি তার দাদা অলোক এবং সঙ্গে অনিমেষ এলে তাকে দেখা পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না। গালিগালাজ পর্যন্ত করতেন। রবীন গবেষণায় ব্যস্ত—তার মনের শান্তির ব্যাঘাত হবে বিবেচনা করে তাকে এই সমস্ত কথা বলত না আরতি। পরিস্থিতি ক্রমে চরম আকার নিয়েছে। তাকে খুন করা হবে এমন ভয় দেখান হয়েছে। কয়েকদিন আগে স্নায়ু নিস্তেজ হয়ে পড়ে—এমন পানীয় তাকে খাওয়ান হয়েছিল। আরতি তিনদিন কাটিয়েছে ঘোরের মধ্যে দিয়ে। গতকাল রাত্রে বাথরুমে যাবার সময় দরজার পাশ থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখেছে। আরতি নিশ্চিত যে, গলা টিপে তাকে একদিন কেউ মেরে ফেলবে। টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানা দেখে সে বাসবের কাছে এসেছে সাহায্যের আশায়।

বাসব একাগ্র মনেই শুনছিল। ভদ্রমহিলা থামতে বাসব বলল, আপনি শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু দুঃখের

সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আমার তো কোন করণীয় নেই।

আরতি গাঙ্গুলীর গলায় হতাশা ফুটে উঠল, কিছুই করবার নেই! পুলিশের কাছে গেলে পরিস্থিতি আরো ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে মনে করে আপনার কাছে এসেছি। আমার ধারণা ছিল—

—এক কাজ করতে পারেন, ও বাসা ছেড়ে দিন। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোথাও উঠে যান। তবে একটা কথা, আপনাকে উত্যক্ত করছে সকলে, মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু খুন করতে যাবে কেন? তাতে কারুর কিছু লাভ হবে কি?

—আছে। বাবা আমাকে অনেক টাকা দিয়েছেন, অনেক গয়না দিয়েছেন। সেগুলো তাদের নেট লাভ হবে।

—সকলের হবে না। শুধু আপনার স্বামীর হতে পারে।

—আমার স্বামী কোন কিছুতে থাকেন না। সৎ শাশুড়ীই সব। আমি সরে গেলে তিনিই আমার সমস্ত কিছু হাতে পাবেন। প্লীজ মিঃ ব্যানার্জী, এ বিষয়ে কিছু একটা করুন!

—কোন পরিবারের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নাক গলান আইনসম্মত নয়। আপনি বরং আপনার স্বামীকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে অবস্থার উন্নতি করা যায় কিনা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ম্রিয়মান গলায় আরতি গাঙ্গুলী বললেন, আমার স্বামী! তিনি কি—বেশ, তাঁকে আপনার কাছে পাঠাবার চেষ্টা করব।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ খোলবার উপক্রম করলেন।

বাসব বলল, আমাকে টাকা দিতে হবে না। কেস হাতে না নিয়ে শুধু দু-চার কথার বিনিময়ে কিছু নেওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

তিনি ম্রিয়মান মুখে বিদায় নিলেন।

শৈবাল বলল, উনি যে অত্যন্ত ডিস্টার্বড্ তাতে সন্দেহ নেই।

—তোমার সঙ্গে আমিও একমত, ডাক্তার। কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারে নাক তো গলাতে পারি না! আমি কি ভাবছি জান? ভাবছি ও'র স্বামীর নিষ্ক্রিয় অ্যাটিচিউডের কথা।

আবার বাহাদুরের উদয় হল। এসে জানাল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

—তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়। দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। সুশ্রী, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

তিনি কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, আমার স্ত্রী বোধহয় মিনিট কয়েক আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তিনি নিশ্চয় অনেক অসংলগ্ন কথা বলে আপনাদের সময় নষ্ট করেছেন। আমি তাঁর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আসলে তিনি প্রকৃতিস্থা নন।

বাসব বলল, আপনি রবীনবাবু! বসুন—বসুন—

—বসবার সময় আমার নেই। তাঁর কাণ্ডকারখানায় অস্থির হয়ে উঠেছি। আবার যদি আরতি আপনার কাছে আসে, অনুগ্রহ করে সংবাদ পাঠাবেন আমাকে।

নিজের নাম ও ঠিকানা অঙ্কিত কার্ড সেণ্টার টেবিলের ওপর রেখে যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। এরা দুজন হতবাক।

শৈবাল বলল, ব্যাপার খুব সুবিধের ঠেকছে না।

—হুঁ!

বাসব সিগারেট ধরাল।

দিন দুয়েক কেটে গেছে। শীত একেবারে কমে না গেলেও আর প্রচণ্ড ভাবটা নেই। বেলা তখন চারটে। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনার উদ্দেশে বাসব বাড়ি থেকে বেরুল। একাই বেরুল। শৈবাল ছ-টার আগে আসে না। গেট পেরিয়ে ট্যাক্সির সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, একটা জিপ এসে তার পাশে থামল।

জিপ থেকে ইন্সপেক্টার বিজয় ধর নামতে নামতে বললেন, কোথায় চলেছেন মশাই?

—ধর মশাই যে, আমাদের পাড়ায় আবার কি তদন্ত করতে এলেন?

—তদন্ত অন্যত্র। ভাবলাম আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই। চলুন, ঘুরে আসবেন। জরুরী কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন না নিশ্চয়?

বাসব দ্বিরুক্তি না করে জিপে গিয়ে বসল।

—কি কেস? মার্ডার নাকি?

বিজয় ধর জিপে স্টার্ট দিলেন।—মার্ডার তো বটেই। ব্যাপারটা বিশদভাবে কিছু জানি না। খবর পেয়েছি, ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার সামনে মৃতদেহটা পড়ে আছে। খুন হয়েছেন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা।

মিনিট কয়েক মাত্র লাগল ঘটনাস্থলে পৌঁছতে। কৌতূহলী জনতাকে রুখে রেখেছিল কয়েকজন কনস্টেবল। বিজয় ধরকে অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে বাসব দেখল, জলের ধারে ঘাসের ওপর একজন তরুণী হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বেশবাস দেখে সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। গায়ের রঙ হাল্কা সবুজ হয়ে গেছে। বিষক্রিয়ায় বোধহয়।

ইন্সপেক্টার ধর বললেন, ঘণ্টাখানেক হল আমি জানতে পেরেছি ঘটনাটা। মৃতদেহ আবিষ্কার করে একজন মালি। সে ট্রাফিক কনস্টেবলকে খবর দেয়। ফটোগ্রাফার এসে পড়লেন। মৃতদেহ এখনো নেড়েচেড়ে দেখা হয়নি। হুমড়ি খাওয়া অবস্থায় একটা ছবি তোলার পর মৃতদেহ চিৎ করে দেওয়া হল, এবার

মৃতার মুখ দেখতে পাওয়া গেল। বাসব চমকে উঠল—আরতি গাঙ্গুলী! যে মালি মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল, তাকে পুলিশ আটকে রেখেছিল। ধর তাকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। বাসবের মনের মধ্যেটা উদ্বেল হয়ে উঠল। কেউ যে তাঁকে খুন করতে চায়, ভদ্রমহিলা ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। আরো একটু সতর্কতার সঙ্গে সেদিন কথাবার্তা বলা উচিত ছিল। রবীন গাঙ্গুলীকে হাতে পেয়েও ওই ভাবে চলে যেতে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। তাঁর কাছ থেকে খুঁটিয়ে সমস্ত জেনে নিয়ে একটা উপায় উদ্ভাবন করতে পারলে ভদ্রমহিলা হয়ত মারা পড়তেন না। বাসব মনকে দৃঢ় করল। এখন আর হা-হুতাশ করে লাভ নেই। বরং কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন হওয়া ভাল। ভদ্রমহিলা তার কাছে সাহায্যের আশায় গিয়েছিলেন। এবং ঘটনাচক্রে তাঁর মৃতদেহের কাছে সে উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা তার কর্তব্যের বাইরে নয়।

বাসব সতর্কতার সঙ্গে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগল। মনে হয় জলের পাড়ে বসে আরতি গাঙ্গুলী কারুর সঙ্গে কথা বলছিলেন, মৃত্যু আচম্বিতে এসেছে। নইলে ওইভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকার আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিস্ময়ের বিষয়, বিষ কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। জোর করে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। ইনজেক্ট করা হয়েছে একথাও মনে স্থান দেওয়া ঠিক না—বিশেষ করে সেখানে অজস্র লোক চলাচল করছে। তবে···, হঠাৎ বাসবের দৃষ্টি পড়ল মৃতদেহের হাত কয়েক দূরে একটা কাগজের মোড়ক পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল। মোড়ক খুলতেই চোখে পড়ল, তার মধ্যে রয়েছে ঘোড়ার বিষ্ঠা।

হত্যার সঙ্গে এই বিশেষ বস্তুটির কি কোন সম্পর্ক আছে? থাক বা না থাক আপাতত মোড়কটা বাসবের পকেটে স্থান লাভ করল। মালিকে জেরা করা শেষ হয়েছিল। ইন্সপেক্টার ধর আরতি গাঙ্গুলীর ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন। মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। সেই সময় আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল। আরতির ডান হাতের মুঠোতে ধরা রয়েছে অত্যন্ত ছোট (মাত্র ইঞ্চি দুয়েক) সুদৃশ্য একটা ছুরি। সেই ধরনের ছুরি, যা দিয়ে মহিলারা নখের আগা পরিষ্কার করে থাকেন। বা পেন্সিলের মুখ পরিষ্কার করা যায়। ছুরিটা মুঠোর মধ্যে থেকে বার করে নিলেন ইন্সপেক্টার।

মৃতদেহ ভ্যানে তোলা হল। হত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে বাসব ও ধর জিপে এসে বসলেন। ভ্যানিটি ব্যাগটি খোলা হল। তার মধ্যে রুমাল, চিরুনী, আয়না ও খুচরো এবং নোট মিলিয়ে ত্রিশ টাকার মত রয়েছে। আর রয়েছে একই ধরনের আরেকটা ছুরি। শুধু খোলা নয়, বন্ধ। পার্থক্যের মধ্যে আগেরটার স্টিলের বাঁটের ওপর লাল স্পট আছে, এটার নেই।

ধর বললেন, একি মশাই, এত ছুরির ছড়াছড়ি কেন ?

—তাই তো দেখছি ! চলুন, ফেরা যাক ।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাসব ফোন করল ইন্সপেক্টার ধরকে। তিনি অফিসেই ছিলেন। ফোন ধরলেন। কতদূর কি হল মিঃ ধর ?

—কিছুক্ষণ হল পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। স্টেটমেন্টও নিয়েছি সকলের। ভাগ্যিস আপনার কাছে ঠিকানা ছিল, নইলে ঠিকানা সংগ্রহ করতে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হত ! ভিকটিমের আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তায় কিছু অসংলগ্নতা থাকলেও হত্যাকারী হিসেবে তাদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করতে পারলাম না।

—হ্যালো—শুনুন মিঃ ধর, এই ব্যাপারে আমি কিঞ্চিৎ ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছি। একটু কষ্ট করবেন ?

—বলুন ?

—এখুনি একবার চলে আসুন না আমার এখানে ! সঙ্গে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট, স্টেটমেন্টগুলোর কপি ও আরতিদেবীর মুঠোর মধ্যে ধরা ছুরিটা আনতে ভুলবেন না ! আর হ্যাঁ, সকলের ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিশ্চয় নিয়েছেন ? আসবার সময় সেগুলো সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ছেড়ে দিচ্ছি এখন—

বাসব ফোন ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে অবশ্য সে একটা কাজ করেছে, কুড়িয়ে পাওয়া মোড়কের মধ্যেকার ঘোড়ার বিষ্ঠাটা পরীক্ষা করে দেখেছে। পরীক্ষার পর বুঝতে পারা গেছে ওটা ঘোড়ার নয়, গাধার। এই বিশেষ বস্তুটার সঙ্গে হত্যার কোন সম্পর্ক আছে কিনা চিন্তা করেছে গভীরভাবে। একসময় বাসবের মাথায় বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে। কোন জীব-বিজ্ঞানীর সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করলে কেমন হয় ?

প্রতুল ঘোষ টাউনসেন্ড রোডে থাকেন। জীবজন্তুদের নিয়েই তাঁর কারবার। দীর্ঘদিন তাদের নিয়ে রিসার্চ করে আসছেন। একজন মানী লোক। কিছুদিন আগে ভবানীপুরে এক তদন্তে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাসবের। সেই আলাপের সূত্র ধরেই সে তাঁর ওখানে গেল।

সমাদরে বাসবকে বসালেন মিঃ ঘোষ। চা এল। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হল। বাসব একসময় প্রশ্ন করল, আচ্ছা, গাধার বিষ্ঠা কি বিষাক্ত ?

মৃদু হেসে মিঃ ঘোষ বললেন, তাই বলুন, কাজ নিয়েই এসেছেন ? আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য বিষাক্ত নয়। তবে ওই বিষ্ঠার সাহায্যে অন্য কিছুকে বিষাক্ত করে দেওয়া চলে।

—কি রকম ?

—এ সম্পর্কে আগে আমারও জ্ঞান ছিল না। মাস দুয়েক হল একটা কনফিডেন্সিয়াল আর্টিকল সরকারের কাছ থেকে পেয়ে ব্যাপারটা জানতে

পেরেছি। সময় সময় সাধারণ মানুষ কি রকম মারণ-অস্ত্র আবিষ্কার করে বসে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে হত্যা করার আধুনিক পদ্ধতি হল, একটা ছোরাকে তাতিয়ে নেওয়া হয়, তারপর তাতে গাধার বিষ্ঠা ভাল করে মাখিয়ে নিয়ে আবার গরম জলে ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর এই ছোরা দিয়ে কারুর শরীরে সামান্য আঁচড় যদি লেগে যায়—প্রচণ্ড বিষক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য।

বাসব দিব্যচক্ষে আরতি গাঙ্গুলীর হত্যাকাণ্ড যেন দেখতে পেল।

আরো দু-চার কথার পর সে বিদায় নিল প্রতুল ঘোষের কাছ থেকে।

মোড়কটাও পরীক্ষা করতে ছাড়েনি বাসব। স্বাভাবিকভাবেই হাতের ছাপ পাওয়া গেছে তাতে। ছাপটা সন্তর্পণে তুলে নিয়েছে।

মিনিট পঁয়ত্রিশ পরে ইন্সপেক্টার ধর এলেন। বাসব তাঁকে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল।

বলল, আপনি ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করুন ইন্সপেক্টার। আমি চট করে কাগজ-পত্রগুলো দেখে শেষ করি।

প্রথমে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হলেও কোন্ বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, বুঝতে পারা যায়নি। বিষ খাওয়ানো হয়নি বা ইনজেক্ট করা হয়নি। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের পাশের চামড়া একটু চিরে গেছে। ধরে নেওয়া হয়েছে, বিষ ওই পথ দিয়েই শরীরে প্রবেশ করেছে।

বাসব মিনিট পাঁচেক মেণ্টাল পিসের দিকে তাকিয়ে রইল। গভীরভাবে চিন্তা করল যেন কিছু। তারপর সংশিলষ্ট ব্যক্তিদের স্টেটমেণ্ট পড়তে আরম্ভ করল। প্রত্যেকের এজাহার কাট-ছাঁট করলে দাঁড়ায় এই রকম—

রবীন গাঙ্গুলী: মৃতার স্বামী। স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, বুঝতে পারা যায় না। তবে স্ত্রীর মৃত্যুতে বেশ ম্রিয়মান। দুর্ঘটনার দিন সকাল ন-টায় শেষবার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি রাত দশটার সময় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পান।

রমেন গাঙ্গুলী: মৃতার দেওর। তিনি বৌদির সাহেবি কায়দায় চাল-চলন পছন্দ করতেন না ঠিকই, তবে তাঁর মৃত্যু কামনা হয়নি। দুর্ঘটনার দিন কোনরকম কথা কাটাকাটি হয়নি। অফিস থেকে ফিরে তিনি ক্লাবে গিয়েছিলেন। ওখানে চাকর গিয়ে তাঁকে বৌদির মৃত্যু সংবাদ দেয়।

রথীন গাঙ্গুলী: মৃতার কনিষ্ঠ দেওর। বৌদির সঙ্গে তাঁর মতান্তর ছিল। ভদ্রমহিলা গৃহস্থ বধূর মত বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে চান না, এটা পছন্দ ছিল না তাঁর। বৌদির এই স্বভাবের জন্য দাদার নির্লিপ্ততা যে দায়ী সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দুর্ঘটনার দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন, সুতরাং বাড়িতেই ছিলেন। বৌদির কোন সংবাদ তিনি রাখেননি।

অলোক চৌধুরী ঃ মৃতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বোনের শোচনীয় মনের অবস্থার কথা তিনি জানতেন না। মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতে আসতেন। আরতিও যেতেন বাপের বাড়ি। এই নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যে রাগারাগি চলছিল তাঁর জানা ছিল না।

অনিমেষ মুখার্জী ঃ অলোক চৌধুরীর বন্ধু। আরতিদেবীর সঙ্গে তাঁর বহু দিনের আলাপ। দুজনের বিয়ের কথাও একবার হয়েছিল। তাঁর ও অলোকের ও-বাড়িতে যাওয়া নিয়ে যে অশান্তি দেখা দিয়েছিল একথা তিনি জানতেন না।

মমতা গাঙ্গুলী ঃ মৃতার সৎ শাশুড়ি। পুত্রবধূর অত্যাধুনিক চাল-চলন তিনি পছন্দ করতেন না। কথা কাটাকাটি হত। তবে কোনদিন তাকে তিনি ভয় দেখাননি। দুর্ঘটনার দিন দুপুরবেলা তিনি রবীন গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন। আর সে ফিরে আসেনি। তার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন সন্ধ্যার পর পুলিশের কাছ থেকে।

পড়া শেষ হলে ইন্সপেক্টার প্রশ্ন করলেন, কি রকম বুঝলেন? রবীনবাবুর স্টেটমেন্টে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, কি বলেন?

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, তাই তো দেখছি! ওয়েল ইন্সপেক্টার, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি একবার ল্যাবরেটারিতে যেতে পারি। গোটাকয়েক জোরাল সূত্র প্রায় পেয়ে গেছি বলতে গেলে।

—অফ কোর্স! আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আমি উঠি। কাল আবার দেখা হবে।

পরের দিন সমস্ত দুপুর বাসব অত্যন্ত ব্যস্ত রইল। প্রচুর ছুটোছুটি করতে হল তাকে। বাড়ি ফিরল বিকেল উত্তরে যাবার অনেক পরে।

শৈবাল আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিল। বাসবের দিকে তাকিয়ে শৈবাল বলল, বাহাদুরের মুখে শুনলাম, তুমি নাকি দুপুর-ভোর বাড়ি নেই? কোথায় গিয়েছিলে?

বাসব সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, গাধার সন্ধানে।

—সেকি!

—একটুও বাড়িয়ে বলছি না ডাক্তার। গাধার সম্পর্ক না থাকলে কেসটা আমি সল্‌ভ করতে পারতাম না।

—বল কি! তুমি জেনে ফেলেছ কে হত্যাকারী?

—তুমিও জানতে পারবে। ধর-কে ফোন করি আগে। সংশ্লিষ্ট সকলকে কোথাও আগে একত্রিত করা দরকার।

বাসব হাত বাড়িয়ে ক্রেডস্‌ থেকে রিসিভার তুলে নিল।

ইন্সপেক্টার ধরের অনুরোধে রবীন গাঙ্গুলীর বাড়ির সকলে সন্ধ্যার পর বাড়িতেই

রইলেন। অলোক চৌধুরী ও অনিমেষ মুখার্জীকেও আহ্বান করা হল। বাসব ও শৈবাল যখন ওখানে পৌঁছল আটটা বেজে গেছে। ইন্সপেক্টার ওদের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বাসব বলল, এই কেসে মাথা ঘামাবার কোন দরকার পড়ত না, যদি মারা যাবার আগে আরতিদেবী সাহায্যের জন্য আমার কাছে না যেতেন। তিনি অস্থিরতার শেষপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, বাড়ির কোন লোক তাঁকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। তবে—

বাসবকে বাধা দিয়ে রমেন গাঙ্গুলী বললেন, তাঁর কোন অলীক ধারণার জন্য বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় দায়ী নয়!

—তাঁর ধারণা যে অলীক ছিল না, তার প্রমাণ, তিনি খুন হয়েছেন। যাই হোক, এবার আমি রবীনবাবুকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। মিঃ গাঙ্গুলী, আমার বাড়ি থেকে সেদিন আপনার স্ত্রী নিষ্ক্রান্ত হবার পরই আপনি গিয়ে বলেছিলেন, আপনার স্ত্রীর নাকি মাথা খারাপ। অথচ তিনি খুন হওয়ার পর কেউ নিজের স্টেটমেণ্টে একথা উল্লেখ করেননি। স্বাভাবিকভাবে আপনার সেদিনের উক্তির সত্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রবীন গাঙ্গুলীর গম্ভীর মুখের ওপর অধৈর্য ভাব ফুটে উঠল। অবশ্য তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। বেশ সংযত গলায় বললেন, আপনার কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। আমি সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। কেন নিয়েছিলাম, জানেন? আমার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল তাতে আমিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। পারিবারিক কেচ্ছা বাইরে প্রচারিত হোক, এটা কে চায়? আমি গবেষক লোক। মনের শান্তি না থাকলে একাগ্রভাবে কাজ করা যায় না। বাড়ির সকলকে জানিয়েছিলাম আরতির জন্য কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। তার চরিত্রে অসংযম থাকলে তা শুধরে দেবার দায়িত্ব অন্য কারুর নয়, আমার। তবু এঁরা আমার কথায় কান দেননি। আপনারা বিশ্বাস করুন, আরতি খারাপ মেয়ে ছিল না। আমাদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, আর ছ-টা মাস মুখ বুজে সহ্য করে যাও। তারপর আমরা আলাদা হয়ে যাব। তাকে এমন উত্যক্ত করা হয়েছিল যে, অনন্যোপায় হয়ে সে আপনার কাছে ছুটে গিয়েছিল। আমি আরো একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। দুর্ঘটনার দিন কাজে যাইনি। আরতিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। একটা রেস্টুরেণ্টে বসে আবার নতুন করে তাকে বুঝিয়েছিলাম। কথা দিয়েছিলাম, ছ-মাস নয় এই মাসেই বাড়ি বদল করব। তার প্রয়োজন আর হল না। আরতিকে খুন করে কার যে কি লাভ হল বুঝলাম না।

মমতা গাঙ্গুলী বললেন, রবীন আকারে ইঙ্গিতে আমাদের দোষী প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা কেন করছে আমিও বুঝলাম না! অলোক না হয় আরতির দাদা,

অনিমেষের মত পর-পুরুষের সঙ্গে ঘরের বৌ ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে, অথচ কিছু বলতে পারব না।

অনিমেষ মুখার্জী দ্রুত গলায় বললেন, আপনি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলছেন, মিসেস গাঙ্গুলী। আমি অলোকের অনেক দিনের বন্ধু, আমি বেচাল স্বভাবের হলে সে এখানে আমায় আনত না।

বাসব বলল, কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। রথীনবাবু, আরেকটা প্রশ্ন আছে। আপনার স্ত্রী ভ্যানিটি ব্যাগে একটা ছোট ছুরি রাখতেন কিনা জানেন?

—রাখত। নেল কাটার সে পছন্দ করত না। ছোট ছুরি দিয়ে সব সময় নখ কাটা বা ঘসা তার অভ্যাস ছিল।

বাসব পকেট থেকে আরতি গাঙ্গুলীর মুঠোর মধ্যে পাওয়া ছুরিটা বার করে বলল, দেখুন তো, এই ছুরিটাই কি?

—না। তার বাঁটটা প্লেন স্টিলের ছিল। কোনরকম কারুকার্য করা ছিল না।

—আপনারা শুনলে অবাক হবেন, এই ছুরি দিয়ে আমি যদি কারুর শরীরে আঁচড় কাটি সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। এর ডগায় এমন এক ধরনের বিষ লাগান আছে যার তুলনা নেই। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গ্রামাঞ্চলে গাধার বিষ্ঠার সাহায্যে এই মারাত্মক বিষ ছোরা-ছুরির ওপর সংক্রামিত করা হয়। হত্যাকারী কোন সূত্রে এই বিষয়টা জানতে পেরেছিল। সে চমৎকারভাবে আরতিদেবীর এই বদ অভ্যাসটাকে কাজে লাগিয়েছে। তাঁর সব সময় ছুরি দিয়ে নখ কাটা অভ্যাস ছিল। হত্যাকারী তাঁকে সুদৃশ্য এই ছুরি উপহার দিল। তিনি বুঝতে পারলেন না—ওই ছুরির ফলায় মৃত্যুদূত বাসা বেঁধেছে। অভ্যাসবশে নখ ঘসতে গিয়ে চামড়া একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করেছে। বাসব একটু থেমে আবার বলল, মোটিভ না থাকলে এত ঠান্ডা মাথায় মার্ডার হতে পারে না। স্বীকার করে নিতে বাধা নেই, এই হত্যাকান্ডের সঠিক মোটিভ আমি বুঝতে পারিনি। তবে যা অনুমান করেছি, মনে হয়, প্রকৃত মোটিভের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। হত্যাকারী আরতিদেবীর সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত ছিল। তার সাধ ছিল তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধবার। কিন্তু সে সাধ তার পূর্ণ হল না। তাঁর বিবাহিত জীবনে ফাটল ধরাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আরতিদেবী স্বামীকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তাঁর সুখ আর সহ্য করতে পারল না সেই আশাহত লোকটি। প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠল—

বাধা দিয়ে অলোক চৌধুরী বললেন, এ সমস্ত কি বলছেন?

—নিজের বন্ধুকে প্রশ্ন করুন। আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। অনিমেষবাবু, আশা করি আমি ঠিক কথাই বলেছি?

অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, ইন্সপেক্টার তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

—একি! আপনারা পাগল হলেন নাকি? একজনের প্রলাপকে বিশ্বাস করে—

—আইনকে আমিও ভয় করি অনিমেষবাবু। প্রমাণ না থাকলে আপনার বিরুদ্ধে চার্জ আমি আনতে সাহসী হতাম না। বাসব বলল, গাধার বিষ্ঠা সমেত কাগজের মোড়কটা নিশ্চয় আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। মোড়ক থেকে হাতের ছাপ তুলে নিতে আমার অসুবিধে হয়নি। ইন্সপেক্টারের কাছ থেকে পাওয়া প্রিন্টগুলোর সঙ্গে এই প্রিন্ট মিলিয়ে দেখতেই বুঝলাম ওটা আপনার হাতের ছাপ। সন্দেহ ঘনীভূত হল। বিষ মাখানো ছুরিটায় 'ডসডি' কম্পানির লেবেল আছে। ওদের দোকানে পুলিশের সাহায্যে খোঁজ নিতেই ক্যাশমেমোর ডুপ্লিকেটে আপনার নাম পেলাম, অর্থাৎ, ছুরিটা আপনি কিনেছেন। আপনার চেয়ে অনেক মাথাওয়ালা লোকের ভুল হয়—আপনার তো হবেই। নিজের নামে ছুরিটা না কিনলেই ভাল করতেন। কিংবা এমন জায়গা থেকে কিনতেন যেখানে ক্যাশমেমোতে নাম লেখার সিস্টেম নেই। দ্বিতীয় নম্বর এবং মারাত্মক প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে হল, আপনার বাড়ির পেছনে অবস্থিত ধোবারা। গতকাল দুপুরে আমি গিয়েছিলাম সেখানে। গাধার বিষ্ঠা প্রাপ্তিতেই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম বলা বাহুল্য। পুলিশের ভয় দেখাতেই কাজ হল। আমায় তারা যে কথা বলেছে, কোর্টেও তাই বলবে। তারাই আপনাকে গল্প করেছিল তাদের দেশে এই পদ্ধতিতে খুন করা হয়। আশা করি আপনার আর কিছু বলার নেই? পরিপূর্ণ একটি নারীর জীবন আপনার খেয়াল-খুশিতে নষ্ট হয়ে গেল, এর চেয়ে পরিতাপের কথা আর কি হতে পারে?

অনিমেষের শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না। ঘরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সকলের দৃষ্টি অপরাধীর ওপর। শুধু রবীন গাঙ্গুলী মাথা নত করে বসে আছেন।

...আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনি নিজের কর্তব্যে তৎপর হতে পারেন ইন্সপেক্টার। আমি এবার বিদায় নেব। এস ডাক্তার।

বাসব দরজার দিকে অগ্রসর হল। শৈবাল তাকে অনুসরণ করল।

মৃত্যুমর্মর

দুশো একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে। বাসব ম্যান্টিলপিসের সামনে দাঁড়িয়ে আনমনে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। ব্রতীন সোফায় বসা অবস্থায় তাকিয়ে আছে সেন্টার টপের দিকে।

'পেইন অ্যান্ড ক্লেম' কম্পানির পদস্থ কর্মচারি ব্রতীন সোম। একটা সমস্যা —না, ঠিক বলা হল না, নিদারুণ এক আঘাত পেয়েই সে এসেছে বাসবের কাছে। ধ্রুবর মৃত্যু তার বুকে আঘাত করেছে নিদারুণভাবে। এই বিশাল পৃথিবীতে ধ্রুবই ছিল ব্রতীনের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে যে এভাবে মারা যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

মাত্র কয়েকদিন আগেকার কথা, অর্থাৎ গত সোমবার ধ্রুব ওকে নৈশ-আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অবশ্য একা ওকে নয়, আমন্ত্রিত আরো কয়েকজন ছিলেন। ধ্রুব নাম করা কনট্রাকটার—অনেক পয়সা রোজগার করেছে। কিন্তু ভোগ করার সে স্বয়ং ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাপ-মা মারা গিয়েছিলেন অনেক আগেই। ভাই-বোন কেউ ছিল না। বিয়ে অবশ্য তার হয়েছিল যথা-সময়। তবে স্ত্রীকেও ঘরে রাখা যায়নি। বছর পাঁচেক আগে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি গত হয়েছেন। কাজেই সম্পূর্ণ নিজের বলতে ধ্রুব চৌধুরীর এই পৃথিবীতে কেউ ছিল না। অবশ্য এ নিয়ে আক্ষেপ করতেও তাকে কোনদিন দেখেনি ব্রতীন।

সেদিন আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমব্যবসায়ী কদম মল্লিক, ধ্রুবর শ্যালক অমল দত্ত, ডাঃ অমিয় পাল, ব্রতীন ও কৃষ্ণা রায়। উপলক্ষ্যটা আর কিছু নয়, গৃহকর্তার জন্মদিন। তবে এমনই দুর্বিপাক, সে গতকাল থেকে সামান্য অসুস্থ। অবশ্য এখন জ্বর নেই। ডাঃ পাল শরীর পরীক্ষা করে মত দিলেন, ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল। আর ফাস্টিং করার দরকার নেই। আপনি স্টু-জাতীয় কিছু খেতে পারেন।

মৃদু হেসে ধ্রুব বলল, আপনারা পরিপাটিভাবে ডিনার মারবেন, আর আমার বেলায় স্টু?

—এখন রিচ কিছু খাওয়া আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।

কৃষ্ণা রায়ের পরিচয় এখানে দিয়ে রাখা দরকার? দীর্ঘাঙ্গি, সুরূপা কৃষ্ণা কোন এক বেসরকারি কলেজের লেকচারার। গত বছর 'সোসাইটি মিট'এ তার সঙ্গে আলাপ হয় ধ্রুবর। আলাপ একটু ঘন হবার পরই জানা যায়, কদম মল্লিকের মনেও কৃষ্ণা রেখাপাত করেছে। দুই সুহৃদে ব্যবসাদার অবশ্য এ নিয়ে কেউ

কাউকে কিছু বলেনি, তবে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা যে সেই দিন থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে তা বলা বাহুল্য। যদিও সবই নির্ভর করছে কৃষ্ণার মতিগতির ওপর। দুপক্ষের পরিচিত জনেরা অপেক্ষা করছেন তার মালা কার গলায় দোলে, দেখবার জন্য।

ডিনারের পরিপাটি ব্যবস্থাই করেছিল ধ্রুব?

কৃষ্ণাকে আজ কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে। কাঁটা চামচের মিষ্টি শব্দের সঙ্গে তাল রেখেই যেন গল্প-গুজব চলেছে। ধ্রুবও সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে। তবে তার আহার্য ডাঃ পালের প্রেসক্রিপশন অনুসারে শুধুই স্টু। কদম মল্লিক সকলের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেও মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন নিশ্চুপ কৃষ্ণার দিকে।

ধ্রুব বলল, কাল আমার নাগপুর যাবার কথা ছিল, কিন্তু যেতে পারছি না।

ব্রতীন প্রশ্ন করল, যেতে পারছ না কেন?

—কাল বিকালে 'অ্যামেরিকান কনস্ট্রাকসন মেসিনারি' থেকে লোক আসবে পেমেন্ট নিতে।

—কয়েকটা বুলডোজার দরকার আমার।

অমল দত্ত বললেন, অপেক্ষা না করলেও পার? পেমেন্ট তো ইচ্ছে করলে ওদের বম্বে অফিসেও দেওয়া যায়!

—তা যায়। তবে এখানে যখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে তখন কথার খেলাপ করব না। অবশ্য পরশু নিশ্চিতভাবে যাচ্ছি।

কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই ডিনারের সময় শেষ হল। চরম পরিতৃপ্তি নিয়ে সকলে উঠলেন। আবার গিয়ে বসলেন ড্রইংরুমে। প্রথা অনুসারে পাইপিংহট শেষ করে সকলে বিদায় নেবেন। যদিও সকলেই কফি খাবেন না। ডিনারের পর হুইস্কি বা রাম-এর আকর্ষণ অনুভব করেন কেউ কেউ।

ধ্রুবকে একধারে পেয়ে ব্রতীন বলল, কি ব্যাপার? শ্রীমতীর মুখ এত গম্ভীর কেন?

—গম্ভীর নয়, কদম মল্লিককে রিফিউজ করবার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছে। তোমরা আসবার আগে আমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। রাজি হয়েছে।

কফি এসে পড়ল।

কদম মল্লিক বললেন, চৌধুরী, লিকারের ব্যবস্থা রাখনি?

—আছে বৈকি! এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু এছাড়াও আমি আপনাদের খাঁটি অ্যামেরিকান জিনিস খাওয়াতে পারব। আমাকে দু-মিনিট সময় দিন!

কথাটা শেষ করেই ধ্রুব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। ইম্পোর্টেড লিকার আনতে গেল বোধহয়। কথাবার্তা খাপছাড়াভাবে চলতে লাগল। ব্রতীন লক্ষ্য করল, কৃষ্ণাকে চাপা গলায় কি যেন বললেন কদম মল্লিক। অবশ্য ওপক্ষ থেকে কোন উত্তর এল না। ইতিমধ্যে অবশ্য বেয়ারা হুইস্কির বোতল, সোডা ইত্যাদি রেখে গেছে। কিন্তু কেউ তা ছোঁননি। সকলে অপেক্ষা করছেন বিদেশী

মালের জন্য।

কিন্তু ধ্রুবর ফিরতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? প্রায় পনের মিনিট হয়ে গেল! কথায় কথায় আরো দশ মিনিট কাটল। এখনো ধ্রুবর দেখা নেই। স্বাভাবিকভাবেই অতিথিরা এবার অস্থির হয়ে উঠলেন। এত বিলম্ব হবার কারণ কি? অসুস্থ শরীর—হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়নি তো?

আদেশের অপেক্ষায় দরজার কাছে দণ্ডায়মান বেয়ারার দিকে তাকিয়ে অমল দত্ত বললেন, দেখতো সাহেবের কি হল?

বেয়ারা চলে যাবার পর বোধহয় মিনিট দুয়েক কেটেছে—তীব্র ভয়ার্ত চিৎকারে সকলে সচকিত হয়ে উঠলেন। দোতলা থেকেই চিৎকারের শব্দ এল। ওখানে নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। অতিথিরা নিজের নিজের আসন ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। এই সময় বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সাহেব দরজার গোড়ায় পড়ে আছেন। তাঁর সমস্ত শরীর কালো হয়ে উঠেছে।

সকলের শিরায় শিরায় রক্ত দ্রুত হল। সকলের আগে ব্রতীন ওপরের দিকে ধাবিত হল। আর সকলে তাকে অনুসরণ করলেন। ধ্রুব নিজের ঘরের দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ঘর অন্ধকার। বারান্দার আলো গিয়ে পড়েছে তার ওপর। বেয়ারা ঠিকই বলেছে ধ্রুবর গৌরবর্ণ মুখের ওপর কালচে আস্তরণ পড়েছে। দেহের দৃশ্যমান অন্যান্য অংশেরও ওই এক অবস্থা। ডান হাতের মুঠোয় লাইটের ঝোলানো প্লাগটা ধরা রয়েছে। শরীর নিথর, নিষ্কম্প।

ডাঃ পাল প্রথমে কথা বললেন, মিঃ চৌধুরী মারা গেছেন মনে হচ্ছে।

অসংলগ্নভাবে বললেন, মারা গেছে।

—আমার তাই বিশ্বাস। তবু পরীক্ষা করে দেখছি!

ডাঃ পাল এগোবার আগেই কদম মল্লিক বাধা দিলেন।

—ওঁর বডি ছোঁবেন না। ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা সকলেরই কেটে গিয়েছিল। কৃষ্ণা চোখে আঁচল দিয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে, প্লাগটা লিক করছিল। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালার জন্য প্লাগে হাত দিতেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ ধ্রুবর শরীরকে সাপটে ধরেছে। ব্রতীন ভাবতে পারছে না, সে তাদের এইভাবে ছেড়ে চলে যাবে। আর সকলের মনের অবস্থা ওই একই রকম।

শেষে—

কদম মল্লিক বললেন, এবার বোধহয় পুলিশে খবর দেওয়াই উচিত।

কৃষ্ণা ভেজা চোখের ওপর থেকে আঁচল নামিয়ে বলল, পুলিশে কেন?

—দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলেই পুলিশে খবর দিতে হবে। নইলে পরে আমাদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ যুক্তি। সুতরাং পুলিশে খবর দেওয়া হল। স্থানীয় থানা

ইনচার্জ রমেন সেন অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়লেন। শুনলেন ব্যাপারটা সকলের মুখ থেকে। অ্যাক্সিডেন্ট কেস বলেই মনে হল তাঁর। অবশ্য ডেডবডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতেই হবে। অবিলম্বে দুটো পেট্রোম্যাক্স আনিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে রাখা হল। তারপর মেন অফ করে ধ্রুবর শক্ত মুঠো থেকে প্লাসটা ছাড়িয়ে আনা হল কোনরকমে?

...ম্যান্টলপিসের কাছ থেকে সরে এসে বাসব বলল, আপনার কথা শুনলাম। কিন্তু আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন আপনার বন্ধু অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাননি—খুন হয়েছেন?

সেই কথাই এবার বলব মিঃ ব্যানার্জী। বলিষ্ঠ কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। তবে একটা ঘোরালো সন্দেহ আমাকে উতলা করে তুলেছে। সত্যি যদি কেউ ধ্রুবকে খুন করে থাকে তাহলে সে সকলের আড়ালে থাকবে তা আমি কখনই বরদাস্ত করব না। তাই সাহায্যের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

—সন্দেহের কথা কি বলছিলেন?

ব্রতীন বলল, যে প্লাসে হাত দিয়ে ও মারা গিয়েছিল, সন্দেহের একনম্বর কারণ ওটাই। দিন পাঁচেক আগেও ধ্রুবর শোবার ঘরে গেছি, কিন্তু প্লাসের সাক্ষাত পাইনি। এর সূত্র ধরে আমি যে দ্বিতীয় কারণ উপস্থিত করছি তাতেই সন্দেহ বেশি দানা বাঁধবে। গতকাল সকালে আমরা সকলে আবার ধ্রুবর বাড়ি উপস্থিত হয়েছিলাম। মর্গ থেকে যদি মৃতদেহ এসে পড়ে তাহলে তার সৎকার করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। বাগানে সকলে ঘোরাঘুরি করছিলাম। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল ইলেকট্রিকের আর্থকানেকশনটা কাটা। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কেন সন্দেহ করছি?

—আপনি বলতে চাইছেন, কেউ প্লাসে লিকেজের ব্যবস্থা করে আর্থ-কানেকশনটা কেটে রেখেছিল। যাতে আলো জ্বালতে গেলেই ধ্রুব চৌধুরী কারেন্ট জর্জরিত হয়ে মারা যান। হতে পারে। বেশ, আমি কেসটা নেড়ে-চেড়ে দেখব। সেদিন যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের পরিচয় আমায় দিন তো!

ব্রতীন সকলের পরিচয় দিল। কৃষ্ণাকে নিয়ে ধ্রুবর সঙ্গে কদম মল্লিকের কিরকম সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল তাও জানাল। সেদিন সন্ধ্যায় কি সমস্ত কথাবার্তা হয়েছিল তাও জানাতে ভুলল না।

—কৃষ্ণা রায় তাহলে আপনার বন্ধুকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন?

—আমাকে তো ধ্রুব তাই বলেছিল।

—কদম মল্লিক এই ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতেন বলে আপনার ধারণা?

—আমার তা মনে হয় না! মল্লিক একটা আস্ত শয়তান। সে কোন-না-কোন উপায়ে গোলমাল বাধাতই।

—গোলমাল বাধাবার আর প্রয়োজন হল না। চমৎকারভাবে মীমাংসা হয়ে

গেছে। কদম মল্লিক সহজেই কৃষ্ণা রায়কে বিয়ে করতে পারবেন।

ব্রতীন উত্তেজিতভাবে বলল, আপনি বলতে চাইছেন মল্লিক এইভাবে নিজের পথ থেকে ধ্রুবকে সরিয়ে দিলেন?

—আমি এখন কিছু বলতে চাইছি না। যাক ওকথা, মিঃ চৌধুরীর ওয়ারিশান কে?

—ওর সমস্ত কিছু এখন পাবে চকবেড়ে হাই স্কুল। ওখানেই ও পড়ত।

—এরকম ব্যবস্থার কারণ?

ধ্রুব চিরকালই বেশ খামখেয়ালি। হঠাৎ একদিন উইল করে বসল। এই অল্প বয়সে, বিশেষ করে এই ধরনের উইল করার কি অর্থ আমি জানতে চেয়েছিলাম। বলেছিল, এমনি করলাম। পরে যদি বিয়ে করি তাহলে পাল্টাব।

—আপনাকে আর আটকে রাখব না, মিঃ সোম। আজ থেকেই আমি কাজে লেগে পড়ছি।

—একটা কথা কিন্তু…মানে…আপনার…

—আমার পেমেন্টের বিষয় বলতে চাইছেন? ব্যস্ততার কি আছে! ও নিয়ে পরে কথা হবে।

ব্রতীন বিদায় নিল।

বাসব কয়েক মিনিট কি যেন চিন্তা করে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল। হোমিসাইড স্কোয়াডের মিঃ সামন্তকে পাওয়া গেল লাইনে।

—হ্যালো…আমি বাসব বলছি…

—নমস্কার…কি খবর…

বাসব ধ্রুব চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে বলার পর বলল, থানা কেসটিকে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবেই ট্রিট করবে। কিন্তু মিঃ চৌধুরীর এক বন্ধু মার্ডার কেস হিসেবে একে চিহ্নিত করতে চান। তিনি সে সম্পর্কে কিছু যুক্তিও দিয়েছেন এবং ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে। এক্ষেত্রে আমি আপনার সহযোগিতা চাইছি।

—আমি এখুনি এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছি। নিশ্চয়ই সাহায্য পাবেন। চলে আসুন না এখানে!

—বেশ। ছাড়লাম!

বাসব দুপুরবেলা পৌঁছল ধ্রুবর এলগিন রোডের বাড়িতে। সঙ্গে মিঃ সামন্তও রয়েছেন। স্থানীয় থানা-ইনচার্জ নির্দেশ মত আগেই উপস্থিত হয়েছেন। বাসব ভেতরে ঢোকার আগে বাড়ির চারধার ঘুরে দেখবার মনস্থ করেছিল। কয়েক পা এগোবার পরই সকলের গতিরোধ হল। ব্রতীনের কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। দেখা গেল, আর্থ-কানেকশন কাটা।

ঘোরাঘুরি করে আর উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না। সকলে এবার ওপরে এসে উপস্থিত হলেন। ধ্রুবর ঘরের বন্ধ দরজা ইন্সপেক্টার খুলে দিলেন। অদ্ভুত শূন্যতা যেন সকলকে গ্রাস করতে এল। জানলা খুলে দেওয়া হল। আলোয় ঘর ভরে যাবার পর বাসব দৃষ্টি বুলিয়ে নিল চারিদিকে। একজন আধুনিক ধনীর শোবার ঘর যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তাই। দেওয়ালে একাধিক ব্রাকেট ও বড় ল্যাম্প লাগান। সুইচবোর্ড বারান্দার দিকে দরজার পাশে। সেই মারাত্মক প্লাগ এখন আর সুইচবোর্ডের সমান্তরালে নেই—ঝুলে পড়েছে মেঝে পর্যন্ত। ধ্রুব চৌধুরীর শরীরের ভারেই এমনটা হয়েছে বলা বাহুল্য।

বাসব বলল, প্লাগ বোধহয় এখন আর অ্যাকসানে নেই!

ইন্সপেক্টার উত্তর দিলেন, না। ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি গডরেজের দুটো আলমারি একধারে ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, এ দুটো ঘেঁটে দেখতে চাই। ইন্সপেক্টার চাবি এনেছেন তো?

ধ্রুবর পকেটেই 'কী কেস' পাওয়া গিয়েছিল। ইন্সপেক্টার সমর্থনসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে পকেট থেকে 'কী কেস' বার করে একটা আলমারি খুললেন। ঝোলান ও পাটকরা অবস্থায় জামা-কাপড় ঠাসা। কোন লকার নেই। কিছু দেখবার ছিল না। তবুও জামা-কাপড় নাড়াচাড়া করে বাসব কোন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখল। এবার খোলা হল দ্বিতীয় আলমারিটা। অজস্র ফাইল রয়েছে এতে। ব্যবসার মূল্যবান সমস্ত ফাইল বোধহয়। মোটা মোটা বাঁধানো খাতাও রয়েছে গোটাদশেক। এতে লকার লাগান রয়েছে। লকার খোলা হল। তার মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া গেল। যেমন আয়রন সেফের চাবি, ভল্টের চাবি, গোটাকয়েক বাক্সসমেত বোতাম ও আংটি, ইন্সিওরেন্সের খানপাঁচেক পলিসি, ব্যাঙ্কের চারটে পাসবই, সেই সংখ্যক চেকবইও, ইত্যাদি।

বাসব চেকবইগুলো একে একে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখা গেল গত পরশু, অর্থাৎ যে রাত্রে ধ্রুব মারা যায় সেই দিন দুটো চেক কাটা হয়। দুটো মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যাট হাজার। কি জন্য টাকাটা তোলা হয়েছে কাউন্টার পার্টে তা লেখা নেই। শুধু তারিখের উল্লেখ রয়েছে। বাসব চেকের নম্বর দুটো টুকে রাখল নোটবইয়ে।

—আয়রন সেফটাও খুলে দেখা যাক!

সামন্ত বললেন, বেশ তো!

খাটের ওপাশের দেওয়ালের সঙ্গে আয়রন সেফ গাঁথা রয়েছে। লকার থেকে চাবি বার করে বাসব সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চাবি লাগিয়ে পাল্লা খুলতে গিয়েই বাসব চমকে উঠল। একি, চাবি অন্য দিকে ঘুরছে কেন? তবে কি সেফ খোলা রয়েছে? সন্দেহ অমূলক নয়—হাতল ধরে টান দিতেই পাল্লা খুলে এল। সকলে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আয়রন সেফের মধ্যে একটা তামার পয়সাও নেই—সম্পূর্ণ খালি!

মিঃ সামন্তর গলা থেকে বেরিয়ে এল, স্ট্রেঞ্জ—

বাসব আয়রন সেফের কাছ থেকে সরে এসে বলল, আর সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কেসটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, মার্ডারই। মোটিভও মোটামুটি বুঝতে পারা গেল।

—আপনি বলতে চাইছেন, কেউ সেফ থেকে ষাট হাজার টাকা বার করে নেয় এবং ব্যাপারটা মিঃ চৌধুরী বুঝতে পারার আগেই তাঁকে ওইভাবে সরিয়ে নেবার প্ল্যান করে।

—শুধু ষাট হাজার নয়, সেফের মধ্যে আরো অনেক কিছু ছিল নিশ্চয়ই। সমস্তই সরিয়েছে হত্যাকারী। দুরন্ত লোভের এইভাবে জয় হয়েছে বলা চলে। তবে···

—কিন্তু আয়রন সেফের চাবি ছিল বন্ধ গডরেজের মধ্যে। গডরেজের চাবি পাওয়া গেছে মিঃ চৌধুরীর পকেটে। এক্ষেত্রে হত্যাকারী সেফ খুলেছিল কিভাবে?

—কোথাও একটা বিরাট ফাঁক আছে। এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এখন ওকথা থাক। আসুন, বেয়ারাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিই। সংশ্লিষ্ট সকলের ফোন নম্বর বোধহয় আপনার কাছে আছে ইন্সপেক্টার। ওঁদের খবর দিন এখানে চলে আসবার জন্য।

তিনজন বেয়ারা বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। বাসব তাদের সঙ্গে কথা আরম্ভ করল। মিঃ সামন্ত একজন এস. আই-কে ইঙ্গিত করলেন সমস্ত নোট নিতে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রশ্ন-উত্তর চলল। মোটামুটি সারাংশ এই রকম। প্লাগটা লাগান হয়েছিল মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে। বিছানায় শুয়েই যাতে রাত্রে আলো জ্বালা যায় তাই এই ব্যবস্থা। প্লাগের সঙ্গে লম্বা তার থাকায় বিছানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হত না। সকালে আবার ঝুলিয়ে রাখা হত দরজার পাশের ব্র্যাকেটে। একমাত্র কদম মল্লিক ছাড়া এ বাড়িতে বাকি চারজনের যখন-তখন যাওয়া-আসা ছিল। এমনকি ধ্রুবর অনুপস্থিতিতেও তাঁরা আসতেন। সেদিন সকালে ও দুপুরবেলাতেও কোন-না-কোন সময় সকলেই এসেছিলেন, দু-দশ মিনিট বা আধঘণ্টার জন্য। এমনকি কদম মল্লিকও। মল্লিকের সঙ্গে ধ্রুবর উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছিল বেয়ারারা শুনেছে। তবে আলোচনার বিষয় তারা বলতে পারবে না। না, সন্দেহজনক কিছু তারা দেখেনি। ফুরসতও অবশ্য ছিল না। বাড়িতে ভোজ থাকায় সকলের খুব ব্যস্ততা গেছে। দুদিন ধরে সাহেব অসুস্থ ছিলেন। ওই দুদিন তিনি বাড়ি থেকে বাইরে যাননি।

বেয়ারাদের ছেড়ে দিয়ে বাসব অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করল। তারপর মিঃ সামন্তকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এল নিচে। ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টার সকলকে খবর দিয়েছেন। তাঁরা এসে পড়লেন বলে! নিচে এসেও বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে

আনমনে কি সমস্ত চিন্তা করতে লাগল। প্রথমে অমল দত্ত এলেন। দশ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হলেন বাকি চারজন। বাসব ও মিঃ সামন্তর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টার। সাধারণ নিয়মে আলাপের প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হলেও, এক ব্রতীন ছাড়া আর সকলের মুখেই বিস্ময়ের ভাব।

বাসব বলল, এখানে আমার উপস্থিতি আপনাদের বিস্মিত করেছে বুঝতে পারছি। আসল কথায় আসা যাক, সেদিন মিঃ চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যাননি, তাঁকে খুন করা হয়েছে এই সন্দেহ নিয়ে ব্রতীনবাবু আমার কাছে যান। প্রাথমিক তদন্তের পর আমরা দেখলাম তাঁর সন্দেহ অমূলক নয়। কাজেই আমাদের দায়িত্ব যে কি পরিমাণে বেড়ে গেল, তা সহজেই অনুমেয়। আশা আছে আপনারা এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

কদম মল্লিক বললেন, অ্যাবসার্ড! ওইভাবে কেউ কাউকে কখনো খুন করতে পারে? ভুলে যাবেন না; আমরা প্রায় সবাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম।

—আপনাকেও আমি জানিয়ে রাখতে চাই মিঃ মল্লিক, একেই কোল্ডব্লাডেড মার্ডার বলে। একজন ধূর্ত মানুষ নিজের স্বার্থের অনুকূলে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে মিঃ চৌধুরীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে তাকে খুঁজে বার করা। যাহোক, আমি পাশের ঘরে গিয়ে বসছি। ব্রতীন-বাবু ছাড়া আপনারা একের পর এক ওখানে আসুন। কিছু প্রশ্ন আছে।

বাসব উত্তরের অপেক্ষা না করে পাশের ঘরে চলে গেল। এস. আই.-ও গেল নোট নিতে। সকলে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। বাসবের গোড়ালি কারুরই ভাল লাগল না বোধহয়। ব্রতীন অবশ্য বুঝিয়ে বলল সকলকে, সে বাসবকে এই তদন্তে নিযুক্ত করেছে। এই কথায় কে-কতটা আশ্বস্ত হলেন বোঝা গেল না। তবে কদম মল্লিকই প্রথমে গেলেন পাশের ঘরে।

বাসব কোন ভূমিকা না করেই বলল, শুনলাম কৃষ্ণাদেবীকে নিয়ে ইদানিং আপনার ও মিঃ চৌধুরীর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না?

ভ্রু কুঁচকে মল্লিক বললেন, ধ্রুবর মৃত্যুর সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি?

—হয়ত নেই। কিন্তু আমার তো সমস্ত রকম সম্ভাবনাকেই বাজিয়ে দেখতে হবে। আপনি আপত্তি করবেন না, মিঃ মল্লিক!

—হিচ বলতে যা বোঝায়, তা আমাদের ছিল না। এমনকি ও প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা কোনদিন হয়নি আমাদের মধ্যে। তবে দুজনেই দুজনের প্রতি জেলাস ছিলাম, এটা ঠিক।

—এ ব্যাপারে কৃষ্ণাদেবীর এ্যাকটিভিটি কি রকম ছিল?

—এ ব্যাপারে সে প্রথমশ্রেণীর ডিপ্লম্যাট। আমাদের দুজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল পক্ষপাতশূন্য। তবে—

—তবে কি? বলুন?

—আমার ধারণা, চৌধুরীর দিকেই কৃষ্ণা বেশি ঝুঁকেছিল।

—এইরকম ধারণা করার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে ?

—নির্দিষ্ট কোন কারণ নেই। আমার চেয়ে চৌধুরীর ব্যাংক ব্যালেন্স বেশি, বয়স কম, স্মার্ট—এই সমস্ত বিষয় কৃষ্ণার মনে রেখাপাত করেছে বলে আমার ধারণা হয়েছিল।

মৃদু হেসে বাসব বলল, এখন তো আর কোন বাধা রইল না। জীবন ভরিয়ে তুলুন !

—কৃষ্ণা মত দিলে তা ই হবে। এবার কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে মল্লিক বললেন, আপনার কি ধারণা হচ্ছে এইভাবে চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে আমি নিজের পথ পরিষ্কার করেছি ? তাহলে জানিয়ে রাখতে চাই···

—আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন। এই মুহূর্তে কি ধারণা করলাম, সুদূর-প্রসারী কোন অর্থ তার না-ও হতে পারে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। অনুগ্রহ করে অমলবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

অমল দত্ত এলেন।

—বসুন ! ব্রতীনবাবুর মুখে সমস্ত কিছুই শুনেছি। কাজেই ওসমস্ত নিয়ে আলোচনা করব না। বর্তমানে মিঃ চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবনের দু-চার কথা জেনে নেবার আগ্রহ আমার রয়েছে।

—বলুন ?

—তিনি কি কৃষ্ণা রায়কে নিয়ে কখনো কোন আলোচনা আপনার সঙ্গে করেছিলেন ?

—বহুবার। ইদানিং কৃষ্ণার সম্পর্কে সে বেশ উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। আমরাও চাইছিলাম তার জীবনে কেউ আসুক।

—কেন ?

আমার বোনের মৃত্যুর পর থেকে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল ধ্রুব। তার জীবনকে ভরিয়ে তোলার জন্য একজনের প্রয়োজন ছিল।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, কিন্তু দুজনের মাঝখানে কাঁটার মত বিরাজ করছিলেন কদম মল্লিক।

—তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কদম মল্লিকের মত বহু লোককে ধ্রুব বহুবার পেছনে ফেলেছে।

—হুঁ ! কিন্তু এখন ; এখন কি মনে হয়, কৃষ্ণা রায় মল্লিকের দিকে ঝুঁকবেই ?

অমল দত্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার। কৃষ্ণা যদি কালই মল্লিককে বিয়ে করে বসে আমি অবাক হব না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা, সেদিন সকাল থেকে অতিথিরা আসার আগে পর্যন্ত মুভমেন্ট সম্পর্কে বলুন তো !

—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কিছু বলতে পারব না। কারণ, আমি সারাক্ষণ এ বাড়িতে ছিলাম না।

—তবুও ?

—ভোজের আয়োজনের সাহায্য করবার জন্য ধ্রুব সকালে আমাকে ডেকেছিল। সাড়ে ন-টার সময় যখন এ বাড়ি থেকে যাই, তখন কৃষ্ণা এসে পড়েছিল। আবার আমি তিনটের সময় আধঘণ্টার জন্য আসি।

—তখন আর কেউ ছিল ?

—ব্রতীনবাবু আর ডাঃ পাল ছিলেন। অবশ্য তাঁরা কয়েক মিনিট পরেই চলে গেলেন।

—মিঃ চৌধুরী কোথায় ছিলেন ?

—দুবারই তাকে এই ঘরে বসে থাকতে দেখেছিলাম। অসুস্থ থাকার দরুণই বোধহয় ওপর-নিচ করছিল না।

—আচ্ছা, সেদিন কোন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এ বাড়িতে এসেছিল কি না বলতে পারেন ?

—দোতলার বাথরুমের লাইনটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ধ্রুব মিস্ত্রি ডেকেছিল।

—মিস্ত্রির নাম কি ? থাকে কোথায় ?

—আমি জানি না। বেয়ারা হয়ত বলতে পারে।

—ধন্যবাদ, মিঃ দত্ত। আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। ডাঃ পালকে পাঠিয়ে দিন।

মিঃ সামন্ত কয়েক মিনিট আগে ঘরে এসে প্রশ্ন-উত্তর শুনছিলেন। বাসব তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেলে বেয়ারাদের আবার ডাকাতে হবে।

—ওই মিস্ত্রির সম্পর্কে…

—একজ্যাক্টলি !

ডাঃ পাল এসে বসলেন দুজনের সামনে।

—আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। মাত্র গোটাকয়েক প্রশ্ন আছে।

ডাঃ পাল চুপ করে রইলেন।

বাসব আবার বলল, মিঃ চৌধুরীর স্বাস্থ্য কেমন ছিল ?

—হার্টের পেসেণ্ট ছিলেন। কাজকর্ম কিছুদিন ছেড়ে বিশ্রাম নিতে আমি ওঁকে বহুবার বলেছি। শোনেননি।

—আচ্ছা, আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?

—সন্দেহ ! মিঃ চৌধুরী খুন হয়েছেন আপনারা বলছেন বটে, তবে আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। চোখের ওপর দেখলাম একটা অ্যাক্সিডেণ্ট…

—না। তিনি খুন হয়েছেন। আপনি তাহলে কাউকে সন্দেহ করেন না ? বাসব প্রশ্নের মোড় ঘোরাল, সেদিন দুপুরে একবার আপনি এ বাড়ি এসেছিলেন না ?

—হ্যাঁ। মিঃ চৌধুরী শরীর এগজ্যামিন করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ব্রতীনবাবুও ছিলেন সে সময়।

—কতক্ষণ ছিলেন ?

—প্রায় ঘণ্টা খানেক। অমলবাবু আসার পর আমরা উঠে যাই।

—তখন আর কেউ এসেছিল ?

—একজন ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি।

—আপনি তাকে চেনেন ?

—চিনব কি ? আগে তাকে কখনো দেখিনি। একজন লোককে বাইরে থেকে এসে ওপরে উঠতে দেখে মিঃ চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি। খেতে গিয়েছিল, এখন ফিরছে।

—এখন আপনি যেতে পারেন, ডাঃ পাল। কিছুক্ষণ উত্ত্যক্ত করলাম।

—না—না—তাতে কি হয়েছে !

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মৃদু হেসে মিঃ সামন্ত বললেন, এবার এই নাটকের নায়িকার সঙ্গে কথাবার্তা বললেই হয়, কি বলেন ?

বাসব উত্তর দেবার আগেই দুজনকে চমৎকৃত করে কৃষ্ণা ঘরে প্রবেশ করল। তার চলনে কোন জড়তা নেই। সোফায় বসতে বসতে বলল, আমার একটু তাড়া আছে। তাই না ডাকতেই চলে এলাম।

—ব্রতীনবাবুর সঙ্গে এখন আমার কোন কথা নেই। এবার আপনাকেই ডাকতাম। এসে পড়ে ভালই করেছেন। আপনি কাউকে সন্দেহ করেন ?

—সন্দেহ !

—মিঃ চৌধুরীর খুন হওয়ার সম্পর্কে বলছি।

—না। ঘটনাটা এত আকস্মিক—দুঃখজনক যে, আর কিছু মনের মধ্যে স্থান পাচ্ছে না।

—এবার ব্যক্তিগত কথায় এসে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইছি। শুনলাম, মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার বিয়ে প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল ?

কৃষ্ণা মুখ অন্য ধারে ঘুরিয়ে বলল, ওকথা তুলে আর লাভ কি !

—এখন কি করবেন স্থির করলেন ?

—আগেও যা করতাম। কলেজে পড়িয়ে যাব।

—না···মানে···

—ও, বিয়ের কথা বলছেন ? না, এত তাড়াতাড়ি কিছু কি স্থির করা যায় ? আমাকে এবার ছেড়ে দিন, মিঃ ব্যানার্জী। ভীষণ ব্যস্ততা আছে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই কৃষ্ণা সোফা ছেড়ে উঠে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। মিঃ সামন্তর দিকে তাকিয়ে হাসল বাসব। সময় অবশ্য নষ্ট করা আর হল না। ইন্সপেক্টার বেয়ারা তিনজনকে ডেকে আনলেন। দ্বিতীয়বার আহ্বান

করায় তারা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। যাইহোক, প্রশ্ন-উত্তরে জানা গেল, প্রথরংগের আলো ঠিক করার জন্য ধ্রুবই গিয়ে ঠিক করেছিল। তার নাম বা ঠিকানা তারা কিছুই জানে না। এমনকি আগে কখনো তাকে দেখেনি পর্যন্ত।

বেয়ারারা বিদায় নেবার পর মিঃ সামন্ত বললেন, কিরকম বুঝছেন?

—এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। সমস্ত কিছু গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। কাল দুপুরে চৌরঙ্গীর দুটো ব্যাংকে যেতে চাই। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।

—কোন এনকোয়ারি আছে মনে হচ্ছে?

বাসব সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে নিভন্ত পাইপ আবার অনেকক্ষণ পরে ধরাল। কথা হল খাপছাড়াভাবে আরো মিনিট দশেক। তারপর চিন্তিতভাবে বিদায় নিল ওখান থেকে।

পরের দিন সারাটা দুপুর বাসবের বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল। ধ্রুবর যে দুটো ব্যাংকে একাউন্ট ছিল, সেখানে গিয়ে যা জানবার জেনে এসেছে। মিঃ সামন্ত অবশ্য সঙ্গে যেতে পারেননি, বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলেন। তবে ব্যাংকের এনকোয়ারিতে বাসবের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, তার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

বেলা চারটের সময় বাসব হোমিসাইড স্কোয়াডের সঙ্গে যোগাযোগ করল ফোনে।

—হ্যালো······মিঃ সামন্ত······বাসব কথা বলছি······

—বলুন···

—আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সকলকে থানায় ডেকে পাঠান···কেসটা সলভ করে ফেলা গেছে··· ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আপনার কাছে গিয়ে সব কথা বলছি··· ·ইতিমধ্যে একটা সার্চ ওয়ারেন্টের ব্যবস্থা দেখুন ·····নামের জায়গাটা আপাতত ব্ল্যাংক থাক······পরে ভরে নিলেই হবে······। আরো দুচার কথার পর বাসব ফোন ছেড়ে দিল।

তখন সওয়া আটটা বেজে গেছে।

কর্দম মল্লিক, অমল দত্ত, ডাঃ পাল, ব্রতীন ও কৃষ্ণা দুচার মিনিট আগে-পরে সাড়ে সাতটার সময় থানায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তারপর পঁতাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, কিন্তু এখনো বাসবের দেখা নেই। সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের এইভাবে আটকে রাখার অর্থ কি? ইন্সপেক্টার একধারে নির্বিকার মুখে বসে আছেন।

আরো পনের মিনিট পরে বাসব মিঃ সামন্তকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কেউ কিছু বলবার আগেই বলল, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য

ক্ষমা করবেন। আর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসছি। শুনলে আনন্দিত হবেন, মিঃ চৌধুরীর হত্যাকারীকে চিনতে পারা গেছে। সে বাইরের কোন লোক নয়, আপনাদের মধ্যেই একজন নিপুণ পরিকল্পনার সাহায্যে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছেন।

থমথমে মুখে সকলে চুপচাপ বসে রইলেন।

বাসব বলতে আরম্ভ করল, আপাতদৃষ্টিতে এই কেস অত্যন্ত জটিল বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সাদামাটা ব্যাপার। যদিও হত্যাকারী পরিকল্পনায় কোন খুঁত রাখেনি। তবে—যাক সেকথা। বাইরের কোন লোক মিঃ চৌধুরীকে খুন করেনি। সেদিন নিমন্ত্রিত হিসেবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন হত্যাকারী তাঁদেরই মধ্যে একজন। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি এই ঘরে এখন উপস্থিত রয়েছেন। এবার মূল কথায় আসা যাক। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল সেই সনাতন কারণে মিঃ চৌধুরী নিজের জীবন দিয়েছেন। নারীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে অহরহ কত হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হচ্ছে! ভেবেছিলাম, এই বিয়োগান্ত নাটকও সেই ছাঁচে ঢালা এবং নাটকের নায়িকা কৃষ্ণাদেবী। কিন্তু তদন্তের গভীরে প্রবেশ করতেই আমার সেই ভুল ভেঙে গেল। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। অর্থের প্রতি তীব্র লালসার বশবর্তী হয়ে একজন এই কাজ অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় করেছে।

বাসব সকলের মুখের দিকে নিজের দৃষ্টি একবার ঘুরিয়ে নিল। এখনো সেই থমথমে ভাবটা অবশ্য আছে। তবে মনে হয় এইসঙ্গে প্রকৃত ঘটনাটা কি, তা জানবার আগ্রহ এসে মিশেছে। কেউ অবশ্য একটা কথাও বললেন না।

—রুল অব থিয়র ওপর নির্ভর করে বলছি, দুর্ঘটনার আগের দিন মিঃ চৌধুরী হত্যাকারীকে বলেছিলেন চেক ভাঙিয়ে এনে দিতে। তিনি অসুস্থ, কাজেই ব্যাঙ্কে যেতে পারবেন না। ওঁর হয়ে আগেও সে বহুবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে দিয়েছে। সুতরাং অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না। টাকার বিরাট অঙ্ক শুনে এবার তার মনে প্রচণ্ড লোভ সঞ্চার হল। দোতলার বাথরুমের ইলেকট্রিক লাইন খারাপের কথা অজানা ছিল না। সুতরাং পরিকল্পনা মনে দানা বাঁধল সঙ্গে সঙ্গে। বোধহয় সে আলো খারাপের কথা মিঃ চৌধুরীকে কথা প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাভাবিক কারণেই চৌধুরী পরের দিন একজন মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিতে বলেন।

হত্যাকারী যথা নিয়মে একজন মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দেয় পরের দিন। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই টাকার ব্যবস্থা ছিল। তার আর্থ কাটতে ও পুসারে কারচুপি করে রাখতে অসুবিধে হয়নি। টাকা নিয়ে হত্যাকারী তিনটের সময় এ বাড়িতে এল। এই টাকা পরে বিকেলে পেমেণ্ট করবার কথা—এই কারণে চৌধুরী নাগপুরে যেতে পারছিলেন না। উনি নিচে বসেছিলেন। হত্যাকারীকে টাকাটা আয়রন সেফে রেখে আসতে বললেন। তাঁর স্বভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে সে

পরিচিত। কাজেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। টাকাটা ঠিকমত রাখা হলেও, সেফে চাবি লাগান হল না। ক্রমে সন্ধ্যা হল। অতিথিরা সব এসে পড়লেন। হত্যাকারীকে তখন কারণে বা অকারণে কয়েকবার ওপর-নিচ করতে হয়েছিল। এক ফাঁকে সেফ থেকে টাকাটা বার করে তোয়ালে, গামছা বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে বেঁধে জানলা গলিয়ে বাগানে ফেলে দেয়। মিঃ চৌধুরী মারা যাবার পর, বাড়ি যাবার পথে বাগান থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি কার কথা বলছি। এ সেই ব্যক্তি, যাকে মিঃ চৌধুরীর বিশ্বাস না করার কোন কারণ ছিল না, যে এ বাড়ির অন্দি-সন্দি জানত, সময় অসময়ে ওপরে বার বার গেলেও বেয়ারারা পর্যন্ত যাকে সন্দেহ করত না……

বাসব একটানা এতটা বলবার পর আচমকা থেমে গেল।

সকলে নড়েচড়ে বসলেন।

ব্রতীন দ্রুতগলায় বলল, আপনি বলতে চাইছেন……মানে……

—আপনি বোধহয় ঠিকই অনুমান করেছেন, মিঃ সোম। হ্যাঁ, আমি অমলবাবুর কথাই বলছি।

অমল দত্ত চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লেন। আজে-বাজে কি সব বলছেন মিঃ ব্যানার্জী? আমি ধ্রুবকে খুন করেছি?

—লোভে অন্ধ হয়ে বাবাকে কত ছেলে ছুরি মেরেছে। আপনি ভগ্নিপতিকে খুন করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

—হাউ ডেয়ার ইউ আর! আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কি?

—ব্যাঙ্কের সেই চেক দুটোর কথা ভুলে যাবেন না। চেকের পেছনে আপনার সই আছে আমি নিজের চোখে দেখেছি। টাকাটা আপনি ব্যাঙ্ক থেকে এনেছিলেন প্রমাণ হল। দ্বিতীয় এবং মোক্ষম প্রমাণ হচ্ছে, আপনি থানায় আসার পর পুলিশ আপনার বাড়ি সার্চ করেছে। যার জন্যে আমার ও মিঃ সামন্তের এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল। সমস্ত একশ টাকার নোট হওয়ায় ব্যাঙ্ক থেকে সেগুলির নম্বর সংগ্রহ করতে অসুবিধে হয়নি। সার্চ করে সেই সমস্ত নম্বরের নোট আপনার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। এছাড়াও পাওয়া গেছে আরো অনেক মূল্যবান জিনিস। মনে হয় সেগুলিও মিঃ চৌধুরীর।

অমল দত্ত আর কিছু বলতে পারলেন না। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কোনরকমে। ইন্সপেক্টার দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। ব্রতীন ও কদম মল্লিক ততক্ষণে বাসবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মল্লিক বললেন, এই নিপুণ তদন্তের জন্য আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছিনা!

ধন্যবাদের কিছু নেই। আমি আমার কাজ করেছি, মিঃ মল্লিক।

একটু কিন্তু কিন্তু ভাবে ব্রতীন বলল, আমাদের দেনাপাওনাটা কিন্তু

বাকি রইল !

—পেমেণ্টের কথা বলছেন ? বেশ তো, কাল আসুন না বাড়িতে ! আমি এখন তাহলে চলি ! মিঃ সামন্ত, সেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন । খুঁজে পেলে আমায় খবর পাঠাতে ভুলবেন না যেন !

পাইপে মিকশ্চার ঠাসতে ঠাসতে বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

রৌনাক রহস্য

আজকের ডাকেই এসেছে চিঠিখানা। এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে এসেছে। ভারি পুরু লেটার প্যাডে ইংরাজিতে টাইপ করা। বাসব পড়েছে চিঠিটা একবার। পত্রের প্রতিটি ছত্রই ওকে অবাক করেছে। কোথায় যেন একটু রহস্যের গন্ধ মেশান রয়েছে। ও আবার তুলে নিল চিঠিখানা। কয়েক লাইন মাত্র লেখা—

মান্যবর বাসববাবু,

বুধবার সন্ধ্যা পাঁচটায় রয়ডন স্ট্রীটের এভারেস্ট কাফেতে আসবেন। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আসতে ভুলবেন না যেন। শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

ভবদীয়
শ্রীদেবীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব
দেওয়ান, টিকাপুর

আজই বুধবার। বাসব রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল—পৌনে চারটে। আর মিনিট কুড়ি পরে বেরিয়ে পড়লেই হবে। কিন্তু এভারেস্ট কাফেতে গিয়ে ও পত্রলেখককে চিনবে কি করে। চিঠিতে ও-বিষয়ের কোন উল্লেখই নেই। অবশ্য ও-বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। বাসব ভেবে দেখে, চিঠির নির্দেশ মত ঘটনাস্থলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তারপর যা হয় হবে।

ইচ্ছে করেই ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় বাসব এভারেস্ট কাফেতে প্রবেশ করল। নানা স্তরের নরনারী জেল্লাদার পোশাকে সজ্জিত হয়ে যে-যার নিজের চেয়ারে বসে কাফের শোভাবর্ধন করছেন। চাপা মৃদু গুঞ্জনে ভারি হয়ে রয়েছে চতুর্দিক।

বাসব কয়েক পা এগোল। তাকাল এধার-ওধার।

এই সময়ে দ্রুতপায়ে একটি যুবককে তারই দিকে আসতে দেখা গেল। দামী স্যুট পরিহিত যুবকটি তার সামনে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল, আসুন! আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

বাসব একটু বিস্মিত হলেও অনুমান করল, মৌখিক আলাপ না থাকলেও পত্রলেখক তার চেহারার সঙ্গে পরিচিত, বেশ বোঝা যাচ্ছে। যুবকটির দিকে ও তাকাল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই। দোহারা গৌরবর্ণ চেহারা! সুন্দর মুখশ্রী। তবে বাঁ-চোখটা কেমন যেন স্থির। হয়ত কোন কঠিন রোগেই এ-রকমটা হয়েছে।

—আসুন! যুবকটি অগ্রবর্তী হল। বাসব ওকে অনুসরণ করল।

হলটা পার হয়ে ওরা দুজনে একটা কেবিনে প্রবেশ করল। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেখানে বসেছিলেন। বাসবকে বসতে অনুরোধ করলেন তিনি। ও একটা চেয়ারে বসল।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললেন, আমি আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম। আমারই নাম দেওয়ান দেবীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব।

বাসব একবার ভাল করে দেখে নিল দেওয়ান দেবীপ্রসাদকে। শান্ত, সৌম্য চেহারা। বয়স ষাট-এর কোঠা পার হয়েছে। সাজসজ্জায় যথেষ্ট আভিজাত্যের পরিচায়ক।

তিনি আবার বললেন, একটু অবাক হচ্ছেন বোধহয়? হবারই কথা। এবার আমি বলব, কেন আপনাকে এখানে ডেকেছি। প্রেম—

যুবকটি সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—প্রেম, তুমি বাইরে একটু পাহারা দাও। কেউ যেন এধারে না আসতে পারে।

—যে আজ্ঞে!

যুবকটি কেবিন থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। বৃদ্ধ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ভাইপো প্রেমপ্রকাশ। আমাকে য়্যাসিস্ট করে। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। আপনি মুঙ্গেরের নাম শুনেছেন?

বাসব ধীর কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ। এমন কি কার্যসূত্রে আমাকে যেতে হয়েছিল একবার ওখানে।

—তাহলে তো আপনি জানেনই, তিনধারে পাহাড় আর একধারে গঙ্গা পরিবেষ্টিত এই সুন্দর শহরটির কথা। টিকাপুর ওখান থেকে মাইল আটেক দূরের একটি বিখ্যাত জমিদারী। আমি সেখানকারই দেওয়ান।

দেবীপ্রসাদ থামলেন। কথাবার্তা অবশ্য সমস্তই ইংরাজিতে হচ্ছিল। সোনার সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলেন বাসবের দিকে। বাসব কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। দেবীপ্রসাদও নিলেন একটা।

দুটো সিগারেটেই অগ্নিসংযোগ করা হল। তারপর তিনি আবার বললেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কোন বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাকে আমি স্মরণ করেছি!

—তা পেরেছি। তবে প্রয়োজনটা—

—এইবার বলছি, কিন্তু তার আগে আমায় জানতে হবে, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন কিনা। অবশ্য এর জন্যে আপনাকে মোটা অঙ্কের অর্থ দেওয়া হবে।

—কিন্তু কাজটা কি আমার জানা না থাকায়, কথা দেওয়া একটু শক্ত হচ্ছে।

—বেশ, আপনাকে বলছি। তবে কেসটা যদি আপনার পক্ষে টেকআপ করা সম্ভব নাও হয়—তবু আপনাকে যা বলছি, তা আপনি কারুর কাছে

প্রকাশ করবেন না, এই আমার অনুরোধ।

—বেশ তাই হবে।

—আপনাকে আগেই বলেছি, টিকাপুর একটি বিখ্যাত জমিদারী। শুধু তাই নয়, এই জমিদারীটি যাদের, তাঁদের বংশের ইতিহাসে একটি সুমহান ঐতিহ্যময় পথ দিয়ে নেমে এসেছে। এখানকার বর্তমান অধিপতি হলেন কুমার রামেন্দ্রনারায়ণ জাদাব। তিনি বয়সে তরুণ এবং শিক্ষিত। তাঁরই নির্দেশে আমি আপনাকে আহ্বান করেছি। এই তো গেল ভূমিকা। এবার আসল কথা শুনুন। এই পরিবারের বহু হীরে, মুক্তো, পান্না প্রভৃতি আছে। এই পরিবারের কেউ কেউ দামী পাথর সংগ্রহের নেশায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গেছেন। বিহারের কোন রাজ-পরিবারের সংগ্রহশালায় এ-রকম দামী সংগ্রহ পাওয়া যাবে না। এই মণি-মুক্তোগুলির মধ্যে একটি হীরেই শ্রেষ্ঠ। এই হীরেটিকে বংশ পরম্পরা ধরে এঁরা কুলদেবতার মত শ্রদ্ধা করে এসেছেন। হীরেটির একটি চমৎকার নাম আছে—'রৌনাক'। কিছুদিন আগে কুমারসাহেব আমাকে আদেশ দেন রৌনাকের সংস্কার করাতে, অর্থাৎ পালিশ এবং কাটিং-এর সাহায্যে ওর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। তাঁর আদেশ মত আমি রৌনাককে ব্রুসেলসে পাঠালাম। হপ্তাখানেক আগে নতুন রূপ নিয়ে ফিরেও এসেছে বেলজিয়াম থেকে রৌনাক। তবে বিপদ দেখা দিয়েছে তারপর। দিন চারেক আগে কুমারসাহেব আমাকে ট্রাঙ্ক-কল করেছিলেন, তিনি একটা চিঠি পেয়েছেন, যাতে রৌনাককে দাবী করা হয়েছে। এবং এ-ও লেখা আছে, ছলে বলে কৌশলে পত্রলেখক রৌনাককে হস্তগত করবে।

বাসব প্রশ্ন করল, পত্রলেখকটি কে?

—যদিও পত্রলেখকের নাম চিঠিতে নেই, তবু আমরা জানি এ-কাজ কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের। তিনি কুমারসাহেবের বৈমাত্রেয় ভাই। অত্যন্ত উদ্ধত আর বেপরোয়া। কিছুদিন ধরেই রৌনাকের ওপর চোখ পড়েছে ছোটকুমারের।

—ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল নেই বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, ওঁরা কি একসঙ্গে বাস করেন না?

—না। ছোটকুমার মুঙ্গের শহরে থাকেন।

—কিন্তু আমার কাছ থেকে কি রকম সাহায্য আপনারা চান, বুঝতে পারছি না।

—কুমারসাহেবের অনুমান কলকাতা থেকে হীরেটা টিকাপুর নিয়ে যাওয়ার পথে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই এমনভাবে রৌনাককে উনি এখান থেকে নিয়ে যেতে চান, যাতে কেউ ব্যাপারটা বুঝতে না পারে। আমরা কেউ জিনিসটা নিয়ে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। হয়ত শত্রুপক্ষ কাছেই কোথাও ওৎ পেতে আছে! দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাতকারটা কত গোপনে করবার চেষ্টা করেছি আমি। এখন আপনি যদি রৌনাকের ভার গ্রহণ

করেন, তাহলে—

—অর্থাৎ, বিপক্ষের চোখ বাঁচিয়ে আমাকে হীরেটা কুমারসাহেবের হাতে পৌঁছে দিতে হবে—আপনি নিশ্চয়ই এই কথাই বলছেন ?

দেওয়ান দেবীপ্রসাদ বললেন, ঠিক তাই। তবে আপনার রিস্ক অনেক কম। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ওপরই নজর রেখেছে। আপনি সহজেই কার্যোদ্ধার করতে পারবেন।

—বেশ! কাজটা আমি নিলাম। হীরেটা এখন আছে কোথায় ?

চাপা কণ্ঠে দেওয়ান বললেন, ভোল্টে ছিল। উপস্থিত আমার পকেটেই আছে।

…ওর কত দাম হবে দেওয়ানজী ?

—দাম! দেবীপ্রসাদ হাসলেন, বাজারে দাম হয়ত হাজার দশেকের বেশি হবে না, ঐতিহ্য আর মর্যাদার দিক থেকে রোনাকের দাম কোটি টাকার ওপর। কিন্তু আর দেরি করে লাভ নেই, আজ রাত্রের গাড়িতেই আপনাকে রওনা হতে হবে। এই নিন—

একটা টাইম টেবিল আর কিছু কাগজপত্র তিনি বাসবের দিকে এগিয়ে দিলেন—এর মধ্যে আপনার পরিচয়পত্র আর মুঙ্গের থেকে টিকাপুর যাওয়ার সমস্ত নির্দেশ দেওয়া রইল।

বাসব কাগজগুলো পকেটে রাখতে রাখতে বলল, আপনারা তাহলে এখন কলকাতা থেকে যাচ্ছেন না ?

—না। আমি অমৃতসর মেলে রওনা হব। আপনি যাবেন আমার দু-ঘণ্টা পরে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে। আমি আগেই গিয়ে টিকাপুর পৌঁছতে পারব। শত্রু যদি সত্যি আমাদের পিছু লেগে থাকে, তাহলে সে আমারই পিছু নেবে। আপনি নিরাপদ থাকবেন।

দেবীপ্রসাদ নিজের পকেট থেকে একটা গিনির সাইজের চেপ্টা কৌটো বার করে বাসবের হাতে দিলেন।

—সাবধানে রাখুন। ওতেই আছে। আর এই তিনশো টাকাও থাক আপনার কাছে, খরচ-খরচার জন্যে। প্রেম—

পরমুহূর্তে প্রেমপ্রকাশ কেবিনে প্রবেশ করল।

—ওয়েল মিস্টার ব্যানার্জী, আই উইস ইয়োর সাক্সেস। কাফের পেছনের দরজা দিয়ে বেরুবেন। প্রেম আপনাকে পথ দেখাবে।

প্রেম প্রকাশের সঙ্গে বাসব বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। তারপর দুজনে এগিয়ে চলল এভারেস্ট কাফের পেছনের দরজার দিকে।

বাসব হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনারা আমারই বা সাহায্য নিচ্ছেন কেন ?

—কুমারসাহেবের মোরাদাবাদের এক বন্ধু আপনার খুব প্রশংসা করেন প্রায়ই। তাই আপনার সম্বন্ধে কুমারবাহাদুরের ধারণা অত্যন্ত উঁচু। এই ব্যাপারে

সেই কারণেই উনি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তারপর অবশ্য টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানাটা আমরা জোগাড় করে নিই আপনার।

একটা ছোট কৌটো থেকে নস্যি নিয়ে নাকে দিতে দিতে কথাটা শেষ করল প্রেমপ্রকাশ। ওরা এসে পড়েছিল পেছনের দরজাটার কাছে। বাসব বিদায় নিল ওখান থেকে।

আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত সাড়ে ন-টায় শিয়ালদার পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। জামালপুরে পৌঁছয় সকাল আটটা আটত্রিশে। ওখান থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে মুঙ্গের যেতে হবে। মুঙ্গের থেকে গঙ্গা পার হয়ে আবার টিকাপুর। বাসব ভাবতে ভাবতে শিয়ালদায় এসে নামল। তখন পৌনে ন-টা। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে স্টেশনে আসবার আশা ও একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। বেশি কিছু মালপত্তর নেয়নি ও, একটা ছোট্ট স্যুটকেস আর যতদূর সম্ভব হাল্কা বেডিং। রৌনাককে কৌটো শুদ্ধু রেখেছে জামার ঘড়ি-পকেটে পিনআপ করে। তার ওপর পরেছে সোয়েটার। অবশ্য সোয়েটারের ওপর গ্যাবার্ডিনের জার্কিন্সটা পরতে ভুল করেনি।

বাসব কুলির মাথায় স্যুটকেস আর বেডিং চাপিয়ে রিজার্ভেশান কাউণ্টারে এল। ফার্স্ট ক্লাসে বার্থ পাবে না, একরকম নিশ্চিত ছিল ও। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গাড়িতে ভিড় ছিল না সেদিন তেমন। ফোরবার্থ কম্পার্টমেণ্টে একটা লোয়ার বার্থ পাওয়া গেল।

বাসব নিজের কামরায় এসে বিছানাটা তাড়াতাড়ি পেতে ফেলল। আরেকজন সহযাত্রী রয়েছেন। তিনি বর্ধমানেই নেমে যাবেন বললেন।

ট্রেন ছেড়ে দিতেই বাসব গায়ে র‍্যাগটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা নেই। সে পাট চুকিয়েই এসেছে ও।

মাঝে মাঝে আর্তরব তুলে দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস। চিন্তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল বাসব। আজ সকালেও সে জানত না, তাকে এইভাবে পাড়ি দিতে হবে রাত্রের ট্রেনে। চিঠিটা পড়ে যত রহস্যজনক ব্যাপার সে অনুমান করেছিল, কার্যক্ষেত্রে তেমন কিছুই নয় দেখা গেল। কাজটা যেন নিতান্তই পাহারাদারের মত। যা হোক—

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে বাসবের। ও হাই তুলল। র‍্যাগটা টেনে নিল গায়ের ওপর আরো ভাল করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়ে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকাল বাসব, বারোটা একত্রিশ। গাড়ির গতি কমে আসছে। সামনেই কোন স্টেশন নিশ্চয়ই। গতি কমতে কমতে ট্রেনটা থেমে গেল। জানলার কাচের পাল্লাটা তুলে বাসব বাইরে মুখ বাড়াল—ঘুসকরা। প্রচণ্ড শীতে যেন ঝিমিয়ে রয়েছে স্টেশনটা।

বাসব জানলার পাল্লাটা নামিয়ে বাথরুমে গেল।

মুখে-চোখে জল দিয়ে, মুখখানা মুছল রুমাল দিয়ে। রৌনাকের কৌটোটা জামার পকেট থেকে বার করে আনল। ব্যস্ততার জন্যে ভাল করে হীরেটা দেখাই হয়নি তার। কৌটোর ঢাকনাটা খুলল বাসব। বাথরুমের উজ্জ্বল আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল রৌনাক। ছোলার মত সাইজ। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে রৌনাকের—শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হীরেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

এই সময়ে প্রবল ঝাঁকুনিতে বাক্স সমেত হীরেটা পড়ে গেল মেঝেতে। ট্রেন ছাড়ার ঝাঁকুনি। বাসব নিচু হয়ে বাক্সটা তুলে নিতে গেল।

ঠিক সেই সময়ে বাথরুমের দরজায় প্রবল করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। এক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল বাসব। শত্রুপক্ষের কেউ এল কি? যদি তাই হয়, তাহলে···বাসব দ্রুত চিন্তা করল। পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে হীরে সমেত বাক্সটা। ওরা নিশ্চয়ই স্যুটকেস, বেডিং এবং তার জামা-কাপড়ের মধ্যে সন্ধান করবে হীরেটা। তার চেয়ে—এখানেই থাক রৌনাক। বাথরুমের মধ্যে খোঁজ করবার সম্ভাবনা খুবই কম। কাজেই, ও রৌনাকের কৌটোটা এক কোণে সরিয়ে রেখে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

কামরায় নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। দুটি মূর্তি স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। সারা দেহ ওভারকোটে মোড়া, মাথায় বিচিত্র ধরনের টুপি। মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

বাসব বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন পরিস্কার ইংরাজিতে বলল, হীরেটা আমাদের দিন।

বাসব মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনারা কি বলছেন বুঝতে পারছি না। কোন্ হীরে?

—মিথ্যে অভিনয় করে লাভ নেই। আমরা জানি হীরেটা আপনার কাছেই আছে।

—আপনারা কি বলছেন বুঝতে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

—তাই নাকি! এবার বাধ্য হয়ে আমাদের আপনাকে কষ্ট দিয়ে বোঝাতে হবে, হীরেটার বিষয় আপনি কিছু জানেন কি না!

বাসব কয়েক পা পিছিয়ে এল। মাথার ওপরই চেন। ও ধীরে ধীরে হাতটা তুলল ওপরে—কিন্তু পরমুহূর্তে একটা প্রচণ্ড আঘাতে ঘুরে পড়ল বাসব। একঝাঁক অন্ধকার নেমে এল চোখের ওপর, জ্ঞান হারাল ও।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল বাসবের। ও উঠে বসল। মাথায় যেন হাজার মণের বোঝা চাপান। ব্যথায় টনটন করছে। রিস্টওয়াচের দিকে দৃষ্টি পড়ল, সাড়ে তিনটে। কামরার দিকে দৃষ্টি দিল, লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে সমস্ত কিছু।

চমকে উঠল বাসব। রৌনাকের কথা মনে পড়ল ওর। ও মাথার ব্যথা ভুলে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমে গেল। ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাল চারধার, কিন্তু কোথায় রৌনাক? চিহ্নমাত্র নেই হীরে শুদ্ধু কৌটোটার! তবে কি···? বাসব তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে বাথরুমের মেঝেটা পরীক্ষা করল।

পরিষ্কার তকতক করছে মেঝেটা। আগন্তুকদের কেউ এখানে আসেনি বলেই মনে হয়। কারণ, তারা এসেছিল কম্পার্টমেন্টের বাইরে থেকে। ঘুসকরা সাধারণ ছোট স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে সুরকি ঢালা বা ঘাস বিছানো থাকাই সম্ভব। এই শীতে হিম পড়ে চারধার ভিজে রয়েছে। আগন্তুকদের জুতোর তলায় কাদা লেগে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাথরুমের মেঝেয় কোথাও কাদার ছাপ নেই। বাসব কামরার মেঝের দিকে তাকাল। ওর অনুমান মিথ্যে নয়, কামরার মেঝেয় সর্বত্র শুকনো কাদা-পায়ের ছাপ। আগন্তুকরা তাহলে বাথরুমে কেউ আসেনি। তবে, তবে রৌনাক গেল কোথায়?···বিদ্যুৎ খেলে গেল বাসবের মনে। তবে কি ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হীরেটা কৌটো সমেত প্যানের মধ্যে দিয়ে গলে পড়ে গেছে নিচে?

বাসব ভাবতে থাকে, ওর মনে আছে বাথরুমে যাওয়ার সময়ে ঘড়ি দেখেছিল, বারোটা একত্রিশ। ঘুসকরায় ট্রেনটা থেমেছিল এই সময়ে। এখন সাড়ে তিনটে। তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আন্দাজ করা যায় ঘুসকরার কাছাকাছিই কোথাও পড়েছে হীরেটা।

ও তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তরগুলো গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত হল।

ট্রেন কয়েক মিনিট আগে কোন স্টেশনে এসে থেমেছিল। বাসব নেমে পড়ল। টিমটিম করে জ্বলছে কেরোসিনের ল্যাম্প।

প্ল্যাটফর্মে দু-একটা কুলি ছুটোছুটি করছে, কিন্তু কোন যাত্রীকেই নামতে দেখা গেল না। ও করগেট শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। স্টেশনের নাম লেখা বোর্ডটা চোখে পড়ল এবার—পাকুড়। বাসব সুটকেস থেকে টাইম টেবিল বার করল। লুপের ডাউন ট্রেনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল ও।

ডাউন আপার ইণ্ডিয়া পাকুড়ে আসছে চারটে তেইশে। ঘুসকরায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে সকাল সাতটা বিয়াল্লিশে। বাসব ঘড়ির দিকে তাকাল, পৌনে চারটে। আধঘণ্টার মধ্যেই ডাউন ট্রেনটা এসে পড়বে তাহলে।

রাইট টাইমেই ট্রেনটা ইন করল ঘুসকরায়। বাসব নেমে এল। মালপত্তরগুলো স্টেশনে জমা রেখে ও লাইন ধরে এগিয়ে চলল। কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না ধারে-কাছে।

শিশির-ভেজা শীতের সকাল।

তীক্ষ্ন চোখে দুটো লাইনের মধ্যেকার স্থান পর্যবেক্ষণ করতে করতে এগিয়ে

চলেছে বাসব। মাইল খানেক পার হয়ে এল ও। হঠাৎ রোদ্রের মোলায়েম আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, কয়েকটা পাথরের খাঁজে লাল ভেলভেটের ছোট্ট কৌটোটা কাৎ হয়ে আটকে রয়েছে।

বাসবের বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

ও ঝুঁকে কৌটোটা তুলে নিল। কৌটোর ডালাটা খুলল, ঝকঝকিয়ে উঠল রৌনাক।

জামালপুরে এসে নামল বাসব পরের দিন সকাল পোনে ন-টার সময়। ট্যাক্সিতে করে মুঙ্গেরে এল। ট্যাক্সি ড্রাইভারই ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল হোটেল ডি-লুক্সে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করবার পর ও হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। দেবীপ্রসাদের দেওয়া কাগজের নির্দেশ মত বাসব রিক্সায় চেপে গঙ্গার ঘাটে এল। বহু নৌকো ভিড় করে রয়েছে সেখানে।

গঙ্গার অংশ্য এখন তেমন ভয়াল রূপ নেই। দু-পাড়ে বালির চর পড়ায় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। শীতকালে এই রূপেই গঙ্গাকে দেখা যায় এখানে।

বাসব একটা ছোট নৌকো ভাড়া করে ফেলল তিন টাকা দিয়ে।

গঙ্গা পার হয়ে বালি আর কাঁকরময় পথের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল বাসব। ও ঘাটেই খোঁজ নিয়েছিল, জমিদার-বাড়ি ঘাট থেকে মিনিট আটেকের রাস্তা।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই বিরাট জমিদার-সৌধটি চোখে পড়ল ওর। হাল্কা লাল রঙয়ের ক্লকটাওয়ার সম্বলিত প্রাসাদখানা। একনজরেই বোঝা যায়, অর্থ আর আভিজাত্যের বৈভব এর প্রতিটি খাঁজে কি চমৎকারভাবে মিশে রয়েছে।

বাসব দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

বালির পথ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসফল্টের রাস্তা আরম্ভ হয়েছে এবার, আলতামাস গাছের সারি রাস্তার দু-পাশে।

ছায়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। হঠাৎ কে এই সময় তার কাঁধ স্পর্শ করল। বাসব মুখ ফেরাল। মুখটা সম্পূর্ণ আবৃত করা একটি লোক ততক্ষণে ওকে টেনে নিয়ে এসেছে আলতামাসের জঙ্গলের মধ্যে। বাসবের দেহে অবশ্য শক্তির অভাব নেই। ও এক ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। আবার রাস্তার দিকে চলে আসতে চাইল বাসব।

কিন্তু চলে আসা আর হল না। লোকটি রিভলবার বার করেছে। ছোট্ট কালো অস্ত্রটি নাড়তে নাড়তে লোকটি বলল, হীরের বাক্সটা পকেট থেকে বার করে আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলুন।

বিকৃত ফাটা কণ্ঠস্বর বক্তার।

—হেজিটেট করবার কিছু নেই। বার করে দিন বাক্সটা।

বাসব আর দ্বিরুক্তি না করে রৌনাকের ছোট্ট কৌটোটা পকেট থেকে বার করে ছুঁড়ে দিল আগন্তুকের দিকে। পরম আগ্রহ ভরে কৌটোটা বাঁ-হাত দিয়ে লুফে-

নিয়ে আদেশের সুরে আগন্তুক বলল, পেছন ফিরে দাঁড়ান।

বাসব নীরবে আদেশ পালন করল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর এক আঘাত এসে পড়ল তার। ক্ষণামাত্র চিৎকার করবার অবকাশ না পেয়ে ও জ্ঞান হারাল।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

জ্ঞান ফিরে এল বাসবের।

ও উঠে বসল। মাথার ওপর যেন হাজার মণের বোঝা কে চাপিয়ে দিয়েছে। বাসব কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল মাটির দিকে। কি একটা পড়ে রয়েছে না! কৌটা বলেই মনে হচ্ছে।

ও ঝুঁকে তুলে নিল সেটা। ইঞ্চি দুয়েক লম্বা প্লাস্টিকের একটা কৌটো। বাসব কৌটোর মাথাটা খুলে আঙুল চালিয়ে ভেতরটা দেখল। পরম নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠল ওর মুখে।

ও কৌটোটা পকেটে রেখে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

প্রাসাদে তখন দু-একটা করে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

বাসব জনৈক কর্মচারির হাত দিয়ে নিজের কার্ড কুমারবাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান এল ওর।

সেই কর্মচারিটির নির্দেশিত পথ ধরে বাসব একটি সুসজ্জিত কক্ষে এল। বিলাসবহুল আসবাবে সজ্জিত কক্ষটি গৃহস্বামীর সুরুচিরই পরিচয় দিচ্ছে।

একটা কোচে বসে রয়েছেন কুমারসাহেব। বয়স আঠাশ-উনত্রিশের মধ্যেই। গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ। সুন্দর মুখশ্রী। জরিপাড় ধুতি আর মলমলের পাঞ্জাবি তাঁর গায়ে।

দেওয়ান দেবীপ্রসাদও রয়েছেন একধারে দাঁড়িয়ে। প্রেমপ্রকাশ ও আরো কয়েক ব্যক্তি উদ্বিগ্ন মুখে কিসের প্রতীক্ষা করছেন।

বাসব ঘরে প্রবেশ করেই হাত তুলে নমস্কার জানাল সকলকে।

দেবীপ্রসাদ দ্রুত কণ্ঠে বললেন, আমরা অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনার এত দেরি হল?

—শেষ পর্যন্ত যে আসতে পেরেছি, এই যথেষ্ট!

কুমারসাহেব এবার বললেন, কেন? কোন বিপদ-টিপদ কি—

—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

—আমার রৌনাক? রৌনাকের কোন কিছু—

—হীরেখানা খোয়া গেছে কুমারসাহেব।

—খোয়া গেছে! ঘরের মধ্যে যেন বজ্রাঘাত হল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে বাসবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শেষে দেবীপ্রসাদের কণ্ঠ শোনা গেল, আপনি কি বলছেন মিস্টার ব্যানার্জী?

এত সাবধানতার পরও খোয়া গেল।

—আপনি উতলা হবেন না। মৃদু হাসল বাসব, খোয়া অবশ্য গেছে ঠিকই, তবে ওটা ফিরে পাওয়া যাবে বলেই আশা রাখি।

—ফিরে পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ। এবং অনুমান আমার ভুল না হলে উপস্থিত এই ঘরেই রয়েছে রৌনাক।

কুমারসাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এই ঘরে! কার কাছে? কি বলছেন আপনি?

দেবীপ্রসাদ কাঁপা গলায় বললেন, আপনি বলতে চান আমাদের মধ্যেই কারুর কাছে—

—হীরেটা আছে, দেওয়ানজী। দেবীপ্রসাদের কথাটা পূর্ণ করল বাসব। তারপর ও এগিয়ে গিয়ে থামল প্রেমপ্রকাশের সামনে। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, হীরেটা আমায় দিন মিস্টার প্রেম।

—হীরে? সারা মুখ কালো হয়ে উঠল প্রেমপ্রকাশের। কি বলছেন আপনি? আমি হীরেটা নিয়েছি?

—শুধু নেননি! উপস্থিত আপনার কাছেই রয়েছে হীরেটা।

কুমারসাহেবের দিকে ফিরে তীব্র প্রতিবাদের সুরে প্রেমপ্রকাশ বলল, আমার প্রতি অবিচার হচ্ছে। আমি হীরেটা নিতে যাব কেন? বেশ, আমার শরীর সার্চ করে দেখা হোক!

কুমারসাহেবের কিছু বলবার আগেই বাসব বলল, জামা-কাপড়ের মধ্যে যে নেই, তা আমিও জানি। আপনি হীরেটা লুকিয়ে রেখেছেন আপনার বাঁ-দিকের নকল চোখটার পেছনে।

মুখ ঝুলে পড়ল প্রেমপ্রকাশের। ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার চেষ্টা সফল হল না। বাসব লাফিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। একটু চেষ্টাতেই প্রেমপ্রকাশের নকল বাঁ-চোখের পেছন থেকে বেরিয়ে পড়ল রৌনাক।

কুমারসাহেব ছুটে গিয়ে সেখানা হাতে তুলে নিলেন। তাঁর সারা মুখে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে এল।

নৈশ আহারে বসেছেন কুমারসাহেব। বাসবকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিজের পাশে বসিয়েছেন। বিহারের বিশেষত্বমূলক প্রথম শ্রেণীর খাদ্যই পরিবেশিত হচ্ছে।

কুমারসাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝতে পারলেন কি করে যে, প্রেমপ্রকাশই হীরেটা নিয়েছে?

—আপনার বাড়ির কিছু আগে ছদ্মবেশে প্রেমপ্রকাশ রিভলবার দেখিয়ে

আমার কাছ থেকে হীরেটা নিয়ে পালাল। অবশ্য যাওয়ার আগে আমায় অজ্ঞান করে ফেলেছিল। কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম জানি না, জ্ঞান হতে চোখে পড়ল, আমার কাছেই একটা প্লাস্টিকের কৌটো পড়ে রয়েছে। আমি কৌটোটা পরীক্ষা করতে বুঝলাম এটা নস্যির কৌটো। আমার মনে পড়ে গেল, এই রকমই একটা কৌটো থেকে এভারেস্ট কাফেতে প্রেমপ্রকাশকে নস্যি নিতে দেখেছি। আমার আরো মনে পড়ল, তাঁর অদ্ভুত-দর্শন স্থির বাঁ-চোখটা। দুই আর দুয়ে চার। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বাঁ-চোখটা তার পাথরের, আর ওইখানেই হীরেটা লুকিয়ে রাখাই হবে সকলের চোখে ফাঁকি দেওয়ার সহজ পন্থা। তা-ও আমি স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে কর্মচারিটি আমায় আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে প্রশ্ন করেই জানতে পারলাম, প্রেমপ্রকাশের বাঁ-চোখটা পাথরের। তারপর কি হয়েছে তা তো আপনি জানেনই।

—বছর চারেক আগে এক দুর্ঘটনায় ওর চোখটা নষ্ট হয়। আমিই পাথরের চোখের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু নস্যির কৌটোটা ওখানে গেল কি করে?

—আমার কাছ থেকে হীরেটা নেবার সময় নিশ্চয়ই কোনরকমে পকেট থেকে কৌটোটা পড়ে গিয়েছিল।

কুমারসাহেব বললেন, আপনার প্রতিভার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। আজ যেভাবে রৌনাককে উদ্ধার করলেন, তা আপনার তীক্ষ্ম বুদ্ধিরই আরেকটি দৃষ্টান্ত। আপনাকে অভিনন্দন জানাবার ভাষা আমার নেই।

বাসব আর কিছু বলল না, নীরবে আহারে মন দিল।

তরল রূপো যেন আছড়ে পড়ছে থেকে থেকে।

গোপালনগরের সাগর-সৈকত। সমুদ্রের জলে চাঁদের আলো পড়ে অপরূপ মনে হচ্ছে চারধার। ভারতের এই শ্রেষ্ঠ 'সী বিচে' প্রতিবারের মত এবারও প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে।

বাসব সমুদ্রের ধারে বালির ওপর আড় হয়ে বসে একটা সিগারেট টানছিল। হাতে কোন কাজ ছিল না। কলকাতাও বড্ড একঘেয়ে লাগছিল, তাই শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ও চলে এসেছে এখানে।

সিগারেটে শেষবারের মত টান দিয়ে উঠে পড়ল বাসব। রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া ঘড়িটার দিকে তাকাল একবার। সাড়ে সাতটা।

কাছেই সী-ভিউ হোটেল।

ধীর পদক্ষেপে ও হোটেলে এসে প্রবেশ করল। লনে বেতের চেয়ার পেতে এখানে-ওখানে অনেকে বসে রয়েছেন। বাসব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শৈবালের পাশে গিয়ে বসল।

—তুমি যে সমুদ্রের ধারে আজ গেলেই না মোটে?

শৈবাল উত্তর দিল, আমি এ ধারের ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলাম। আমার বেশ সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

—হুঁ! এমন অদ্ভুত পরিবার আমি এর আগে দেখিনি।

বাসব ও শৈবাল দুজনেই সামনের দিকে তাকাল। একটা বেতের টেবিলকে কেন্দ্র করে বসে রয়েছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর দুই ছেলে, এক ভাগ্নে, পুত্রবধূ ও তাঁর ভাই। সকলেই নির্বাক। কাঠের পুতুলের মতন বসে আছেন যে-যাঁর চেয়ারে।

—আমার কি মনে হয় জান? বাসব বলে, যে কোন কারণেই হোক, ভদ্রলোককে পরিবারের অন্যান্য সকলে ভয় করে।

—শুনেছি, ভদ্রলোক নাকি বিরাট ধনী। অসুস্থতার জন্যে সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন এখানে।

বাসব কিছু বলার আগেই তাদের সামনে এসে বসলেন এক আধ-বয়সী ভদ্রলোক।

বাসব ও শৈবালের নব-পরিচিত ইনি। অমায়িক ভদ্রলোক। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি। আইন ও শিক্ষা-দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারি তিনি। বেড়াতে এসেছেন এখানে।

বাসব হেসে বলল, কতদূর গিয়েছিলেন মিস্টার বসাক?

সৌরেন্দ্র বসাক একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম মাইল দেড়েক—প্রায় নর্থে। তারপর আপনারা বেরোননি নাকি?

—আমি তো এই ফিরছি। তবে শৈবাল—

শৈবাল বলল, আচ্ছা মিস্টার বসাক, ওই ফ্যামিলিটি সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

মিঃ বসাক একবার চোখ তুলে দেখে নিলেন ও ধারটা। তারপর বললেন, আমিও এরকম পিকিউলিয়ার ব্যাপার এর আগে দেখিনি। ভদ্রলোকের নাম নাকি দীননাথ সান্যাল। তিনদিন হল এখানে এসেছেন। হোটেলে কারুর সঙ্গে কথা বলেননি, ওইরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকলকে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন।

—কোনরকম নার্ভের রোগে ভুগছেন বোধহয়?

বাসব উত্তর দিল, সকলে একই রকমের ইনসানিটিতে ভুগতে পারে না, শৈবাল। আমার মনে হয়, বুড়োর প্রচুর টাকা আছে, তাই কেউই তাকে চটাতে চায় না। ওইভাবে ঘিরে-ঘুরে বসে থাকে।

রাত প্রায় দশটা। মিনিট দশেক হল ডিনার সেরে এসেছে বাসব। শৈবাল এখনো ডাইনিং-হলে। দরজায় মৃদু করাঘাত হল।

—ইয়েস, কাম ইন—

দরজা ঠেলে একজন ঘরে প্রবেশ করল। তাকে দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না বাসবের।

আগন্তুক আর কেউ নন, দীননাথ সান্যাল স্বয়ং। তিনি যে উপযাচক হয়ে কারুর ঘরে আসতে পারেন, এ ধারণা তার ছিল না। বিশেষ করে তার মত অপরিচিতের ঘরে।

তিনি একটা কোচে বসে পড়ে বললেন, আমাকে দেখে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন?

—তা একটু হচ্ছি!

—হ্যাঁ, এখানে এসে অবধি আমি কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করিনি। আমার স্বভাবই ওইরকম। যাক সেকথা, আমি আপনার কাছে একটা প্রয়োজনে এসেছিলাম।

—বলুন?

—আমি নতুন একটা উইল করতে চাই। আপনাকে তার অন্যতম সাক্ষী হতে হবে, আর আপনিই তার খসড়া তৈরি করবেন।

আশ্চর্য হয়ে বাসব বলল, কিন্তু আমি তো উকিল নই, তাছাড়া—

—তা আমি জানি। আপনার পরিচয়ও আমার অজানা নয়। এ ব্যাপারটা কলকাতা অবধি পেণ্ডিং রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাই এখানেই করে ফেলতে চাই।

আশ্চর্য পাগল লোক তো! কথা বলার ধরণ দেখে অবাক না হয়ে পারে না বাসব।

—আপনি এখানেই বা উইল বদলাতে চাইছেন কেন?

—পরে হয়ত আর সময় পাব না।

—তার মানে? আপনি নিজের প্রাণের আশংকা করছেন?

হাসলেন দীননাথ সান্যাল। ধরুন তাই! যাক, আর দেরি করে লাভ নেই। আপনি চট করে এবার আপনার বন্ধুকে ডেকে আনুন। আমি ততক্ষণ আরেকবার মনস্থির করে ভেবে নিই।

অগত্যা বাসবকে ঘর থেকে বেরুতে হল। শৈবালকে তখন কিন্তু ডাইনিং-হলে পাওয়া গেল না। ও তখন দক্ষিণ দিকের বারান্দায় জনৈক কুলবান্ত সিংয়ের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। ওকে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে সমস্ত বলল বাসব। শৈবালও আশ্চর্য কম হল না।

ফেরার পথে বিলিয়ার্ডস্‌-রুমের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শৈবাল বলল, মিস্টার বসাককে ডেকে নিলে কেমন হয়? উনি পদস্থ সরকারি কর্মচারি। ওঁর উপস্থিতি আরো ভাল হবে।

বিলিয়ার্ডস্‌-রুমেই মিঃ বসাক ছিলেন। তাঁকে ডেকে নেওয়া হল। ওরা তিনজনে যখন ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ঘড়িতে দশটা দশ। দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। কিন্তু একি!···

কোচের হাতলের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে আছেন দীননাথ সান্যাল। আর একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে তাঁর ঘাড়ের একটু নিচে স্পাইনাল কর্ডের ওপর। শুধু ছোরার বাঁটখানা জেগে রয়েছে ওপরে।

গাঢ় লাল রক্ত তখনো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এক লহমার জন্যে তিনজনেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তে সম্বিত ফিরে এল সকলের।

বাসব ছুটে গিয়ে প্রথমেই নাড়ি পরীক্ষা করল। না, দেহে প্রাণ নেই। কয়েক মিনিট আগেই হয়ত মারা গেছেন তিনি। ও দূরে দাঁড়িয়ে বলল, মিস্টার বসাক, আপনি এখুনি ম্যানেজারকে গিয়ে বলুন পুলিশে ফোন করতে। শৈবাল তুমি দীননাথবাবুর সুইটে গিয়ে জানিয়ে এস এই দুঃসংবাদ।

মিঃ বসাক ও শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই বাসব চারধারে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারই ঘরে যে এতবড় একটা মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটতে পারে, একথা কোনদিন কল্পনাই করেনি সে।

হত্যাকারী অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের কাজ শেষ করেছে। কোথাও এতটুকু ধরা-ছোঁয়ার অবকাশ রাখেনি সে।

বাইরে দ্রুত পদশব্দ হচ্ছে, অনেকেই আসছেন এদিকে। বাসব দরজার দিকে এগিয়ে গেল—ওখানে কি একটা পড়ে রয়েছে না? হলদে মত পদার্থটা দরজার একপাশ থেকে তুলে নিল বাসব। এক টুকরো মোম—নিজের পকেটে রেখে

দিল ও।

এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। বেশ খানিকটা ঝড় বয়ে গেছে ঘরের মধ্য দিয়ে। পুলিশের পক্ষ থেকে দীননাথবাবুর ছেলে ও অন্যান্য আত্মীয়দের কিছু কিছু প্রশ্ন করে তাঁদের নিজের নিজের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকলে মুহ্যমান। সকলেই বেদনাহত।

পুলিশ ইন্সপেক্টার ধীরেন মোহান্তি বাসবের পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছেন। বেসরকারি ভাবে এই তদন্তের ভার বাসব গ্রহণ করলে, তিনি আনন্দিতই হবেন। মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্যে চালান দিয়ে লবিতে এসে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টার মোহান্তি। তারপর বাসবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি রকম বুঝছেন?

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাসব বলল, যদিও হত্যাকারী কোন সূত্র রেখে যায়নি, তবু দুটো জিনিস আমার চোখে পড়েছে। প্রথম—ঘাড়ে আঘাত করার চেয়ে বুকে আঘাত করাই সহজ। ঘাড়ে আঘাত করলে মৃত্যু নাও হতে পারে, কিন্তু বুকে আঘাত করলে মৃত্যু অনিবার্য, একথা জেনেও হত্যাকারী ঘাড়ে আঘাত করেছিল কেন? কারণ, সে জানত, ঘাড়ের একটু নিচে স্পাইনাল কর্ডের ওপর আঘাত করলেই মৃত্যু অবধারিত। কাজেই এতে প্রমাণ হচ্ছে, হত্যাকারীর ডাক্তারি শাস্ত্রের ওপর বেশ ভাল জ্ঞান আছে।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকালেন মোহান্তি।

দ্বিতীয়—ছোরাটা যেভাবে গেঁথে রয়েছে, তাতে বেশ বোঝা যায়, কোন বলশালী লোকের পক্ষেই এটা সম্ভব। আমার মনে হয়; হত্যাকারী দীননাথ সান্যালের অত্যন্ত পরিচিত ছিল। উনি দরজার দিকে পেছন করে বসে ছিলেন। হত্যাকারী ঘরে ঢুকলে, হয়ত মুখ ফিরিয়ে দেখেও নিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মনে কোন আশংকা জাগেনি। উনি মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় খুনী নিজের কার্য সমাধা করেছিল।

এইভাবে দু-চার কথার পর ইন্সপেক্টার মোহান্তি বিদায় নিলেন। রাত তখন দেড়টা।

রাত্রেই বাসবদের ঘর-বদল করতে হয়েছে। ওদের ঘর পুলিশ 'লকআপ' করে যাওয়ায় ম্যানেজার অন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বাসব ও শৈবালকে।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। কালকের ওই ঘটনার পর এখনো যেন এতবড় হোটেলটা নিঝুম, নিস্তব্ধ।

চা-পর্ব কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। শৈবাল মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। বাসব গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঠিক এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় এক যুবক। মুখভাব কিছুটা ক্লিষ্ট। কোনরকম ভূমিকা না করেই তিনি বললেন, আমার নাম রাজনাথ সান্যাল, আমি—

—আপনার পরিচয় আমার অজানা নয়। বসুন—বাসব বসতে ইঙ্গিত করল আগন্তুককে।

—আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?

—কাল আপনার ঘরেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। আমি আপনার সাহায্যে বাবার হত্যাকারীকে ধরতে চাই, মিস্টার ব্যানার্জী।

—বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি। তবে তদন্তের ব্যাপারে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

—নিশ্চয়ই! এখন আমায় কি করতে হবে, বলুন ?

—বিশেষ কিছুই নয়। আপনাকে আমি এখন গোটাকয়েক প্রশ্ন করব, তারপর আপনার ঘরের প্রত্যেককে।

—বলুন ?

বাসব একটু নড়েচড়ে বসে বলল, আপনারা সোজা কলকাতা থেকে আসছেন তো ?

—হ্যাঁ, কালই ফেরার কথা ছিল।

—সঙ্গে কে কে এসেছেন এখানে ?

—আমি ছাড়া, আমার স্ত্রী কল্পনা, আমার ছোটভাই দেবনাথ, কাকা উমানাথ সান্যাল ও আমাদের পিসতুতো ভাই সুকুমার।

—আমি লক্ষ্য করেছি, আপনারা সব সময়ে দীননাথবাবুকে ঘিরে বসে থাকতেন, এর কারণ কি ?

—আমরা বাইরের কারুর সঙ্গে মেলামেশা করি, বাবা তা চাইতেন না।

—আপনারা তো প্রত্যেকেই সাবালক—বয়স্ক। এ ধরনের কথা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলেন ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজনাথ সান্যাল বললেন, না মেনে উপায় ছিল না। বাবার ব্যক্তিত্বের সামনে আমরা কেউই মুখ খুলতে পারতাম না।

—আপনি কি করেন রাজনাথবাবু ?

—নিজেদের ব্যবসা দেখাশোনা করি। আমাদের হার্ডওয়ারের বিজনেস আছে।

—কিছু মনে করবেন না, কাল দীননাথবাবুর মৃত্যুতে মনে হল আপনারা কেউই তেমন শোকাহত হননি, যতটা হওয়া উচিত ছিল, তাই না ?

একটু ইতস্তত করলেন রাজনাথ সান্যাল, তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, বাবার মেজাজ অত্যন্ত তিরিক্ষি ছিল, আমাদের প্রতি ব্যবহারও তাঁর খুব খারাপ ছিল, এই কারণেই আমরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। তাই হয়ত—

—কাল হঠাৎ উইল পাল্টাবেন ঠিক করলেন কেন ?

—তাঁর খেয়াল। এর আগে চারবার উইল পাল্টান হয়ে গেছে।

—বর্তমান উইলে কি রকম কি আছে বলতে পারেন ?

—না। আমি কিছুই জানি না।

—খুন যখন হয়, অর্থাৎ পৌনে দশটা থেকে দশটা দশ অবধি আপনি কোথায় ছিলেন ?

—আমি বিলিয়ার্ডস্-রুমে ছিলাম।

—আপনি বিলিয়ার্ডস্ খেলতে পারেন ?

—না। খেলা দেখতে ভাল লাগে।

—ও! দীননাথবাবু মনে হল যেন প্রাণের আশংকা করছিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারলাম না। তবে আমি যত দূর জানি, তাঁর কোন শত্রু ছিল না।

—ধন্যবাদ রাজনাথবাবু। কিছুক্ষণ বিরক্ত করলাম, এবার আপনি যেতে পারেন। ভাল কথা, আজ সন্ধ্যার দিকে গিয়ে আর সকলের সঙ্গে কথা বলব। রেডি থাকতে বলবেন।

রাজনাথ কোচের কাঠের চওড়া হ্যাণ্ডেলটায় হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটার পর বাসব শৈবালকে নিয়ে দীননাথ সান্যালের সুইটে এল। ঘেরা বারান্দায় সোফাসেট দিয়ে বসবার ব্যবস্থা করা ছিল। সেখানেই বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরের এক ভদ্রলোক বিমর্ষভাবে বসেছিলেন। বাসবকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনিই বোধহয় দিবানাথবাবু ?

বাসবের প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন দিবানাথ সান্যাল।

—আমার এখানে আসবার কারণ নিশ্চয়ই আপনারা রাজনাথবাবুর কাছে শুনেছেন ? আমি প্রত্যেককে কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি এতে কোন আপত্তির কারণ হবে না ?

—নিশ্চয়ই না। বলুন ?

—আপনি দুর্ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন, দিবানাথবাবু ?

—এইখানেই। একটা বই পড়ছিলাম বসে বসে।

—দীননাথবাবুর ব্যবহার আপনার প্রতি কেমন ছিল ?

—দাদা আমাকে খুব ভালবাসতেন।

—তাঁর উইলের ব্যাপারে আপনি কতদূর কি জানেন ?

—দাদা বহুবারই উইল পাল্টেছেন। তবে যত দূর জানি, বর্তমান উইলে আমাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে!

—আপনি কি করেন মিস্টার সান্যাল ?

—আমি রেমণ্ড য়্যাণ্ড কিপসনের মেডিক্যাল অফিসার !

—আপনার বুড়ো আঙুলের তলাটা কাটল কি করে ?

দিবানাথ সান্যালকে একটু বিব্রত মনে হল। না, মানে···কাল পেন্সিল কাটতে গিয়ে ব্লেডে কেটে গেছে।

—ও ! আচ্ছা, আপনি এখন যান। কল্পনাদেবীকে পাঠিয়ে দেবেন একবার।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কল্পনাদেবী এলেন। সুন্দরী তিনি নন, তবে বেশ মিষ্টি মুখখানি তাঁর।

—বসুন মিসেস সান্যাল।

একটা কোচে বসে পড়ে উৎসুক নেত্রে বাসবের দিকে তাকালেন কল্পনাদেবী।

—আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। আচ্ছা, কাল রাত্রে দীননাথবাবু ঘর থেকে বেরুবার আগে আপনাকে কিছু বলেছিলেন ?

—না। উনি ঘর থেকে বড় একটা বেরুতেন না। কাল ওঁকে ঘর থেকে বেরুতে দেখে আমি বেশ আশ্চর্যই হয়েছিলাম।

—দীননাথবাবুর ব্যবহার আপনার প্রতি কেমন ছিল ?

—ভালই। তবে উনি গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না।

—দুর্ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন আপনি ?

—এখানেই বসে বসে উল বুনছিলাম।

—দিবানাথবাবুর আঙুলটা কাটল কি করে, বলতে পারেন ?

—শুনেছি ব্লেডে কেটে গেছে।

—আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। অনুগ্রহ করে দেবনাথবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন গিয়ে।

ধীর পদক্ষেপে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন কল্পনাদেবী। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন দেবনাথ সান্যাল। দীর্ঘকায় বিশাল চেহারা তাঁর। মুখে একটা উন্নাসিক ভাব।

একটা কোচে বসে পড়ে বললেন, আমায় ডেকেছেন ?

—হ্যাঁ। কিছু প্রশ্ন ছিল !

—বলুন ?

—কাল সাড়ে ন-টা থেকে দশটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন ?

—কার্ডস-রুমে।

—আপনারা তো সব সময়ে সকলেই দীননাথবাবুর কাছে কাছে থাকতেন, তবে হঠাৎ তাস খেলতে গিয়েছিলেন যে ?

—আমরা বাবার কাছে থাকতাম ঠিকই, তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়। উনি আমাদের বাধ্য করতেন। কাল আমি যখন কার্ডস-রুমে গিয়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল বাবা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—আপনি কোথায় কাজ করেন দেবনাথবাবু ?

—আমি পড়ি। ডাক্তারির ফাইনাল ইয়ার এটা আমার।

—দীননাথবাবুর উইল সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ?

—কিছুই না। সুকুমারদা, মানে আমাদের পিসতুতো ভাই এ সম্বন্ধে আপনাকে সমস্ত কিছু বলতে পারবে।

—কি রকম! তিনি কি—

—তিনিই বাবার সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন।

—ও! সুকুমারবাবুকে একবার ডেকে দেবেন কি ?

—তিনি উপস্থিত হোটেলে নেই। ফিরলেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

বাসব ও শৈবাল উঠে পড়ল। ফিরে এল নিজেদের ঘরে। মিঃ বসাক তখন অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্যে। বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আচ্ছা মিস্টার বসাক, আপনি দুর্ঘটনার সময় তো বিলিয়ার্ডস্-রুমেই ছিলেন। বলতে পারেন, রাজনাথবাবু সে সময়ে ছিলেন কিনা ?

—না, তবে তাঁর ভাই দেবনাথ সান্যাল সেখানে ছিলেন।

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করল বাসব। তারপর বলল, ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, খুন হওয়ার সময়ে খুনী ছাড়া ঘরে আরেকজন উপস্থিত ছিল।

—কি বলছ তুমি ? তা কি করে সম্ভব ? শৈবাল বলে উঠল।

—না। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হয়ত খুনের দু-এক মিনিট আগে-পরে হতে পারে।

মিঃ বসাক বললেন, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে বলে আপনার মনে হয় ?

—এখন সঠিক বলতে পারব না। তবে সে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

বাসব উঠে দাঁড়াল। মিস্টার বসাক, আপনি শৈবালের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করুন। আমি এখুনি আসছি। তারপর তিনজনে বেরুনো যাবে।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল বাসব ঘরে। শৈবাল ও মিঃ বসাকের সঙ্গে সুকুমারবাবুও অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে।

—আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, বাসববাবু ?

—হ্যাঁ। দু-একটা বিষয় জানবার ছিল। দীননাথবাবুর বর্তমান উইলটা কি রকম আছে বলুন তো ?

—আমাদের প্রত্যেককে উনি দু লক্ষ করে টাকা দিয়ে গেছেন। ব্যবসা যৌথ থাকবে। আর পাঁচ লক্ষ টাকা উনি দিয়েছেন তাঁর এক সিঙ্গাপুরবাসী বন্ধুকে।

—তাই নাকি! তাঁর নাম কি ?

—রত্নেশ্বর দত্ত।

—এত টাকা তাঁকে দেবার কি অর্থ বলুন তো?

—বোধহয় উনি ছোটবেলাকার ঋণ পরিশোধ করতে চেয়েছেন। মামা বাল্যকালে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। রত্নেশ্বর দত্তের বাবার সহায়তায় তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়।

—ওই রত্নেশ্বর দত্ত সিঙ্গাপুরে কি করেন?

—জানি না। তিনি বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ। ষোল-সতের বছরের মধ্যে একখানা চিঠিও আসতে দেখিনি।

—দীননাথবাবু তো কয়েকবারই উইল পাল্টেছেন। প্রতিবারই কি রত্নেশ্বর দত্তর নামে টাকা দেওয়া ছিল?

—না। প্রথমবার ছিল আর এই শেষের বারে আছে।

বাসব ভ্রূ কুঁচকে চিন্তায় ডুব দিল।

সুকুমার মল্লিক মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমায় আর কিছু প্রশ্ন করবেন কি?

—না। আপনি এখন যেতে পারেন সুকুমারবাবু। প্রয়োজন হলে আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।

সুকুমার মল্লিক ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাসব হাই তুলে উঠে দাঁড়াল।

—চলুন মিস্টার বসাক—শৈবাল চল, সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে আসি।

সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বাসব ও ধীরেন মোহান্তি বসে। টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট। আর সেই ছোরাখানা, যা দিয়ে খুন করা হয়েছে। সাত ইঞ্চি লম্বা, বেশ পুরু স্টীলের ছোরাটা।

ধীরেন মোহান্তি বললেন, ছোরাখানা বেশ অদ্ভুত-দর্শন না?

—হুঁ! সচরাচর এ ধরনের ছোরা দেখা যায় না।

—তারপর, আপনার কতদূর এগোল?

—প্রায় হেরাফেরি করে এনেছি। শুধু একটা বিষয় জানবার আছে। আমি আজই কলকাতায় একটা ট্রাঙ্ক-কল করতে চাই।

—বেশ তো, আমি এখুনি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কানেকশন পেয়ে যাবেন।

ধীরেন মোহান্তি উঠে গেলেন। একটা সিগারেট ধরাল বাসব।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সকাল থেকেই আজ আকাশ মেঘলা। তিনটে চেয়ারে অলসভাবে বসে রয়েছে বাসব, শৈবাল ও মিঃ বসাক।

বাসব বলছে, জীবনে আমি অনেক ক্রিমিনাল দেখেছি। কিন্তু খুনের মোটিভ প্রায় ক্ষেত্রে একই থাকে বলতে গেলে। এখানেও তাই হয়েছে—সেই

অর্থের লালসা।

শৈবাল বলল, তুমি তাহলে ধরতে পেরেছ, কে খুন করেছে?

—না। তবে খুনের সময় যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ঘরে গিয়ে পড়েছিল, তার নাম জানতে পেরেছি। সে খুনীকে দেখেছিল বোধহয়। এতদিন সে ভয়ে চুপ করে ছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত, কাল সকালে সে খুনীর নাম আমার কাছে প্রকাশ করে দেবে।

মিঃ বসাক বললেন, কে সে?

—চিন্তা করে দেখুন! আমি যদি বলি দীননাথবাবুর ভাই দিবানাথ সান্যাল?

শৈবাল বলল, কি বলছ তুমি?

—কেন, তাঁর বুড়ো আঙুলে কাটা দাগ দেখতে পাওনি?

শৈবাল ও মিঃ বসাক আশ্চর্য হয়ে বাসবের দিকে তাকালেন। বাসব আর কিছু না বলে মৃদু হাসল মাত্র।

রাত তখন সাড়ে এগারটা হবে। শৈবাল গভীর ঘুমে অচেতন। বাসব তাকে জোরে ধাক্কা দিল, এই শৈবাল—উঠে পড়—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শৈবাল, কি ব্যাপার?

—আমাদের এখুনি একবার বেরুতে হবে। মনে হচ্ছে, মহাপ্রভুকে হাতে-নাতে ধরতে পারব।

—বল কি!

—আর কোন কথা নয়, তুমি জামাটা পরে নাও!

বিরাট হোটেলটা নিঝুম রাতের মতই চুপচাপ। লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বাসব এগিয়ে চলেছে।

বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে থামল ওরা। শৈবাল চিনতে পারে, দীননাথ সান্যালের সুইট। দরজা ভেজানোই ছিল। ওরা দুজনে ভেতরে ঢুকল। প্রথম ঘর পার হয়ে ওরা দ্বিতীয় ঘরে এল। কে একজন খাটের ওপর শুয়ে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না।

বাসব ও শৈবাল একটা স্টীলের আলমারির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। টিক্ টিক্ করে রিস্টওয়াচের সঙ্গে পা ফেলে সময়ও এগিয়ে চলেছে।

গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে দুজনে। আর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে না। রেডিয়াম ডায়াল দেওয়া রিস্টওয়াচের দিকে তাকায় বাসব—পোনে দুটো।

খুট!…কোথায় একটা মৃদু শব্দ হল। সচেতন হয়ে উঠল ওরা দুজন। ঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। একটা দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি চৌকাঠ

পেরিয়ে ঘরের মধ্যে এল। সন্দিগ্ধভাবে একবার তাকাল এধার-ওধার। তারপর এগিয়ে গেল বিছানার দিকে।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। চুপচাপ কেটে গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর ট্রাউজারের পকেট থেকে টেনে বার করল একটা ছোরা। অন্ধকারেও যেন চক্‌চকিয়ে উঠল ছোরাখানা।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাসব। গম্ভীরকণ্ঠে বলল, রং অ্যাটেম্পট নিচ্ছেন রত্নেশ্বরবাবু! ওখানে চাদর ঢাকা পাশ-বালিশ ছাড়া আর কিছুই নেই।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক।

দপ্‌ করে সেই মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল ঘরের।

শৈবাল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিঃ বসাক। তাঁর হাতে চক্‌চকে একখানা বড় ছোরা।

মিঃ বসাকের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। তিনি এক পা এগিয়ে এলেন।

—না না, নড়বার চেষ্টা করবেন না মিস্টার বসাক। আমার হাতে রিভলবার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। শৈবাল, বাইরে বাগানে ইন্সপেক্টার অপেক্ষা করছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।

শৈবাল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

সকালের চায়ের আসরে সকলে একত্রিত হয়েছেন। রাজনাথ সান্যালের আমন্ত্রণে বাসব, শৈবাল ও ইন্সপেক্টার মোহান্তিও এসেছেন। চা-পর্ব শেষ করে সকলে উৎসুক নেত্রে বাসবের দিকে তাকাল।

দিবানাথবাবু বললেন, কি করে আপনি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করলেন, আমাদের বুঝিয়ে বলুন মিস্টার ব্যানার্জী।

বাসব সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। সকলেই উপস্থিত। রাজনাথ সান্যাল, কল্পনাদেবী, দেবনাথ সান্যাল, সুকুমারবাবু ও দিবানাথ সান্যাল।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বাসব আরম্ভ করল, যে কোন কারণেই হোক, দীননাথবাবু আমার কাছে উইল বদলাতে এলেন। সম্ভবত খুনী আগে থাকতেই তাঁর ওপর দৃষ্টি রেখেছিল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের কাজ শেষ করে। আমি ঘরে ফিরে এসে কোন সূত্রই খুঁজে পাইনি। শুধু পেলাম একটুকরো মোম। প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন করে দেখলাম, কারুরই অ্যালিবাই ঠিক নয়। রাজনাথবাবু বলছেন, বিলিয়ার্ডস-রুমে ছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। দেবনাথবাবু নাকি কার্ডস-রুমে ছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখা গেছে বিলিয়ার্ডস-রুমে। দিবানাথবাবু বললেন তিনি বারান্দায় বসে বই পড়ছিলেন, কিন্তু কল্পনাদেবীর কথায় জানা গেল বারান্দায় তিনি বসে বুনছিলেন, সে সময়ে আর কেউ সেখানে

ছিল না। সুতরাং দিবানাথবাবু মিথ্যা কথা বলেছেন। তাছাড়া তাঁর আঙুল কেটে যাওয়ার কৈফিয়তটাও জোরাল নয়। আমি ভাবতে লাগলাম। খুন করার পদ্ধতি দেখে বোঝা যায় খুনী একজন ডাক্তারি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। দিবানাথবাবু মেডিক্যাল অফিসার, আর দেবনাথবাবু মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। খুন হয়েছে দশটা বাজতে দশ মিনিট থেকে দশটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে। আমি প্রত্যেকে ওই সময়ে কোথায় ছিল খোঁজ নিতে আরম্ভ করলাম। রাজনাথবাবু কার্ডস-রুমে ফ্লাস খেলছিলেন। বাবাকে লুকিয়ে ফ্লাসের নেশা তিনি দীর্ঘদিন চালিয়ে আসছেন। দেবনাথবাবু দাদার ওই বদ অভ্যাস একেবারেই পছন্দ করতেন না। রাজনাথবাবু বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু কার্ডস-রুমে ঢোকেন না, তিনি বিলিয়ার্ডস্-রুম থেকেই দাদার ওপর চোখ রাখলেন, যাতে [illegible] না হয়ে যায়। তাই দেবনাথবাবুকে বিলিয়ার্ডস্-রুমে দেখা গিয়েছিল।

বাসব থামল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল, দিবানাথবাবু ওদিকে যাননি। ওঁরা তিনজনের কেউই বিলিয়ার্ডস্ খেলতে জানতেন না। আমি ভাবতে লাগলাম, ঘটনাস্থলে যে মোমের টুকরোটা পাওয়া গেছে, ওখানে ওটা এল কি করে! নিশ্চয়ই হত্যাকারীর পকেট থেকে পড়ে গেছে। মোম বহু কাজেই লাগে। কিন্তু এখানে বিলিয়ার্ডসের স্টিকের থালায় ঘসে নেওয়ার কাজে ব্যবহার হয় ধরে নেওয়াটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হবে না। কাজেই প্রমাণ হচ্ছে হত্যাকারী বিলিয়ার্ডস্ খেলতে পারত। আমি বিলিয়ার্ডস্-রুমের বেয়ারার কাছে জানতে পারলাম, মিস্টার বসাক দশটার কিছু পরে বিলিয়ার্ডস্-রুমে আসেন। আমার সন্দেহ ঘনীভূত হল। ঘরের দরজাটা আমি ভাল করে পরীক্ষা করেছিলাম। দরজার ভেতর দিকের পাল্লায় একটা হাতের ছাপ পেলাম। মনে হয়, কেউ দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে আমার বা শৈবালের ছাড়া আর কারুরই হাতের ছাপ পড়া সম্ভব নয়। কে এই তৃতীয় ব্যক্তি? মিস্টার বসাকের হাতের ছাপ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হল না। তিনি আমার ঘরে নানা জিনিসের ওপর হাত রেখেছিলেন, কিন্তু দরজার হাতের ছাপের সঙ্গে তাঁর হাতের ছাপ মিল হল না! তৃতীয় ব্যক্তিটি কে, সুকুমারবাবু, না দিবানাথবাবু? মনে পড়ে গেল দিবানাথবাবুর আঙুল কেটে যাওয়ার কথা। সঙ্গত কৈফিয়ত তিনি দিতে পারেননি। এমনও তো হতে পারে, দরজা চেপে বন্ধ করতে গিয়ে আঙুল চিমটে গেছে—তারই ক্ষত। পুরো ব্যাপারটা এবার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এল।

বাসব শেষবারের মত টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল। —কথাচ্ছলে আমি মিস্টার বসাককে বললাম, খুন হওয়ার আগে বা পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন ঘরে উপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির নাম জানার জন্যে মিস্টার বসাক আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি সেই সময়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মিস্টার বসাকের ঘরে

গেলাম। নকল চাবি দিয়ে তালা খুলতে হল। খোঁজাখুঁজি করে একটা পাশপোর্ট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। পাশপোর্টের ছবিটা অবশ্য মিস্টার বসাকেরই, তবে নাম লেখা রয়েছে রত্নেশ্বর দত্ত। সুকুমারবাবুর কাছে উইলের বৃত্তান্তটা জানবার পর, সমস্ত রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন বাকি রইল শুধু হত্যাকারীকে ধরা। আমি আড়ালে ডেকে দিবানাথ-বাবুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলাম। তিনি স্বীকার করলেন, এত রাত্রে দীননাথবাবুকে ঘরে দেখতে না পেয়ে, তিনি তাঁকে খুঁজতে বেরোন। আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে শৈবালকে ডাকতে যাই, তিনি সেই সময়ে বারান্দা পার হতে গিয়ে দীননাথবাবুকে আমার ঘরে দেখতে পান। আশ্চর্য হন তিনি। তারপর খানিক ইতস্তত করেই দরজা ঠেলে তিনি ঘরে ঢোকেন। ঢুকেই দীননাথ-বাবুকে মৃত দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়, একটা আতঙ্ক তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে সোজা নিজের ঘরে চলে আসেন।

বাসব থামল। সকলে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। —এদিকে আমি ট্রাঙ্ক-কলে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমার এক উচ্চপদস্থ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, আইন ও শিক্ষা দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি সৌরেন্দ্র বসাক ছুটি নিয়ে সিমলা গেছেন সপরিবারে। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে এখানকার মিস্টার বসাকের চেহারার মোটেই মিল হল না। আমি দিবানাথবাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে নিয়ে মিস্টার বসাকের মনে বদ্ধমূল ধারণা করিয়ে দিলাম, দিবানাথ সান্যাল খুনীকে দেখেছে এবং কাল আমার কাছে তার নাম প্রকাশ করে দেবে। মিস্টার বসাক—ওরফে রত্নেশ্বর দত্ত চিন্তায় পড়লেন। প্রকৃত ব্যাপার এইভাবে ঘটেছিল—দীননাথ সান্যাল কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রত্নেশ্বর দত্তকে নিজের উইলে পাঁচ লাখ টাকা দেন। রত্নেশ্বর দত্তের জীবনযাত্রা ভাল ছিল না। খরচের তোড়ে তিনি কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভরসা এখন দীননাথবাবুর উইলের টাকাটা। তিনি ভারতে এলেন। এসেই শুনলেন দীননাথবাবু সপরিবারে গোপালপুরে বেড়াতে গেছেন। রত্নেশ্বর দত্ত ছদ্মপরিচয়ে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘদিন দীননাথবাবু তাঁকে দেখেননি। কাজেই চোখাচোখি হলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম ছিল। এদিকে রত্নেশ্বরের কথা সাগর পেরিয়ে কিছু কিছু তাঁর কানে এসেছিল। তিনি উইল পাল্টাবার মনস্থ করলেন এবং ওই বিষয়ে সাহায্য নিতে আমার ঘরে এলেন। রত্নেশ্বর ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিলেন। তিনি বাগানের দিকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত শুনলেন। সম্ভবত তিনি তৈরি হয়েই এসেছিলেন। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানলা টপকে ঘরে ঢুকে প্রথমেই ছোরার বাঁট দিয়ে দীননাথবাবুর মাথায় আঘাত করেন। তারপর অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যে বুকে না মেরে স্পাইনাল কর্ডের ওপর আঘাত করেন এবং আবার জানলা টপকে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সেই সময় বোধহয় তাঁর পকেট থেকে মোমের টুকরোটা

পড়ে যায়। ঠিক এর পরই দিবানাথবাবু ঘরে আসেন।

বাসব আবার একটা সিগারেট ধরাল। মৃদু টান দিয়ে আরম্ভ করল, আমার কথা শুনে রত্নেশ্বর দত্ত চিন্তিত হলেন। সত্যিই যদি তাঁকে দিবানাথবাবু দেখে ফেলে থাকেন, তবে পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। পাঁচ লাখ টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে তাঁর। তিনি মনস্থির করে ফেললেন। না—দিবানাথ সান্যালকে বাঁচতে দেওয়া হবে না। তারপর যা ঘটেছে, তা আপনারা জানেন। অত্যধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আমার ফাঁদে ধরা দিলেন।

মৃদু হেসে বাসব নিজের বক্তব্য শেষ করল।

সকলেই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কি অদ্ভুত মেধা, কত তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ!

বাসব ও শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

—একি, উঠছেন যে! আপনার সঙ্গে আমার এখনো কিছু কথা বাকি আছে!

—বেশ তো! যে কোন সময়ে আমার ঘরে আসবেন।

হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে রাজনাথ বললেন, সেই ভাল। লেন-দেনের কারবার সঙ্গোপনে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মৃদু হাসল বাসব। তারপর সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

অনুবর্তন

ঘুরে দাঁড়াল সুলগ্না। হাসল একটু।

—হাসলে যে? প্রণয় প্রশ্ন করল।

—হাসলাম তোমার অবস্থা দেখে। তুমি ভয় পেয়ে গেছ। হয়ত পিছিয়েও যাবে।

—ভয় আমি পেয়ে গেছি ঠিকই, তবে পিছিয়ে যাব না। বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত মত আদায় করতে পারব বলেই মনে হয়।

—আর যদি মত না পাওয়া যায়?

—তবে…

অনুনয়ে ভেঙে পড়ল সুলগ্না। কোন তবে নয়। একটু শক্ত হও প্রণয়। আপ্রাণভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। নইলে আমি কোথায় ভেসে যাব একবার ভেবে দেখ!

প্রণয় দুবার কেশে নিয়ে বলল, এখন থেকে কেন তুমি এত উতলা হয়ে পড়ছ লগ্না। হয়ত অশুভ কোন কিছু ঘটবে না। হয়ত…

—ওই 'হয়ত' কথাটাতেই আমার আপত্তি। সমাধান তো তোমার হাতেই রয়েছে। তুমি ভাল চাকরি করছ, তুমি স্বাবলম্বি, কেন পরের কথার ওপর নির্ভর করে থাকবে?

প্রণয় সুলগ্নার কাঁধে হাত রেখে বলল, কেন তুমি মিথ্যে চিন্তা করছ? বলছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে। সন্ধ্যা হয়ে এল। চল, এখন ফিরি।

বার্চ স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে সুলগ্না থাকে। ওকে সেখানে পেঁছে দিয়ে সেদিনকার মত বিদায় নিল প্রণয়। বিমর্ষভাবে করিডর অতিক্রম করল সুলগ্না। ওধারের বারান্দায় পা দিতেই আনন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সুলগ্নার নেক্সট ডোর নেবার। তিনি ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছিলেন। ওকে দেখে বললেন, তোমার বাবা অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সুলগ্না দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে এল। উমানাথ ডেকচেয়ারে বসে পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। বিজয় দাঁড়িয়েছিল জানলার একপাশে। মেয়েকে দেখে উমানাথ বললেন, ঘণ্টাখানেক হল আমি এসেছি।

—অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল বাবা। সুলগ্না বলল, চা খাবে তো?

—না। ভেবেছিলাম শনিবার দিন তুমি বাড়ি যাবে। গেলে না যখন, অগত্যা আমাকেই আসতে হল। তোমার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে ছিল, তাই—নইলে ঘণ্টাখানেক বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হত। যাক, যা

বলতে আসা তাই এখন আরম্ভ করা যাক। আটটা সাতাশের ট্রেনে আবার আমায়·ফিরে যেতে হবে। বিজয়—

ভাইপোর দিকে তাকালেন উমানাথ।

বিজয় বলল, দত্তরা আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। সামনের ফাল্গুনেই শুভকাজটা শেষ করে ফেলতে চায়।

—আর, উমানাথ বললেন, তুমি এই সপ্তাহের মধ্যে চাকরিতে ইস্তফা দেবে।

—কিন্তু ··

—যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে স্ত্রী-স্বাধীনতাকে সমর্থন করতেই হবে। আমি তাই করেছি। তোমাকে চাকরি করবার স্বাধীনতা আমি দিয়েছি। এবার বিয়ে-থা করে সংসারি হও—এই আমার ইচ্ছে। অমিয় ছেলেটি ভাল, তাকে তুমি দেখেছ। তার ইচ্ছে নয়, বিয়ের পর তুমি চাকরি কর। ইস্তফার কথা তাই বললাম।

সুলগ্নার মনের মধ্যেটা গুলিয়ে উঠল। অসংখ্য কথা ভিড় করে এল ঠোঁটের আগায়। কিন্তু রাশভারি উমানাথের মুখের ওপর একটা কথাও বলতে পারল না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

আরো দু-চার কথা বলবার পর খুড়ো-ভাইপো বিদায় নিলেন।

দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় সুলগ্নার মন আগে থেকেই ভারাক্রান্ত ছিল। এখন যেন একেবারে নুয়ে পড়তে চাইছে। ওর প্রতি একি অবিচার! এখন সমস্ত কিছু নির্ভর করছে প্রণয়ের ওপর। সে-ই একমাত্র পারে এই জটিল পরিস্থিতির ওপর সুন্দরভাবে যবনিকা টেনে দিতে।

—ভেতরে আসতে পারি?

উমানাথ চলে যাবার পর তাঁরই পরিত্যক্ত ডেকচেয়ারে বসে চিন্তার অতলান্ত সমুদ্রে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল সুলগ্না। চমকে মুখ তুলল সে। অমিয় দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। অমিয় দত্ত, সুলগ্নাদের সোনারপুরের প্রতিবেশি। ন্যাশনাল রেফ্রিজেটার কম্পানিতে ভাল কাজ করে। সে-ই সুলগ্নাকে ওখানে কাজ সংগ্রহ করে দিয়েছে। অবশ্য সুলগ্না তাকে কোনদিনই আমল দেয়নি। অফিসে যোগ দেবার পরই প্রণয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। এবং সেই পরিচয় ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে। একথা যে অমিয়র অজানা, তা নয়। তবু সুলগ্নাকে সে বিয়ে করতে চায়। উমানাথ প্রণয়ের সম্পর্কে কিছু জানেন না। অমিয়কে তাঁর পছন্দ। তার কৈশোর থেকেই তাকে তিনি দেখছেন। বেশ ছেলে। খাসা জামাই হবে।

অমিয়কে দেখেই সুলগ্না জ্বলে উঠল। ওকে পরিষ্কারভাবে নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে দেবে এখুনি।

—কি চান?

—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—বাজে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। বাবা এসেছিলেন একটু আগে। তাঁর মুখের ওপর যে কথাটা বলতে পারিনি, আপনি যখন এসে পড়েছেন, তখন শুনে যান—আপনার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক গড়ে তোলা আমার সম্ভব হবে না।

অমিয়র চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, ভুলে যেও না, তোমার আজকের স্বচ্ছলতার জন্যে দায়ী বোধহয় আমিই। আমি চাকরির ব্যবস্থা করে না দিলে…

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুলগ্না বলল, আপনি আমার উপকার করেছিলেন, সেকথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে বিয়ে করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই নেই।

কথাটা শেষ করেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। আবার এসে বসল ডেকচেয়ারে। ভালই হল, অমিয়কে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া গেছে। এখন মাকে জানাবে নিজের অবস্থার কথা। লজ্জার মাথা খেয়েই জানাবে। ডেকচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরখানা ওর মাঝারি সাইজের। আসবাবপত্তর যে খুব বেশি আছে তা নয়। একুনে স্প্রিং দেওয়া লোহার খাট, ছোট একটা ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, টেবিল-চেয়ার, ডেকচেয়ারখানা ও রেফ্রিজেটার। দামী রেফ্রিজেটারটা ও কম্পানি থেকেই সংগ্রহ করেছে। সুলগ্না টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। প্যাড টেনে নিয়ে মাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে উমানাথ জন্মেছিলেন উত্তর কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কিন্তু সেই সোনার চামচ জার্মান সিলভারে রূপ নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। কিছু বয়স বাড়ার পরই উমানাথ দেখলেন তাঁদের বিরাট বাড়ির খিলানে খিলানে ফাটল ধরেছে। সব ঘরের ঝাড়-লণ্ঠনগুলো আর জ্বলে না। ঘরে-ঘরে পাতা দামী জাজিমের ছোট ছোট খোঁচ বিরাট বিরাট হাঁ-এর আকার নিয়েছে।

এই সমস্ত ব্যাতিক্রম কেন?

কেনর উত্তর যে উমানাথের অজানা, তা নয়। প্রথম যেদিন তিনি তাঁর বাবা দিবানাথকে অনেক রাত্রে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতে দেখেন, সেই দিন থেকেই তিনি জানেন তাঁদের সমস্ত ঐশ্বর্য মদের স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে। বাড়ির শেষ ইঁটটিও বোধহয় বিক্রি হয়ে যেত, যদি না দিবানাথ মারা যেতেন। মারা যাবার সময় তিনি ছেলের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন শুধু বিরাট আধভাঙ্গা বাড়িখানা—আর কিছু নয়।

এর পর উমানাথের জীবন-সংগ্রামের পালা।

বহু বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে—কঠিন পরিশ্রমে নিজেকে বিলিয়ে অবশেষে জয়লাভ করেছেন তিনি। প্রচণ্ড বড়লোক অবশ্য হতে পারেননি, তবে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে ডুবে না গিয়ে কুটো অবলম্বন করে ভাসতে পেরেছেন। তাঁর চাকরি-জীবন আরম্ভ হয়েছিল এ. এস. এম-র পদে নিয়োগ

পেয়ে। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে উঠে এসেছিলেন সোনারপুরের নিরালা আওতায়।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। অশোক ও সুলগ্না বড় হয়েছে। মাতৃ-পিতৃহীন বিজয়—সে অশোকের বয়সী। সে-ও আছে সংসারে। খরচ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অথচ সেই অনুপাতে আয় বাড়েনি। রেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন-মাস্টারের কতই বা মাইনে! কিছু উপরি আছে, এই যা রক্ষে। বাড়িতে সমর্থ দুটো ছেলে—চাকরির জন্যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তারা! কিন্তু কোথায় চাকরি?

উমানাথের পাশের বাড়িতেই থাকেন দত্তরা। দত্তদের বড়ছেলে অমিয় কলকাতার এক বিখ্যাত রেফ্রিজেটার কম্পানিতে কাজ করে। সে সংবাদ দিল একদিন, তাদের অফিসে সুলগ্নার চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। রিসেপশান কাউন্টারে একজন মহিলার প্রয়োজন। ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের সঙ্গে খাতির আছে অমিয়র। অনুরোধ করলে সুলগ্নাকে ওই পদে তিনি মনোনিত করতে পারেন। সুলগ্না ইন্টার-মিডিয়েট পাস করে বসে ছিল। এই প্রস্তাবে উমানাথ রাজি হতে পারলেন না। তিনি প্রাচীন-পন্থী। স্ত্রী-স্বাধীনতাকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। বাড়ির লোকেদের চাপে পড়ে মেয়েকে পড়িয়েছেন,—আবার চাকরি!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মত দিতে হল!

অশোক ও বিজয় অনেক বোঝাল। সংসারের অবস্থা কতটা স্বচ্ছল হয়ে উঠবে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিল। সবশেষে জানাল, ওদের দুজনের মধ্যে একজনের চাকরি হয়ে গেলেই সুলগ্নাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনা হবে। কাজে যোগ দিল সুলগ্না। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে ওকে বাড়ি ছাড়তে হল, অর্থাৎ, কাজে যোগ দেবার সময় এমনভাবে নির্দিষ্ট হল, যাতে নিয়মিত সোনারপুর থেকে গিয়ে অফিস করা যায় না। অগত্যা—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের কলকাতায় বাসা ঠিক করে দিলেন উমানাথ। তাঁর বন্ধু আনন্দ, বার্চ স্ট্রীটের এক বিরাট বাড়িতে তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। তিনখানা ঘর তাঁর প্রয়োজন হত না। একখানা সাবলেট করবেন ঠিক করেছিলেন।

কথায় কথায় উমানাথকে একদিন বলেছিলেন, একজন ভদ্রলোক পেলে ঘরটা তাঁকে দিই।

মৃদু হেসে উমানাথ বলেছিলেন, আজকাল ভদ্রলোক আর পাচ্ছ কোথায়?

শেষ পর্যন্ত ওই ঘরখানাই সুলগ্নার কাজে লেগে গেল। খাওয়া-দাওয়া অবশ্য আনন্দবাবুর ওখানেই সারে পেয়িং-গেস্ট হিসেবে। ইতিমধ্যে অবশ্য অশোক আর বিজয়ের চাকরি হয়েছিল।

অমিয়কে সরাসরি প্রত্যাখান করার পর দিন সাতেক কেটে গেছে। গোধূলি লগ্ন

তখন। আনন্দবাবু অফিস থেকে ফিরে এলেন। করিডর অতিক্রম করে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে যাবেন, দেখলেন, একজন অপরিচিত লোক সুলগ্নার দরজা ঠেলাঠেলি করছে। সুলগ্না ফিরে এসেছে নাকি? তাঁদের না বলে-কয়েই কোথায় ডুব মেরেছিল ও কাল থেকে।

দরজার কাছে গিয়ে আনন্দবাবু দেখলেন, কড়ায় তালা লাগান নেই। হঠাৎ তাঁর মনে হল অফিসে যাবার সময়ও যেন দরজার কড়ায় তালা দেখেন নি। সকালেই সুলগ্না নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি কেন?

লোকটার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কাকে চাই?

—সুলগ্নাদেবীর সঙ্গে দেখা করব। তাঁর নামে চিঠি আছে।

—ও! সাড়া দিয়েছেন?

—কই, না! প্রায় দশ মিনিট ধরে দরজা ধাক্কাধাক্কি করছি।

বিস্মিত হয়ে ভ্রূ কুঁচকোলেন আনন্দবাবু। দশ মিনিট ধরে দরজা ধাক্কা দেবার পরও সুলগ্না দরজা খুলল না, এরকম তো হবার নয়? ওর শরীর খারাপ হল নাকি? তিনি বারকয়েক ধাক্কা দিলেন। নাম ধরে ডাকলেন। কোন সাড়া নেই। এই সময় পাশের ফ্ল্যাটের শৈলেনবাবু এলেন ঘটনাস্থলে। তিনি সমস্ত শুনে যা বললেন তা আরো চিন্তার কথা। গত সন্ধ্যা থেকেই তিনি দরজার কড়ায় তালা দেখছেন না। আনন্দবাবুর বিস্ময় আরো বর্ধিত হল। কারণ সুলগ্না তাঁর ওখানেই-খাওয়া-দাওয়া করে—কাল থেকে আজ অবধি তাঁদের কাছে যায়নি। দরজা বন্ধ করেই বা এতক্ষণ করছে কি? সন্দেহের আর অবকাশ নেই, নিশ্চয়ই মারাত্মক রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েছে সুলগ্ন

অন্যান্য ফ্ল্যাটেরও কয়েকজন উপস্থিত হলেন। পরিস্থিতি নিয়ে বাক্য-বিনিময় হল। দরজা ভেঙে ফেলা হবে কিনা এই প্রশ্নে, দরজা ভেঙে ফেলার পক্ষেই সকলে রায় দিলেন। কিন্তু তবু দরজা ভাঙা হল না। সকলে ইতি-উতি করতে লাগলেন। চাপা গুঞ্জনে জল্পনার জাল বোনা আরম্ভ হল।

অশোক ও বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে উমানাথ উপস্থিত হলেন ঘটনাস্থলে। সুলগ্নার ঘরের সামনে এত লোকজন দেখে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, কি হয়েছে আনন্দ?

—কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। কাল থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে রয়েছে সুলগ্না।

—সে কি! কাল তো সোনারপুর যাবে বলে চিঠি দিয়েছি! তাকে আজকেও ওখানে যেতে না দেখে আমরাই চলে এলাম ব্যাপার কি জানতে।

সকলের মুখ থেকে বৃত্তান্ত শোনার পর অশোক বলল, আর আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়। দরজাটা এবার ভেঙে ফেলাই ভাল।

একটা শাবল সংগ্রহ করা হল তখুনি। শাবলের চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলা হল দরজা। ফাঁকা ঘর। সুলগ্নার সন্ধান পাওয়া গেল না ঘরের মধ্যে। অথচ দরজা ভেতর থেকেই খিল তুলে বন্ধ করা ছিল। একি রহস্য! সকলে মুখ

চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

আনন্দবাবুই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করলেন, ব্যাপার ভাল ঠেকছে না। আমার মতে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।

—পুলিশ! সমবেত কণ্ঠে কথাটা ধ্বনিত হল।

আনন্দবাবু দক্ষিণ দিকের খোলা জানলাটা দেখিয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে ওই জানলা দিয়েই সুলগ্নাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।

—কিডন্যাপ! বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন উমানাথ।

পুলিশে খবর দেওয়া হল।

যে লোকটি চিঠি নিয়ে সুলগ্নাকে ডাকাডাকি করছিল, তার দিকে তাকিয়ে বিজয় বলল, কি চিঠি এনেছিলেন দেখি? মধ্যবয়স্ক চাকর শ্রেণীর লোকটি পকেট থেকে চিঠি বার করে দিল। বিজয় চিঠিখানার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

লগ্না,

চতুর্দিকের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার পক্ষে রাজি হওয়া সম্ভব নয়। তুমি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছ, নিশ্চিতভাবে আমি সে সম্পর্কে একা দায়ী নই। আশা আছে, এর পর তোমার আর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।

—প্রণয়

বিজয় উমানাথের দিকে চিঠিখানা এগিয়ে ধরল। বিপর্যস্ত মন নিয়ে উমানাথ পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। চিঠিখানা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। সুলগ্নার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটা তাঁর হয়ত জানা ছিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে সদলবলে ইন্সপেক্টার বলাই সামন্ত এলেন। প্রবীণ এই পুলিশ কর্মচারির দক্ষতা সর্বজনবিদিত। তিনি খুঁটিয়ে শুনলেন সমস্ত কথা। উমানাথ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

তিনি ঘরখানা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। খাট, রেফ্রিজেটার, ট্রাঙ্ক ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি টেবিলের দিকে তাকালেন। টেবিলের ওপর প্যাড ইত্যাদি ছাড়াও, গোটা কয়েক ওষুধের শিশি রয়েছে। ভ্যানিটি ব্যাগটাও রয়েছে। টেবিলের বেশ কিছু ওপরে দেওয়ালের সঙ্গে কাঠের র‍্যাক আটকান। র‍্যাকের ওপর খবরের কাগজের গোছা ও টিন বা ওই জাতীয় কিছুর জাফরিকাটা কয়েকটা ট্রে রয়েছে।

ইন্সপেক্টার সামন্ত খুঁটিয়ে জেনে নিলেন উমানাথের কাছ থেকে তাঁর পারিবারিক কথা এবং সুলগ্না সম্পর্কে মোটামুটি। প্রশ্ন করলেন, আপনি তো প্রাচীনপন্থী, মেয়ের চাকরি করাটা পছন্দ করতেন?

—অনন্যোপায় হয়ে ওকে চাকরি করতে অনুমতি দিয়েছিলাম। অবশ্য এখন

আর সাংসারিক প্রয়োজনে ওর চাকরি করবার কোন দরকার পড়ে না। আমার ছেলে ও ভাইপোর চাকরি হয়েছে। তাছাড়া আমি ওর বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছি। কিন্তু কোথায় গেল মেয়েটা বলুন তো ?

—পায়ে হেঁটে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি যে কোথাও যাননি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজা দিয়ে না গিয়ে তিনি জানলা টপকে যাবেন কোথাও, বিশেষ করে মেয়েমানুষ হয়ে, এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। শুনুন উমানাথবাবু, আমার সমস্ত দেখে-শুনে দৃঢ় ধারণা হচ্ছে সুলগ্নাদেবীকে কেউ জোর করে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, তাঁর কি কোন পুরুষ-বন্ধু ছিল ?

—বন্ধু…

—আপনি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে চেনেন ?

—না। তবে এই চিঠিখানা দেখে মনে হয় তার একজন পুরুষ বন্ধু ছিল।

উমানাথবাবু প্রণয়ের লেখা চিঠিখানা অশোকের হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে ধরলেন। গম্ভীর মুখে ইন্সপেক্টার চিঠিখানা পড়লেন। পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আপনার নামই তো আনন্দবাবু ? উমানাথবাবুর বন্ধু তো আপনি ?

আনন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ।

—একই ফ্ল্যাটে তো আপনারা থাকেন। বলতে পারেন, প্রণয় নামে কোন ছেলে সুলগ্নাদেবীর কাছে যাওয়া-আসা করত কিনা ?

—ইদানিং একজনকে ওর কাছে যাওয়া-আসা করতে দেখেছি। একদিন প্রশ্ন করায় লগ্না বলেছিল, অফিসের পরিচিত। নাম জানায়নি।

অশোক ও বিজয়কেও প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টার। উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলেন না। শুধু জানা গেল সুলগ্নার সঙ্গে কার বিয়ের কথা হয়েছিল এবং অমিয়র ঠিকানা।

সকলকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ইন্সপেক্টার। দরজা বন্ধ করে, সেখানে একজন কনস্টেবল মোতায়েন করে তিনি বাগানে এলেন। সুলগ্নার ঘরের খোলা জানলাটার ওপাশ পরীক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। বাগানের এই অংশে রজনীগন্ধার সমারোহ। ইন্সপেক্টার সামন্ত চোখ বুলিয়ে গেলেন চারধারে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

ফিরে আসবার মুখে চকচকে কি একটা পড়ে থাকতে দেখলেন। ঝুঁকে তুলে নিলেন সেটা। বোতাম—নিকেলের বোতাম একটা। বোতামটা পকেটস্থ করে সামন্ত বাইরে অপেক্ষমান জিপে গিয়ে বসলেন। জিপ এগিয়ে চলল। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন তিনি। কেসটাকে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছেন না। মেয়েটাকে কেউ সত্যিই জোর করে নিয়ে গেল, না, সমস্তটাই গটআপ ? সে কারুর সঙ্গে পালিয়ে গেছে, এইভাবে সকলকে বোকা বানিয়ে বা বিপথগামী করে ?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সোজা হয়ে বসলেন সামন্ত। এ সম্পর্কে

বাসবের সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়? বহু রহস্যের নির্ভুল দিক-নির্দেশক বাসব। কয়েকটি তদন্তে একই সঙ্গে কাজ করেছে দুজনে। ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ওপর প্রগাঢ় আস্থা আছে সামন্তর। তিনি জিপের মুখ ঘোরালেন।

দুশো একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির বাইরের ঘরে তখন তর্কের তুফান চলেছে। চীন আবার ভারত আক্রমণ করবে কিনা, সাবজেক্ট এই। ঘরে অবশ্য অনেক লোক নেই। তর্ক চলেছে বাসব ও শৈবালের মধ্যে।

ইন্সপেক্টার সামন্ত ঘরে প্রবেশ করলেন।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি সৌভাগ্য! কোতোয়াল সাহেব যে!

বসতে বসতে তিনি বললেন, বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এলাম।

—বলাই বাহুল্য! প্রয়োজন না থাকলে এপথ মাড়াবার পাত্র আপনারা নন।

ঘর ফাটিয়ে হাসলেন ইন্সপেক্টার।

—যাক, এসে যখন পড়েছেন তখন—, বাসব বলল, বাহাদুরকে অতিথি সৎকারের সুযোগ না দিলে চলবে না। ডাক্তার, বাহাদুরকে গিয়ে একটু সচেতন করে এস।

শৈবাল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

—বসুন এবার, ব্যাপারটা কি?

সামন্ত সমস্ত ঘটনাটা বললেন। কোন কিছু বাদ দিলেন না। প্রণয়ের লেখা চিঠিখানা ও বোতামটা দেখালেন। গভীর মনঃসংযোগে চিঠিখানা পড়ল বাসব। বোতামটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল।

—ঘটনাটা শুনে কিরকম বুঝলেন মিস্টার ব্যানার্জী?

—ঘটনাস্থলে না গিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। আপনি ঠিকানা রেখে যান। কাল বিকেলে আমি আর ডাক্তার যাব সুলগ্নাদেবীর ঘরে। আপনি সকলকে উপস্থিত থাকতে বলবেন। প্রণয় ও অমিয় যেন বাদ না পড়ে।

শৈবাল আগেই ফিরে এসেছিল। এখন ট্রে হাতে বাহাদুরকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। ধূমায়িত কফি এবং আরো কি সমস্ত ছিল যেন ট্রেতে।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বাসব ও শৈবাল গিয়ে উপস্থিত হল সুলগ্নার আস্তানায়। সামন্ত তখন অন্যান্য সকলকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাসবের সঙ্গে তিনি সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অবশ্য পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে রেখেছিলেন এই তদন্তের সূত্রেই ওর এখানে আগমন হবে।

এদিকে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থানে সুলগ্নার অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বারান্দাতেই সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইন্সপেক্টার। বাসব বলল, আগে এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিই,

তারপর ঘরটা দেখা যাবে, কি বলেন মিস্টার সামন্ত ?

—আপনার যেমন অভিরুচি।

—প্রথমে আমি প্রণয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

প্রণয় এগিয়ে এল। বাসব তার বলিষ্ঠ চেহারার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, শুনেছেন নিশ্চয়ই সুলগ্নাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না ?

—শুনেছি। নিস্তেজ গলায় বলল।

—আপনার কি মনে হয়, তাঁকে জোর করে কেউ নিয়ে গেছে, না তিনি নিজের ইচ্ছেয় কোথাও চলে গেছেন ?

—ও সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

—আর এই চিঠিটা—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবেন ?

বাসব চিঠিখানা এগিয়ে ধরল।

প্রণয়ের চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠল। সে অসংলগ্ন গলায় বলল, চিঠিটা···হ্যাঁ, চিঠিটা আমারই লেখা। নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—তবুও শুনতে চাই। বলুন ?

—আমরা ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলাম। ইচ্ছে ছিল সারাটা জীবন স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই আমাদের কাটবে। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে এ-বিষয়ে সমর্থন না পাওয়ায় আমি অগ্রসর হতে চাইনি। সে-কথাই লিখেছিলাম।

—কিছু মনে করবেন না, বাড়ির মতামতকে আজকাল ক-জন পরোয়া করে মশাই ?

—কোন বিশেষ কারণে পরোয়া করে চলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

এরপর উমানাথের সঙ্গে কথা আরম্ভ করল বাসব।

—শুনলাম, উনি আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন বাড়ি যাবেন বলে! আর কোন কথা লেখা ছিল তাতে ?

উমানাথ বললেন, না।

—আপনার মেয়ে বোধহয় উগ্র আধুনিকা ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—মেয়ের এই স্বভাব আপনি পছন্দ করতেন ?

—না।

—আপনি তো রেলে চাকরি করেন ?

—হ্যাঁ। সোনারপুর স্টেশনে পোস্টেড। সুলগ্নার সন্ধান কি সত্যিই পাওয়া যাবে না ?

—সমস্ত কিছু বাজিয়ে না দেখে আমি কিছুই বলতে পারছি না।

এবার অমিয়র সঙ্গে দু-চার কথা হল বাসবের। বলা বাহুল্য, সুলগ্না যে তাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেকথা সম্পূর্ণ চেপে গেল অমিয়। বাসবের ইঙ্গিতে ঘরের সীল ভাঙা হল। ও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে

নিল। খাট, টেবিল, রেফ্রিজেটার, র‍্যাকের ওপর রাখা জাফরিকাটা ট্রেগুলো— কিছুই ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। বাসব এগিয়ে গেল জানলা দুটোর কাছে। রডের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একটা পর্দা লাগান রয়েছে, অন্যটায় নেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাসব বলল, দুটো জানলাতেই কিন্তু পর্দা থাকা উচিত ছিল ইন্সপেক্টার!

ইন্সপেক্টার আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্বিতীয় জানলাটায় পর্দা ছিল আনন্দবাবু?

এই ধরনের প্রশ্নে আনন্দবাবু যেন থতমত খেলেন, ছিল বৈকি! কয়েকদিন আগেও আমি দেখেছি।

বাসব কোন কথা না বলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। থমথমে অবস্থার মধ্যে মিনিট দুয়েক কাটাল। শেষে সামন্তই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, কি বুঝলেন, কি বুঝছেন, মিস্টার ব্যানার্জী? সুলগ্নাদেবীকে কোথাও পাওয়া যাবে?

বাসব সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, তাঁকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে না। তিনি খুন হয়েছেন।

—খুন!! সকলে চমকে উঠলেন।

—কি বলছেন আপনি! কাতর গলায় উমানাথ বললেন।

—যা ঘটেছে, তাই আমি বলছি উমানাথবাবু। টেবিলের ওপর ওই যে ওষুধের শিশিগুলো রয়েছে, ওরই মধ্যে একটা শিশি আমাকে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কারের সাহায্য করেছে।

—অর্থাৎ—? সামন্ত প্রশ্ন করলেন।

বাসব এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা শিশি তুলে নিয়ে বলল, প্রিনেটাল ক্যাপসুলের শিশি এটা। এখন আপনারাই বলতে পারবেন ঠিক কোন্ সময় মেয়েরা এই ক্যাপসুল ব্যবহার করে থাকে।

কারুর মুখে কথা নেই। সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন।

—প্রেগনেন্ট হলে, বাসব আবার বলল, এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সুলগ্নাদেবী প্রেগনেন্ট ছিলেন। এই লজ্জাকর বিষয়টা সকলের কর্ণগোচর হবার আগেই তাঁকে খুন করেছে একজন।

এবার চিৎকার করে উঠল অমিয়, যদি তাই হয়, তবে এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী প্রণয় সেন। আমি জানি…

তার কথা শেষ হল না—প্রণয় তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, অমিয়বাবু, আপনি ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন!

উমানাথ ভাঙা গলায় বললেন, কিন্তু আমি যে ভাবতেও পারছি না। সুলগ্নাকে শেষ পর্যন্ত…

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, কথাটা আপনার অজানা ছিল না।

—আমার !! কি বলছেন ?

—আপনি একজন প্রাচীন-পন্থী, সংস্কারবদ্ধ বাপ, মেয়ের উগ্র আধুনিকতা আপনি পছন্দ করেননি। শেষ পর্যন্ত…

—কিন্তু…

—কিন্তু আর কোন অবকাশ নেই। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি সুলগ্নাদেবীকে খুন করেছেন।

ঘরের প্রতিটি প্রাণীর বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করে উঠল।

—আমি…আমি…

—হ্যাঁ, আপনি। কুমারী মেয়ে প্রেগনেণ্ট হয়েছে, কোনরকমে এই সংবাদ আপনি পেয়েছিলেন। হিতাহিত জ্ঞানের শেষপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আপনার সংস্কারি মন। কন্যা স্নেহ ম্লান হয়ে গিয়ে সংস্কার আর লোকলজ্জার জয়লাভ ঘটেছিল। এবং আপনি যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেলেছেন।

উমানাথ বসে পড়লেন মেঝেতে। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। হয়ত অনুশোচনার কান্না, হয়ত ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জার কান্না। ঘরের সকলে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে আছেন।

ইন্সপেক্টার সামন্ত বললেন, মৃতদেহ কোথায় ?

—কেন, ওই রেফ্রিজেটারের মধ্যে।

বাসব রেফ্রিজেটারের হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিল। পাল্লাটা খুলে যেতেই সুলগ্নার মৃতদেহ গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। প্রাণহীন দেহ ঠাণ্ডায় জমে একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। হালকা বরফের আস্তরণ ওই সঙ্গে ঢেকে দিয়েছে ওর সারা দেহটা।

কল্পনাতীত দৃশ্য।

—আমরা এখন চলি ইন্সপেক্টার। বাসব বলল, সময় করে আসবেন আমার ওখানে। এস ডাক্তার।

রাস্তায় নেমেই ট্যাক্সি ধরল ওরা। নির্দেশমত ট্যাক্সি এগিয়ে চলল গন্তব্য-স্থলের দিকে। ভাল করে হেলান দিয়ে বসে শৈবাল বলল, তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে উমানাথ হত্যাকারী ?

—এটা রুল অফ থ্রির কথা ডাক্তার। অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর করেই আসল সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ইন্সপেক্টারের মুখে শুনেছিলাম সুলগ্না ও প্রণয়ের ঘনিষ্টতার কথা। ওখানে গিয়ে প্রিনেটাল ক্যাপসুলের শিশি পেলাম। তাছাড়া প্রণয়ের চিঠির একটা লাইন ছিল, 'আমার বিরুদ্ধে যে তুমি অভিযোগ এনেছ, নিশ্চিতভাবে তার জন্যে আমি একা দায়ী নই।' কাজেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সুলগ্না প্রেগনেণ্ট ছিল। ওই সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলাম, তাকে হত্যা করার বিষয়। এখন প্রশ্ন হল, কে তাকে হত্যা করতে পারে ? প্রণয়কে বাদ দিতে হবে। কারণ, সে হত্যাকারী হলে, ওই ভাষায়

কখনই চিঠি দিত না। আপাতদৃষ্টিতে আনন্দবাবুর কোন স্বার্থ দেখা যাচ্ছে না। অমিয় সুলগ্নাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, খুন করতে যাবে কেন? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হত্যাকারী আমার কাছে ধরা পড়ে গেল। ইন্সপেক্টার বাগান থেকে একটা বোতাম কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ওই ধরনের বোতাম রেল-কর্মীদের কোটে ব্যবহৃত হয়। উমানাথ রেলে কাজ করেন। মেয়ে অবৈধভাবে কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে সংবাদ পেয়ে—আমার মনে হয়, অমিয়র সঙ্গে তার যাতে বিয়ে না হয় তাই সুলগ্নাই নিজের অবস্থার কথা জানিয়েছিল—তিনি এই কাণ্ডটা করে বসেছেন।

—কিন্তু তুমি কি সূত্রে অনুমান করলে, মৃতদেহ রেফ্রিজেটারের মধ্যে রয়েছে?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে বলল, একটু চোখ খুলে চারিদিকে তাকালে তুমিও বুঝতে পারতে। একটা জানলায় পর্দা ছিল না। ওই জানলার পর্দার রড খুলে সুলগ্নাকে আঘাত করা হয়েছিল। র‍্যাকের ওপর রাখা জাফরিকাটা ট্রেগুলো আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, ওগুলো যে রেফ্রিজেটারের ট্রে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ট্রেগুলো রেফ্রিজেটারের মধ্যে না থেকে ওখানে রয়েছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে রহস্য সরল হল আমার কাছে। তবে কি রিফ্রেজেটারটাকে স্যুটরাখা আলমারির মত সম্পূর্ণ খালি করে ফেলা হয়েছে? তারপর সুলগ্নাকে আহত করে ওরই মধ্যে রাখা হয়েছে? আমার অনুমান যে মিথ্যে হয়নি, তা তোমরা দেখেছ।

শৈবাল বলল, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, মেয়ের পদস্খলনের সংবাদ পেয়ে লোক-জানাজানি হওয়ার আগেই তাকে খুন করার পরিকল্পনা করে তারই ঘরে একসময় গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন উমানাথ এবং সুলগ্না ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পর্দার রড দিয়ে আঘাত করেন। তারপর তার দেহটা রেফ্রিজেটারের মধ্যে চালান করে দিয়ে জানলা টপকে অদৃশ্য হন। অ্যাম আই কারেক্ট?

—কারেক্ট ডাক।